শরৎ ১৪১৭

ছোটদের সেরা ত্রৈমাসিক

জয়ঢাকি বোল

দুয়ার ধরে কে দিয়ে যায় নাড়া?
কে বলে, 'চল ঘুরে আসি এ পাড়া ও পাড়া!'
চেয়ে দেখি শরৎ আলো কাশের বনে দোলে
আমায় ফাঁকি দিয়ে মাগো কোথায় গেলে চলে
এত ডাকি তবু কেন দাওনা তুমি সাড়া
মাগো, দাওনা কেন চুমো
কেন বল না দুষ্টু ছেলে রাত হয়েছে, ঘুমো!
রাত ফুরোলেই শুনতে পাব, হিমের পরশ মেখে
নাড়ছে কড়া ভোরের হাওয়া শুকতারাটি দেখে
জাগ রে সোনা চাঁদের কণা মানিক আমার ওরে
সিংহবাহন মা আসছেন মেঘের দোলায় চড়ে।

সবাই মিলে খুব আনন্দ কোরো এবারে পুজোয়।
তোমাদের জন্য এই জয়ঢাকি বোল লিখে
পাঠিয়েছেন শ্রী শেখর রায়।
পুজো ভালো কাটুক সকলের,
ভালোবাসায়,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা

সূর্য ওঠার রাজ্যে ঘোরা শেষ করে এবার মেঘের বাড়ি মেঘালয়-এর রাজধনী শিলং-এর পথে রওনা হলেন তিনি। পথে পড়বে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি। পুরোনকালে সুপুরি বা গুয়া-র এক বিশাল হাট ছিল এইখানে হয়তো। শহরের নামের মধ্যে আজও রয়ে গেছে সেই প্রাচীনকালের স্মৃতি।

ড: পি বি গঙ্গোপাধ্যায়ের শিলংভ্রমণ কথা 'মেঘবাড়ির ডায়েরি'-র প্রথম পর্বে রইল সেই গুয়াহাটির কাছে পবিতরা অভয়ারণ্য ছুঁয়ে যাবার গল্প।

(ত্রুটি স্বীকার: গত সংখ্যায় ভুল করে দু জায়গায় ২০০৯ সালের জায়গায় ২০০৩ সাল লেখা হয়েছিলো। ভুলটা যারা ধরে দিয়েছো তাদের অনেক ধন্যবাদ। এমনটা আর হবেনা।)

৩০/৪/২০০৯

আজ পুরো দিন গুয়াহাটিতেই থাকা। জনজীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছে। শুধু রাস্তায় মাঝে ম াঝে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের উপস্থিতিতে মনে করিয়ে দেয় যে কিছুদিন আগেই এখানে বোমাটোমা ফেটেছিল।

সকালে উঠে সাড়ে ছটার সময় গুয়াহাটি বন্যপ্রাণী বনমণ্ডলের অধীন পবিতরা অভয়ারণ্য দেখতে রওনা হলাম। ডি এফ ও মি: শর্মা (অসমীয়া শর্মা) সার্কিট হাউস থেকেই আমাদের সঙ্গী হলেন। এই অভয়ারণ্যকে গরীবের কাজিরাঙা নামে ডাকা হয়। গুয়াহাটি থেকে মাত্রই ৪০ কিলোমিটার দূরে খুবই কম খরচায় রাইনো দেখার এমন সুযোগ আর হয় না।

যেতে যেতে মি: শর্মার কাছে এই অভয়ারণ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এই অভয়ারণ্য ৩৮৮১ হেক্টর (প্রায় ৩৯ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে। সবটাই সংরক্ষিত অরণ্য। ১৯৭৮ সাল থেকে এটিকে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গণ্ডারের সংখ্যা এই অভয়ারণ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০০৬-এর গণনা অনুযায়ী এখাবে ৮১টি একশৃঙ্গ গণ্ডার (রাইনোসরাস ইউনিকর্নিস) আছে। আমরা হাতির পিঠে চড়ে তার দর্শনও পেলাম। সবচেয়ে আনন্দের

কথা যে শিশু গণ্ডারও বেশ কিছু দেখতে পেলাম। অতএব এটা বেশ বর্ধিষ্ণু পরিবার। ব্রহ্মপুত্র নদীর বন্যায় পলিমাটি জমে যে সমতলভূমি তৈরি হয়েছে সেটিই গণ্ডারের বিচরণস্থল। পুরো অভয়ারণ্যের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ ঘাসজমি, শতকরা ১৫ ভাগ জলা আর বাকিটা জঙ্গল। জলা আর ঘাসজমি গণ্ডারের জন্য খুবই জরুরি। প্রত্যেক বছর বন্যার জল ঘাসে জমিকে ডুবিয়ে দেয়। তখন গণ্ডার কাছের উঁচু জঙ্গলের জমিতে কিছু সময়ের জন্য চলে যায়। মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট পুকুর আছে, বন্যার জল সেখানে আটকে গিয়ে গণ্ডারের কাদাজল মাখবার জন্য 'ওয়ালো-পুল' তৈরি হয়ে যায়। এই অভয়ারণ্যে

গণ্ডারের সাথে সাথে বন্য মহিষও অনেক সংখ্যায় পাওয়া যায়। এইরকম হ্যাবিট্যাট বন্য মহিষের জন্যও উপযুক্ত। তবে ডি এফ ও সাহেব জানালেন যে এই অভয়ারণ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, সীমাবর্তী তেত্রিশটি গ্রামের প্রায় দশ হাজার গরু ও মোষ এই অভয়ারণ্যে চরতে আসে। ফলে এদের দৌরাত্ম্যে ঘাস বড় হতে পারেনা। গণ্ডার উঁচু ঘাস বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া এইসব পশুর মাধ্যমে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ বা রিন্ডারপেস্ট-এর মড়ক ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই জন্য আশপাশের সমস্ত গৃহপালিত জন্তুকে রোগ প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয়। অভয়ারণ্যের সীমায় বৈদ্যুতিক বেড়াও লাগানো হচ্ছে। গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে তাদের সহায়তা নেবার চেষ্টাও করছে বনবিভাগ। যদি আশপাশের গ্রামগুলোর থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে পবিতরা অভয়ারণ্য, গণ্ডার সংরক্ষণের একটি ভালো ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। পবিতরা-তে বনবিভাগের অতিথিশালায় দুটি কামরা আছে। আর রিজারভেশনের জন্য ডি এফ ও গুয়াহাটি ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশান, শান্তিপুর, গুয়াহাটি-৯--এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে হবে। এছাড়া আছে অসম পর্যটন নিগমের টুরিস্ট লজ 'হাড়ুক'। তার ভাড়া দিনপ্রতি চারশো টাকা। তবে ভোরবেলা গুয়াহাটি থেকে গাড়ি নিয়ে চলে এলে আর রাত্রে থাকবার দরকার হয় না।

আমরা পবিতরা ফরেস্ট রেস্ট হাউসে সকালের খাওয়া সেরে এগারোটা নাগাদ গুয়াহাটিতে ফেরৎ এসে গেলাম। আগামিকাল শিলং-এর পথে রওনা।

ক্রমশ

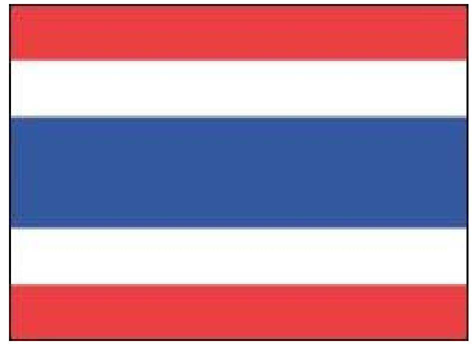

থাইল্যাণ্ড

এঁর নাম ভিরাচাই কাশুয়ান। ইনি থাইল্যান্ডের মানুষ। ধর্মে বৌদ্ধ। শান্তশিষ্ট। স্বল্পভাষী। এঁর নামের অর্থ হল বীরপুরুষ। ভিরাচাই খুব কম কথা বলেন এবং দুর্বোধ্য ইংরিজি বলেন। ইনি খুব ফরসা। এখন দক্ষিণ কোরিয়ার রত্নাচারী জেলায় চাকরি করেন। পেশায় সরকারি হিসাব পরীক্ষক।

প্রাচীন যুগে, মানুষ আসবার অনেক আগে থাইল্যাণ্ডে প্রচুর ডাইনোসর ছিল। মানুষের যুগে এসে, এখানে প্রথমে বাস করত মন আর খেমেররা। পরবর্তী যুগে আমাদের বন্ধু ভিরাচাইয়ের পূর্বপুরুষ তাই-রা দক্ষিণ চীন থেকে এসে এ দেশে বসবাস শুরু করেছিলেন ষষ্ঠ শতকে। ১০০০ শতাব্দি অবধি বর্মি আর কম্বোজদের সঙ্গে যুদ্ধটুদ্ধ চললেও, থাইল্যান্ড কিন্তু কখনো দীর্ঘকাল ধরে বিদেশীদের পদানত হয়নি। ১৭৮২ সনে চক্রী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা প্রথম রাম ব্যাংকক-এর বর্তমান রাজধানী স্থাপন করেন।

১৮৩২ সালে ইংরেজরা কিছুকালের জন্য এ দেশে উপনিবেশ গড়লেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৯৬ সালে সে ফের ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। ১৯৩৯ সাল অবধি এই দেশের নাম ছিল শ্যামদেশ। ১৯৩৯ সালে এর নাম বদলে থাইল্যাণ্ড রাখা হয়। ১৯৩২ সালে এ দেশ থেকে রাজার শাসন ঘুচে গিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা অবশ্য এখনও আছেন, তবে সে নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। এখনকার রাজা হলেন সেই চক্রী রাজবংশেরই রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজ ওরফে রাজা নবম রাম।

এর পর থেকে নানারকম উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে থাইল্যান্ড। কখনো সামরিক অভ্যুত্থান, কখনও বিদেশী আক্রমণ , সেই সব সয়ে বিশ শতাব্দির শেষের দিকে এ দেশটার অর্থনীতি সাংঘাতিক উন্নতি করতে শুরু করে। তারপর ১৯৯৭ সালে আবার থাইল্যান্ডের অর্থনীতি একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল বিদেশি ঋণের চাপে। তার পর থেকে আস্তে আস্তে ফের সে ফিরে আসছে উন্নতির পথে।

ইন্দোচীন পেনিনসুলার পশ্চিম অর্ধ আর মালয় পেনিনসুলার দুই তৃতীয়াংশ নিয়ে তৈরি এই দেশ। এর উত্তরে মায়ানমার এবং লাওস, পুবে কম্বোডিয়া, পশ্চিমে মায়ানমার, দক্ষিণে মালয়েশিয়া। দু লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের থাইল্যান্ড পৃথিবীর ৫০তম বৃহত্তম দেশ। ৭৬ টি রাজনৈতিক প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে এ দেশকে। সাড়ে ছ কোটি মানুষের এই দেশে শতকরা ৮৫ জন হলেন থাই। তাছাড়া

আছেন মন, খেমের, চিনা, ভারতীয় ও মালয় বংশোদ্ভূত মানুষ। শতকরা বিরানব্বই শতাংশ মানুষ থাই ভাষায় কথা বলেন। ইংরিজি জানেন অনেকেই কিন্তু বহু মানুষেরই ইংরিজির দশাই আমাদের বন্ধু ভিরাচাই-এর মতো। বুঝতে বেশ কষ্ট হয়। এ দেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষ বৌদ্ধ। বাকিরা মুসলমান ও অতি সামান্য সংখ্যাক খৃষ্টান।

এ দেশের মুদ্রার নাম থাই বাহট। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই অর্থনীতির জাতীয় আয়ের শতকরা ষাট ভাগ আসে রফতানি বাণিজ্য থেকে। থাইল্যাণ্ড দুনিয়ার বৃহত্তম চাল রফতানিকারী দেশ। চাল ও মাছ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সামগ্রী অবধি সবকিছুই বিশ্বের বাজারে রফতানি করে থাকে এই দেশ। যদিও এ দেশের টুরিজম বিশ্ববিখ্যাত কিন্তু টুরিজম শিল্প থেকে এ দেশের জাতীয় আয়ের মাত্রই সাত শতাংশ আসে।

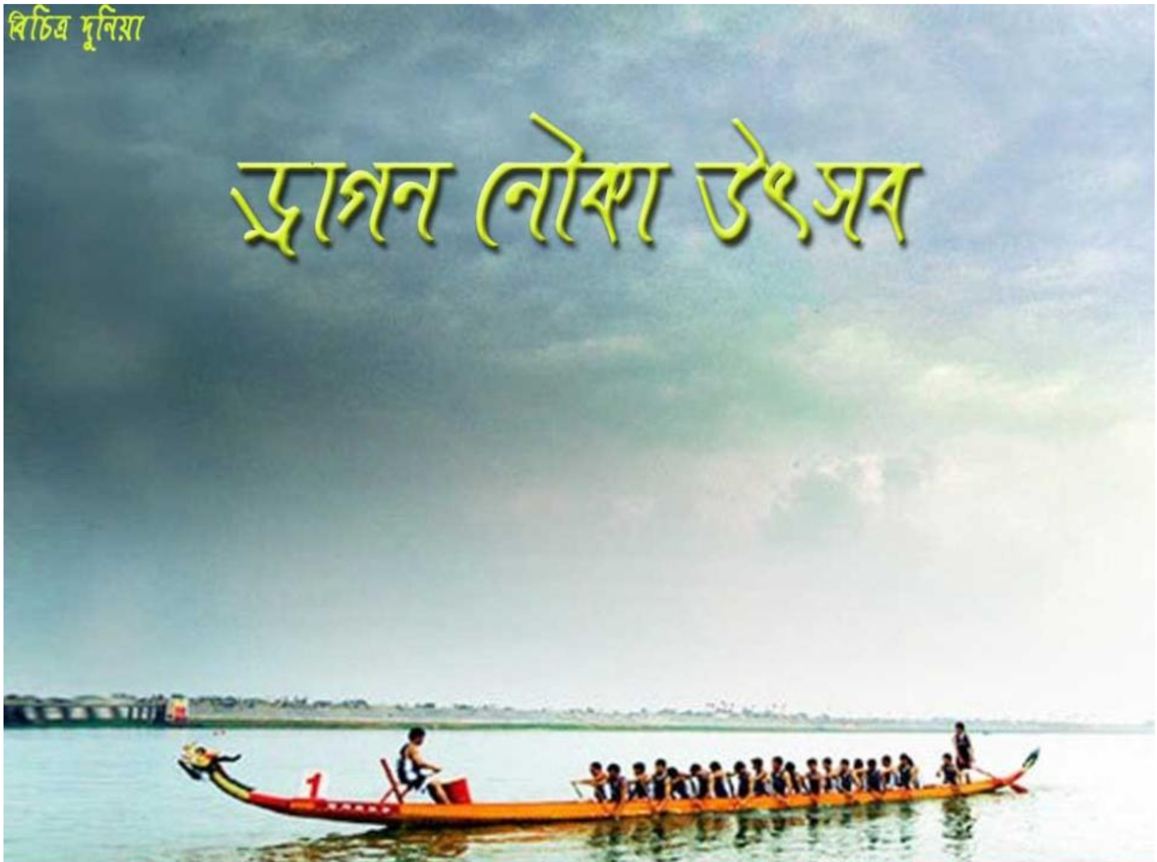

১০০ ফুট লম্বা ছিপছিপে লম্বা নৌকা।সামনে একজন ড্রাম বাদক আর সবার পেছনে হাল ধরে নৌকার নিয়ন্ত্রক,মাঝে ৫০ থেকে ৮০ জন বৈঠাদার। লেকের জল তোলপাড় করে চলছে নৌকার গতির প্রতিযোগিতা। খৃষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগের এক ঘটনা থেকে আজকের চীন দেশের ড্রাগন নৌকা উৎসব, এক লম্বা কাহিনী। বলছেন অরিন্দম দেবনাথ।

লম্বা ছিপছিপে সেগুন কাঠে তৈরি নৌকার সামনে ছুঁচলো অংশটা যেন একটি ড্রাগনের মুখ। লম্বা জিভ বেরিয়ে আছে। যেকোন মুহুর্তে আগুনের হলকা হিস্ হিস্ শব্দ করে বেরোতে পারে। জল থেকে সামান্য উঁচুতে রয়েছে ড্রাগনের মুখ। ড্রাগন জলের ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে চলছে যেন। জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে ড্রাগনের মুখ।

ড্রাগন শব্দটা শুনলেই মনে পড়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কথা। ড্রাগন নৃত্য। ড্রাগনের ছবি। ড্রাগনের মূর্তি। ড্রাগন মানেই চীন,জাপান,কোরিয়া,মালয়েশিয়া,ভিয়েতনাম,হংকং,ম্যাকাও। কোন চিরাচরিত উৎসব হলে তাতে এ'সব দেশে ড্রাগনের স্থান বাঁধা। সিংহের মত কেশর। লম্বা জিভ, আগুনের ভাঁটার মত চোখ। কাঁটাওয়ালা লেজ। এমনকি এসব দেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হয় ড্রাগনের ছোট মূর্তি বা ছবি দেখা যাবে। ড্রাগন হল অশুভ শক্তিকে বিনাশকারী শক্তি। এ সব দেশের ম ানুষজন বিশ্বাস করেন যে,ঘরে ড্রাগনের মূর্তি থাকলে কোন অশুভ শক্তি, রোগ-বালাই ঘরে ঢুকতে পারবে না।

চীন দেশের ড্রাগন নৌকা উৎসবের কথা আমি প্রথম শুনি আমাদের চায়না অফিসের এক সহকর্মীর কাছে। ২০০৮ সালে চীন দেশের এই প্রাচীন ঐতিহ্যময় দিনটিকে সরকার জাতীয় ছুটি বলে ঘোষণা করেন। প্রতি বছর পঞ্চম পূর্ণিমার পঞ্চম দিনে এই উৎসব চলে সমস্ত চীন দেশ জুড়ে। লেকের

জল,সমুদের খাঁড়ি,নদী তোলপাড় করে বিশাল লম্বা ছিপছিপে ড্রাগনমুখি নৌকাদের ঢাকের তালে তালে বৈঠাদাররা ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।শুধু তাই নয়, এদিন চীনের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে নানা ধরনের খাবার তৈরি হয়। তৈরি হয় বিশেষ ধরণের মদ এবং অবশ্যই জংজি নামে চালের পিঠে। বাড়ি ঘর সাজানো হয় রংবেরং এর কাগজ ও কাপড়ের টুকরো দিয়ে। এই উৎসবের আরেক নাম দুয়ানউ।

এই উৎসবের শুরু প্রাচীন কালের এক আত্মবলিদানকে কেন্দ্র করে। খৃষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগের ঘটনা। তখন চীনের চু অঞ্চলে ঝু সাম্রাজ্য চলছে। ক্যু-ইয়েন নামে এক কবি তথা পন্ডিত সে সময় ঝু সম্রাটের মন্ত্রী ছিলেন। ক্যু-ইয়েন সাধারণ প্রজাদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং প্রজারা ক্যু-ইয়েনকে প্রাণের থেকেও বেশি ভালবাসতেন। সম্রাটও ক্যু-ইয়েনকে মান্য করে চলতেন। প্রজাদের অগাধ ভালবাসা, সম্রাটের কথায় কথায় ক্যু ইয়েনের সাথে পরামর্শ করে চলা, অন্যান্য দুর্নীতিগ্রস্ত ম ন্ত্রীদের ক্যু-ইয়েনের বিরুদ্ধে একজোট করল, তারা সুযোগ খুঁজতে লাগল কী করে ক্যু-ইয়েনকে দেশ থেকে তাড়ানো যায়। এই দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীরা রাজাকে উশকানি দিতে লাগল প্রতিবেশী ক্যুইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওই দেশ দখল করতে। ক্যৃ-ইয়েন রাজাকে যুদ্ধে না জড়াতে পরামর্শ দিলেন। বাকি ম ন্ত্রীরা ঝু সম্রাটকে বোঝালেন ক্যু-ইয়েন আপনার সাফল্য, সাম্রাজ্য বিস্তার দেখতে চায়না, তাই আপনাকে যুদ্ধ করতে বারণ করছে। ক্যু-ইয়েন আপনার সাম্রাজ্যের শত্রু, দুনীতিগ্রস্ত, ওকে মন্ত্রীসভা ও দেশ থেকে বিতাড়িত করুন।

ঝু সম্রাট মেনে নিলেন এ পরামর্শ। ক্যু-ইয়েন বিতাড়িত হলেন মন্ত্রীসভা থেকে। বিতাড়িত ক্যু-ইয়েন দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। লিখলেন অসংখ্য কবিতা।

ঝু সম্রাট একসময় ক্যুইন সাম্রাজ্যের দখলের জন্য যুদ্ধে নামলেন এবং পরাজিত হলেন। ক্যু-ইয়েন এই পরাজয়ের খবর শুনে নিজেকেই দোষী ভাবলেন। কারণ তিনি পারেন নি সম্রাটকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত করতে। শোকে ক্যু-ইয়েন বুকে পাথর বেঁধে ঝাঁপ দিলেন মিলো নদীতে। ক্যু-ইয়েনের নদীতে আত্মবলিদানের খবর ছড়িয়ে পড়তে ঝু'র সাধারণ লোকেরা নৌকা নিয়ে ক্যু-ইয়েনকে উদ্ধার করতে তোলপাড় শুরু করলেন মিলো নদীর জলে। সবাই বিশ্বাস করতেন ক্যু-ইয়েন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি একদিন ফিরে আসবেন। সাধারণ মানুষজন, বিশেষত জেলেরা রান্না করা ভাত নদীতে মন্ড পাকিয়ে ফেলতে লাগলেন এই ভেবে যে ক্যু-ইয়েন ক্ষুধার্ত হলে ওই ভাত খাবেন।

যখন সবাই একদিন বুঝলেন যে ক্যু-ইয়েন আর ফিরবেন না, তখন প্রতি বছর ক্যু-ইয়েনের আত্মবলিদানের দিন সবাই নদীতে ভাতের মন্ড পাকিয়ে ফেলতে লাগলেন তাদের হারিয়ে যাওয়া অন্তরের মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতে। একদিন এক জেলে স্বপ্ন দেখলেন যে জলে ছুঁড়ে ফেলা ভাতের মন্ড ক্যু-ইয়েনের কাছে পৌঁছোচ্ছে না। মাছেরাখেয়ে ফেলছে সেই মন্ড। তখন শুরু হল কলাপাতায় মুড়ে পিঠে বানিয়ে জলে ফেলার রেওয়াজ। সাধারণ মানুষ মনে করলেন কলাপাতায় মোড়া থাকায়, ভেতরে রকমারি জিনিসের পুর দেওয়া চালের মন্ড বা চালের পিঠে 'জংজি', মাছেরা খেতে পারবে না। আর তা একদিন না একদিন জলের তলায় তলিয়ে থাকা তাদের ভালবাসার মানুষ ক্যু-ইয়েনের কাছে পৌঁছবে।

আর একটি উপকথা আছে যে, ঝু-এর জেলেরা ক্যু-ইয়েনের জলের তলায় হারিয়ে যাওয়ার পর স্বপ্ন দেখলেন যে মাছেরা ক্যু-ইয়েনের শরীর ঠুকরে খেয়ে নিচ্ছে। স্হানীয় লোকেরা, যাতে মাছেরা ক্যু-ইয়েনের শরীর ঠুকরে না খেতে পারে তারজন্য এক উপায় ঠাওরালেন। তাঁরা সবাই মিলে লেকের জলে

চালের মন্ড ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন এই ভেবে যে মাছেরা এই খাবার পেলে আর ক্যু-ইয়েনের শরীর ঠোকরাবে না। ভাবো দেখি, একজন মানুষের প্রতি কত শ্রদ্ধা আর ভালবাসা থাকলে তার মৃত শরীর যাতে মাছেও স্পর্শ না করে তার জন্য জলে খাবার ছুঁড়তে পারে দেশের আপামর জনসাধারণ!

খৃষ্টপূর্ব ২৭৮ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মিলো নদীতে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন এই মহান কবি, দার্শনিক, শিক্ষক তথা রাজনীতিবিদ ক্যু-ইয়েন। প্রতি বছর পঞ্চম পূর্ণিমার দিনটিতে, যে দিন ক্যু-ইয়েন আত্মবলিদান করেছিলেন, সে দিনটিতে চীনের মানুষজন নৌকা নিয়ে দলে দলে জলে দাপিয়ে বেড়ান তাঁর স্মৃতিতে। তাঁকে উদ্ধারের স্বপ্ন নিয়ে মিলো নদীর জলে প্রায় ২৩০০ বছর আগে এক দল সাধারণ মানুষের ক্যু-ইয়েনকে জল তোলপাড় অনুসন্ধানকে সম্মান জানাতে।

বহু বছর আগের সেই উদ্ধার অভিযান কালক্রমে পরিণত হয়েছে 'ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যাল'-এ। চিন ও সন্নিহিত কয়েকটি দেশ ছাড়াও ক্যু-ইয়েনের স্মৃতিতে নৌকা উৎসব তথা নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা হয় এই বিশেষ দিনটিতে আরও অনেক দেশে, যেমন অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, ব্রিটেন, সুইডেন এ সব দেশে। ইউরোপে মূলত: 'ইউরোপিয়ান ড্রাগন বোট রেসিং অ্যাসোসিয়েশান' পরিচালনা করেন ড্রাগন বোট প্রতিযোগীতা।

এই দিনটি আগে চীনে জাতীয় ছুটি বলে ঘোষিত ছিল না। ২০০৯ সালের মে মাসে চীন সরকার এই উৎসবের দিনটিকে, (যার আরেক পোশাকি নাম দুয়ানুন উৎসব বা কবিদের দিন,) ইউনেস্কোর বিশ্বের ''ইনট্যানজিবেল কালচারাল হেরিটেজ' লিস্টে তোলার জন্য একে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। এর আগে ২০০৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার এই দিনটিকে দানো উৎসব

বলে জাতীয় বাৎসরিক ছুটির দিন ঘোষণা করে ইউনেস্কোর ''ইনট্যানজিবেল কালচারাল হেরিটেজ'' লিস্টে তুলে ফেলেছিল। যাকে চীন সরকার বলেছিলেন ''সাংস্কৃতিক ডাকাতি''।

ক্যু-ইয়েনের আত্মাহুতির দিনটিকে চায়নিজরা শুধু মাত্র ড্রাগন বোট রেস, চালের পিঠে জংজি আর দেশজ মদ খেয়েই পালন করে না। চীন ও তার প্রতিবেশী দেশ, বিশেষত তাইওয়ান ও ভিয়েতনামের লোকেরা, এদিন পদযাত্রা করে, সঙ্গে নেয় জরিবুটি ভর্তি সুগন্ধী থলে। ঠিক দুপুর বেলা একটা ডিমকে খাড়া করে দাঁড় করায়। বিশ্বাস এতে করে কোন অশুভ শক্তি বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং রোগ বালাইও দূরে থাকবে। দিনটি পালনের আরেকটি জনপ্রিয় রীতি হল কঠিন কঠিন বানান লেখার খেলা। দিনটি যে কবি-সাহিত্যিকদের দিন। ক্যু ইয়েন মস্তবড় কবিও ছিলেন যে!

বৈজ্ঞানিকের দপ্তর

আগে যা বলেছি:

দুয়ে দুয়ে চার হয় বটে , কিন্তু দুটো জিনিস পরস্পরের দিকে যত গতিতেই ছুটুক না কেন তাদের আপেক্ষিক গতি কখনই আলোর চেয়ে বেশি হতে পারবেনা। অর্থাৎ দুটো বস্তু যদি আলোর বেগে একে অন্যের দিকে ছোটে তাহলে তাদের আপেক্ষিক গতি আলোর বেগের দ্বিগুণ হবার বদলে আলোর বেগের সমান হবে। তার কারণ হল, বিরাট বড়ো পরিমাণ নিয়ে যখন কাজকারবার করা হয় তখন তাতে আমাদের রোজকার জীবনের সরল হিসেবকিতেব মেলেনা। তার জন্য নিয়মকানুন আলাদাগোছের হয়। যেন ধরো, একটা বস্তুর ওপর যত শক্তি প্রয়োগ করবে তত তার গতি সমানুপাতে বাড়বে। কিন্তু গতি যখন বেজায় বেড়ে যাবে তখন সে নিয়মটা ভেঙে যাবে। আসবে নতুন নিয়ম। এইবারে পরের কথা---

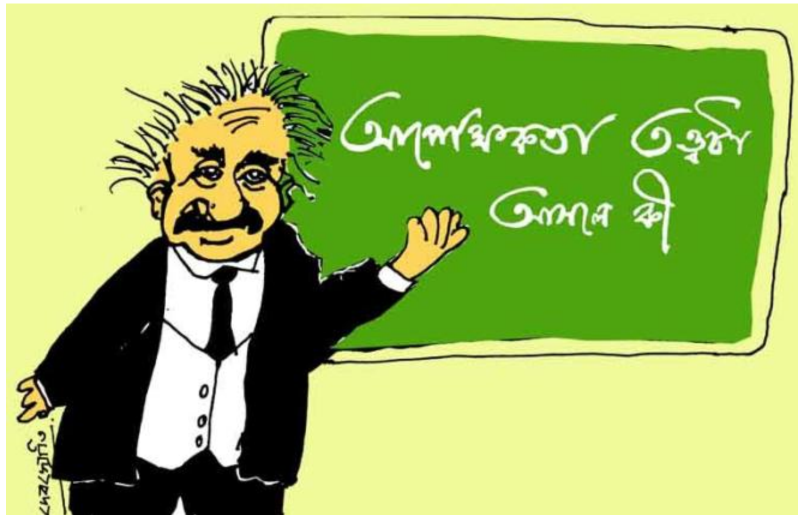

এইবারে প্রথমে একটু অংক কষব। ধরো, একটা নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপর ক্রমাগত একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করছি। তাহলে তার গতিটাও ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যে, কোন বস্তুর গতি আলোর গতির চেয়ে বেশি হতে পারবে না। কাজেই, বস্তুটার গতি যতই আলোর গতি দিকে এগোবে ততই তার গতিবৃদ্ধির হারটাও ধীরে ধীরে ক্রমশ কমতে থাকবে। (বস্তুটা আলোর গতিতে পৌঁছোয় যদি তাহলে তার গতিবৃদ্ধির হার হয়ে যাবে শূন্য। কারণ, আলোর গতির চেয়ে বেশি গতি তার কখনও হবে না।) অর্থাৎ গতি যত বাড়বে তত গতিবৃদ্ধির হারটা আর প্রযুক্ত বলে সঙ্গে সমানুপাতিক থাকবে না।

এখন ভেবে দেখো, তোমায় একটা ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে তোমার দাদা ঠেলছে। সেটার গতি বাড়ছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ একটা গোদা হনুমান কোথা থেকে এসে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল। তাতে গাড়িটার ওপর চাপ বাড়বে। ফলে তার গতিবৃদ্ধির হারটাও একটু কমবে। আবার খানিক বাদে হনুমানটা লাফ দিয়ে কোথাও চলে গেল। তখন গতিবৃদ্ধির হারটাও আবার একটু বদলাবে। সোজা কথায়, প্রযুক্ত বল আর গতিবৃদ্ধি যদি সমানুপাতে না থাকে তাহলে যেটা ঘটছে বলে বুঝতে হবে তা হল, ভরটা বদলাচ্ছে। প্রযুক্ত বলের তুলনায় গতিবৃদ্ধির হার যদি হ্রাস পেতে থাকে তাহলে বুঝবো ভর বাড়ছে আর উল্টোটা হলে বুঝবো ভর কমছে।

এই যুক্তি থেকে বলা যায়, বস্তুটা যখন আলোর গতির দিকে এগোয় তখন তার গতিবৃদ্ধির হার যে ক্রমাগত কমতে থাকে এটা একমাত্র সম্ভব হবে যদি তার ভর বাড়তে থাকে। আর আলোর গতিতে যখন পৌঁছোবে তখন গতিবৃদ্ধির হার হবে শূন্য (আলোর ওপর তো গতি হয়না। তাহলে গতি আর বাড়বে কেমন করে?) সেটা হতে গেলে ভরকে হতে হবে অসীম। বাস্তবের দুনিয়ায় যেহেতু অসীম ভর সম্ভব নয়, অতএব কোন বস্তুর আলোর গতিতে পৌঁছোনোও সম্ভব নয়।

এরপর পরের সংখ্যায়

আত্রেয়

যিশুর জন্মের প্রায় আটশো বছর আগে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষক আত্রেয়র। তাঁর গুরু ছিলেন ঋষি ভরদ্বাজ। শোনা যায় এই ঋষিই পুরাণে কথিত দেব চিকিৎসক। তবে আরও মনে করা হয় যে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক মানুষ যিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিখেছিলেন, বুঝেছিলেন এবং ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন।

আত্রেয়ের সুনাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে অধ্যাপনার সুবাদে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অগ্নিবেশ, ভেল, যতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষরপাণি এবং হরিৎ। এঁদের মধ্যে হরিৎ আত্রেয়র শিক্ষা গ্রন্থিত করেছিলেন সূত্রাকারে আত্রেয় সংহিতায়।

আত্রেয় সংহিতার ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ শ্লোকে লেখা আছে আয়ুর্বেদে আত্রেয়ের গুরুর থেকে পাওয়া জ্ঞান ও তাঁর নিজের আবিষ্কার করা জ্ঞানের সব কথা। বিভিন্ন বয়সের মানুষের মনে বায়ু, মাটি ও ঋতু আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া তৈরি করে বলে জানিয়েছিল এই বই। এই বইতেই প্রথম মিষ্টি, তেতো, টক, নোনতা, ঝাল এবং ঝাঁঝ এই ছয় রকমের স্বাদের কথা বলা হয়েছিল। আত্রেয়ের আগে এসব স্বাদের কোনো বিবরণই কেউ বুঝিয়ে বলেন নি। এ কথাটা আজকে শুনতে অদ্ভুত লাগলেও সেদিন মানে, যিশুর জন্মের আটশো বছর আগে, এই বুঝিয়ে বলাটা জরুরি ছিল। ঠাণ্ডা এবং গরম জল ব্যবহার করে কীভাবে বিভিন্ন রোগ সারিয়ে তোলা যায় সে কথাও বলা হয়েছিল এই বইতে। এছাড়া এই বইতে বলা হয়েছিল বিভিন্ন জানা-অজানা রোগের কথা; বিভিন্ন প্রাণীর দুধ, আখের রস, চাল, বার্লি এবং অন্য শস্যের ক্বাথের থেকে বানানো টক পায়েসের উপকারিতার কথা এবং বিভিন্ন তেলের, ফলের, সোমরসের, গুড়ের এবং মধুর ভেষজ গুণ। এছাড়াও এই বইতে বলা হয়েছে বিভিন্ন পাখি, জন্তু ও সাপের মাংস এবং বিভিন্ন লতানে গাছের রসাল অংশ কীভাবে রোজকার খাবারে ব্যবহার করে খাবারের পুষ্টিগুণ বাড়ানো যায়। এককথায় আত্রেয় ছিলেন ভারতের প্রথম পুষ্টি বিশেষজ্ঞও বটে।

সাকারা এরোপ্লেন

মিশরের সাকারার কাছে ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের একটা কবরে ১৮৯৮ সালে একটা কাঠের তৈরি ছোট্ট বস্তু পাওয়া গিয়েছিল। তার ছবিটা সঙ্গে দিলাম। বস্তুটাকে পরীক্ষা করে দেখা যায় তার বয়স ওই দু হাজার বছরের কিছু বেশি। ১৮৯৮ সালে রাইট ভাইদের প্লেনও ওড়েনি আকাশে। আধুনিক গড়ণের উড়োজাহাজ তখনও দূর ভবিষ্যতের গর্ভে। ফলে সে সময়ের বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই ধরনের বস্তু ঠিক কী তা বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তার গায়ে ''কাষ্ঠনির্মিত পক্ষির ম ডেল'' এই লেবেল এঁটে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন। বাক্সটার স্থান জুটল কায়রো জাদুঘরের বেসমেন্টে।

এরপর বহুযুগ কেটে গেল। আধুনিক সময়ে এসে ড: খালিল মাসিহা নামের এক প্রত্নবিদ পুরোন যুগের মডেল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ফের এই মডেলটাকে খুঁজে বের করলেন। এইবারে চেনা গেল, বস্তুটা একটা উড়োজাহাজের মডেল। যেমন তেমন নয়, অত্যাধুনিক পুশার গ্লাইডার নামে যে বিপুল ভারবাহী অথচ অত্যন্ত কম শক্তি খরচ করে নিচু দিয়ে উড়তে পারা উড়োযান সবে তৈরি করা হচ্ছে, এই মডেলের মাপজোকগুলোর অনুপাত হুবহু তার সঙ্গে মিলে যায়।

আচ্ছা , পিরামিডের পাথরগুলো এইরকম সব উড়োযান দিয়ে তোলা হত না তো? কে জানে বাবা!

গ্লো ফিশ

আমেরিকায় এই প্রথম জিন বদলে দিয়ে তৈরি করা নতুন প্রাণী বাজারে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি হতে এলো। তাদের নাম গ্লো ফিশ। সমুদ্রের গভীরে কিছু প্রাণী আছে যারা সেখানকার ক্ষীণ আলোকে শুষে নিয়ে আবার তাকে বিচ্ছুরণ করতে পারে। ফলে তারা জ্বলজ্বল করে অন্ধকারে। এই প্রাণীদের পরিবেশ থেকে আলো শোষবার ক্ষমতা দেয় যে জিন সেটাকে আলাদা করে নিয়ে বিজ্ঞানীরা বসিয়ে দিয়েছেন সাধারণ জেব্রা ফিশ-এর শরীরে। তার ফলে যে মাছগুলো তৈরি হয়েছে তারা আলো ছড়ায়। লাল, সবুজ আর কমলা এই তিনরকমের রং বিচ্ছুরণ করা গ্লো ফিশ বাজারে ছাড়া হয়েছে এখন। তাদের ডিম ফুটে যে ছানাপোনারা হবে তারা সবাই হবে এই রকম আলো ছড়ানো মাছ। এই সাইটটাতে গেলে এদের নিয়ে অনেক মজার মজার তথ্য, খেলা ও ধাঁধা পাবে: **http://www.glofish.com/kids.asp**

কালাক্কাড় মুণ্ডনথেরই টাইগার রিজার্ভ

তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় বৃহত্তম টাইগার রিজার্ভ হলো কালাক্কাড় মুণ্ডনথেরাই টাইগার রিজার্ভ। তামিলনাড়ুর দক্ষিণপ্রান্তে বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমে যেতে থাকায়, ১৯৬২ সালে তামিলনাড়ুর কালাক্কাড এবং মুণ্ডনথেরাই এলাকায় দুটো আলাদা আলাদা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি বা অভয়ারণ্য গড়ে উঠে ছিল। ১৯৮৮ সালে সেই দুই অভয়ারণ্য জুড়ে তৈরি হয়েছে আজকের কালাক্কাড় মু গুনথেরাই টাইগার রিজার্ভ। এই রিজার্ভের পুরো এলাকার মধ্যে ঢুকে গেছে কালাক্কাড়ের ২৫১ বর্গ কিলোমিটার এবং মুণ্ডনথেরাইয়ের ৫৬৭ বর্গ কিলোমিটার; কন্যাকুমারীর কাছের ভিরাপুলি এবং কিলামালাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৭৭ বর্গ কিলোমিটার এই রিজার্ভে জুড়ে দেবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলেও এখনও সে কাজ শেষ হয় নি। এছাড়াও ভাবা হচ্ছে যে ৪০০ বর্গ কিলোমিটার কোর এলাকায় জাতীয় উদ্যান গড়ে তোলার কথা।

এই রিজার্ভের কোর এলাকায় রয়েছে অগস্ত্যমালাই পাহাড়। পুরো এলাকাটা সমুদ্রতল থেকে কোথাও ৪০ মিটার, কোথাওবা ১৮০০ মিটার উঁচু। এই অঞ্চল থেকে কম-বেশি ১৪টা নদী তৈরি হয়েছে। কয়েকটা প্রাকৃতিক বাঁধও আছে এখানে।

এতো জল আছে বলেই এখানে ৩৩টা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া পাওয়া যায় কুমীরও। সব মিলিয়ে দেখতে পাওয়া যায় ৩৭টা প্রজাতির উভচর, সরীসৃপের ৮১টা প্রজাতি, স্তন্যপায়ী ৭৭টা প্রজাতি। এইসব পশু ছাড়াও এখানে আছে ১৫০টা এরকম গাছপালা যেগুলো এই এলাকার বাইরে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রধান হল: বাঘ, হাতি, চিতা, বনবিড়াল, ঢোল, গাউর, সাম্বার, চিতল, নিলগিরি তাহ্‌ড়, বনশূকর, মাউস ডিয়ার, ভালুক, লায়ন টেলড বাঁদর, বনেট বাঁদর, স্লেণ্ডার লরিস, নীলগিরির হনুমান এবং সাধারণ হনুমান ও জায়ান্ট স্কুইরেল।

এত জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব সংকটে। মূলত চা চাষের কারণে। এছাড়া এখানে নদীবাঁধ প্রাকৃতিক জলধারাকে বাধা দেওয়ায়, বাঁধের নিচে থাকা নদীর অংশ শুকিয়ে গিয়ে বদলে দিয়েছে গাছপালা এবং জন্তুর বসবাসের আবহাওয়া। ফলে যে জন্তু এইসব শুকিয়ে যাওয়া এলাকা ছেড়ে অন্য জায়গায় একই রকম আবহাওয়া পেয়েছে সেখানে চলে যাচ্ছে। যে জন্তুরা অন্য জায়গায় একই রকম আবহাওয়া পাচ্ছে না, তারা একে একে মরে গিয়ে লোপ পাচ্ছে। এইসব জন্তুর মতোই বেশ কিছু গাছও মরে যাচ্ছে।

এসব ছাড়াও কানি আদিবাসীদের পাঁচটা বসতির গরু-ছাগলও চড়ে এই বনেতেই। ১৪৫টা গ্রামের প্রায় লাখ-খানেক মানুষের জ্বালানীর যোগানও দেয় এই বন। তাছাড়া বাধ দেখাশোনার কাজে এই রিজার্ভের কোর অঞ্চলে বাস করেন বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মচারীরা। মানুষের বসবাসের কারণে এখানে সংরক্ষণের কাজ বেশ বাধা পাচ্ছে।

তবুও আশার কথা যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জীববৈচিত্র্য হটস্পটের অগস্ত্যমালাই সাব-ক্লাস্টারের মধ্যে এই রিজার্ভ থাকায়, এই এলাকা ভবিষ্যতে বিশ্ব হেরিটেজ সাইট হতে পারে। বিষয়টা এখন ইউনেসকোর বিশ্ব হেরিটেজ কমিটিতে বিবেচোনাধীন।

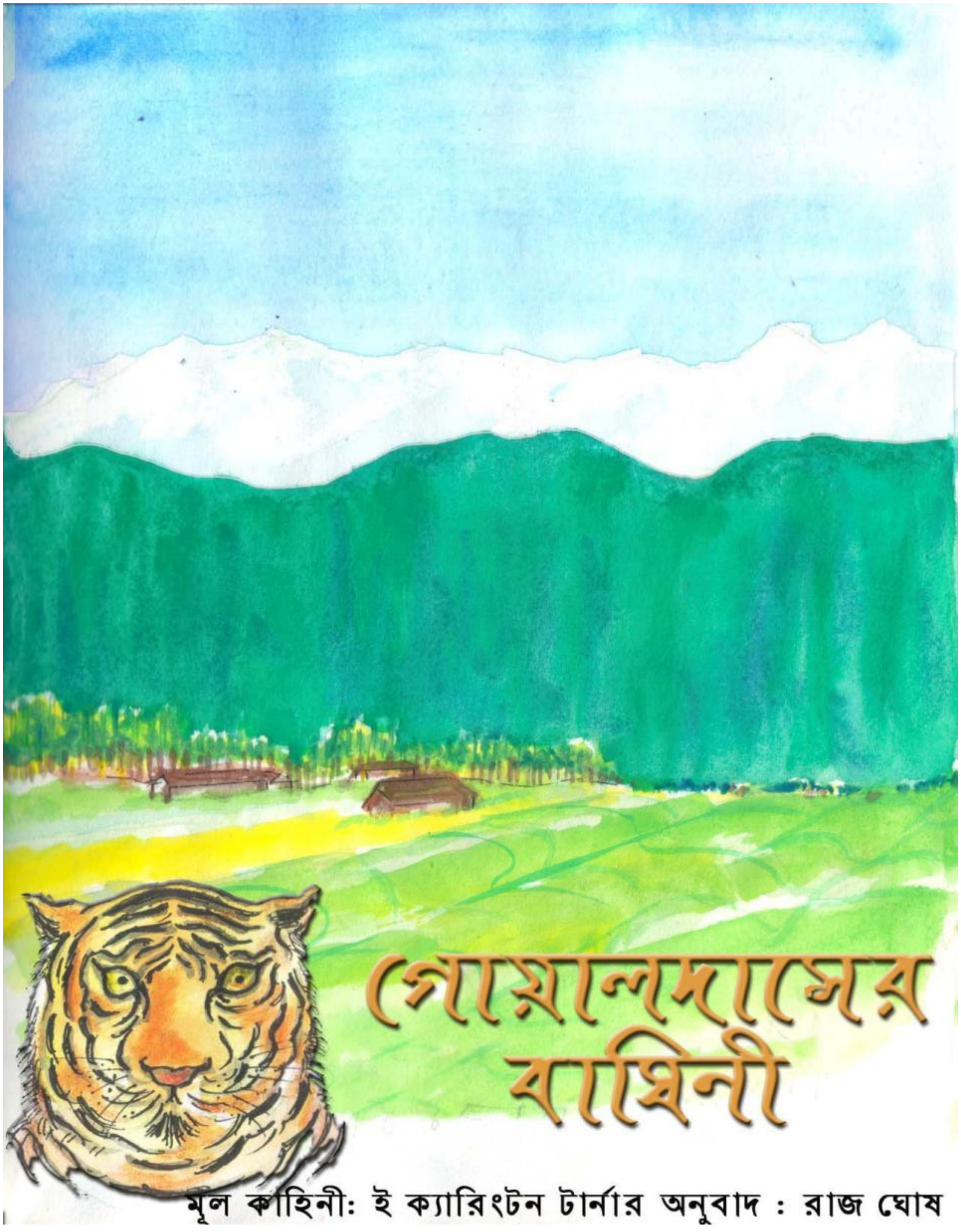

এবারের কাহিনী যে বাঘিনীকে নিয়ে সে বয়সের ভারে কাবু হয়ে পড়েছিল; ফলে পাহাড়ি জঙ্গলে ক্ষিপ্র কাকর হরিণ ধরার ক্ষমতা তার আর ছিল না। খিদের জ্বালায় সে মানুষ শিকারে প্রবৃত্ত হয়। এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও সে কুড়ি জনের বেশি হতভাগ্যকে সাবাড় করে ফেলেছিল।

এই হতভাগ্যদের অধিকাংশই ছিল স্ত্রীলোক। কেননা তাদের দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ হিসেবেই তাদের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হতো। পরের বাড়ির রান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, গরু ছাগল দেখাশোনা, খোঁয়াড় থেকে গোবর তুলে এনে জমিতে সার দেওয়ার জন্য বাইরে জমা করা - এতকিছুর পর সকালে ঘরের কাজ শেষ হলে, নটা নাগাদ তারা তাদের কাটারি নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে যেত ঘাস আর ওকপাতা কাটতে। তারপর সেগুলোর পেল্লায় বোঝা মাথায় নিয়ে গাঁয়ে ফিরে আসত গবাদি পশুর রাতের খাবার হিসেবে। এতসবের পরে তারা রাতের খাবার রাঁধতে বসত। তারাই ছিল পরিবারের সত্যিকারের কর্মী।

চাষের মরশুমে পুরুষরা খেতের কাজে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু ফসল ফলে যখন পাকতে থাকত তখন তারা পথের ধারে দোকানে আড্ডা জমাত অথবা একে অন্যের বাড়িতে জুয়ো খেলতে যেত। তারা তাদের বউদের সঙ্গে জঙ্গলে যেত কদাচিৎ। কাজেই দেখা যাচ্ছে নিম্নহিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কুমায়ুন গাড়োয়াল জেলার গ্রামগুলোতে বসবাসকারী পরিবারগুলোতে শ্রমের বন্টন ছিল খুবই স্পষ্ট এবং পুরোপুরি পুরুষদের অনুকূলে।

এই বিস্তৃত এলাকায় যে বহু সফর আমি করেছি, সেবার তারই একটাতে আমি আমর বন্ধু রবার্ট বেলেয়ার্সের সঙ্গে ছিলাম। ওর হেডকোয়ার্টার্স আলমোড়া জেলার কৌশানিতে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পরপরই ওকে সেটলমেন্ট অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয় ভূমিহীন প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের পরিবারের জন্য জমি বরাদ্দ করার কাজে। এ কাজে ও-ই ছিল যোগ্যতম ব্যক্তি কেননা ওই অঞ্চলের সঙ্গে এবং যাদের নিয়ে কাজ সেই মানুষগুলোর সঙ্গে ওর ছিল নিবিড় পরিচয়। ঠিক এই অঞ্চলটাতেই ও একটা পুরোদস্তুর শ্রমিক বাহিনী গড়ে তোলে এবং গোটা যুদ্ধকালীন সময়ে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে তার নেতৃত্ব দেয়।

ওর বাংলোটা ছিল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। এককালে সেটা ছিল নরম্যান আর কলিন ট্রুপ নামে দুই ভাইয়ের সমপত্তি। প্রথমজন ছিল চা বাগানের মালিক আর দ্বিতীয়জন রয়্যাল নেভির অ বসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে দুই ভাই-ই মারা যায়। ওদের বিস্তীর্ণ এস্টেট, যার মধ্যে ছিল চা বাগান আর ফলের বাগান, সরকার অধিগ্রহণ করে নেন। ঠিক হয় ছোট ছোট অথচ উপযুক্ত জমি হিসেবে তা যুদ্ধ শেষে বেকার হয়ে পড়া কয়েকশো সৈনিককে হস্তান্তর করা হবে।

কৌশানিতে দু-দুটো ট্রাভেলার্স বাংলো থাকলেও রবার্ট বেলেয়ার্স কখনোই আমাকে তার একটাতেও থাকতে দিত না। যেই শুনত আমি সফরে এসেছি, অমনি আমার বাংলোয় হেঁটে চলে আসত আর সেটা ছেড়ে ওর সঙ্গে অনেক আরামে থাকার জন্য চাপাচাপি করত। আমাকে অতএব ওর আতিথ্য নিতে হত। আমার ক্যামপের লোকেদের জায়গা হতো ফাঁকা পড়ে থাকা অনেকগুলো বাড়ির কোন একটায়।

এইভাবেই আমি গোয়ালদাসের মানুষখেকো বাঘিনীটার কথা শুনতে পাই। রবার্ট আর আমি সেদিন লাঞ্চে বসেছিলাম। ও তখন জনা কুড়ি প্রাক্তন সেনার জমির আবেদন শোনা শেষ করেছে। আর আমি আশেপাশের সরকারী বনে ইন্সপেকশন সেরে ফিরেছি। ওইসব বনে সেই সময় পাইনগাছ থেকে কাঁচা রজন সংগ্রহের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে।

আমরা টেবিল থেকে উঠেছি কি উঠিনি, শুনলাম দুজন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে গোয়ালদাম থেকে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমরা তাদের জরুরি বার্তা শুনলাম। ওরা জানালো, সেখানে একটি স্ত্রীলোক মারা পড়েছে। সে আর তার সঙ্গীরা যখন গোয়ালদাসের কাছের একটা গ্রাম

থেকে পাতা কাটতে জঙ্গলে গিয়েছিল, আততায়ী তখন তাকে ধরে। সূর্যাস্তের অনেক আগেই মাথায় পাতার বোঝা নিয়ে তারা যখন ফিরছিল তখন মানুষখেকোটা ওই মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেরে ফেলার পর বাঘিনী তার দেহটা পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে দেয়, তারপর সেটা ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে উদরস্থ করতে বসে।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে লোকগুলোর কাছ থেকে বিয়োগান্ত ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে তার বিবরণ পাওয়া গেল। রবার্ট আর আমি দুজনেই গোয়লদাসের আশেপাশের জঙ্গলগুলো ভালোভাবে চিনতাম। ঐ এলাকায় আমরা চিতাবাঘ শিকার করেছি। আমাদের পদ্ধতিটা ছিল একটু অদ্ভুত; আমরা পিঠে পিঠ দিয়ে মাটির ওপর বসতাম। এই বিচিত্র ব্যবস্থা খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল এবং খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল কেননা এর ফলে আমাদের মিলিত দৃষ্টিপথ প্রসারিত হয়ে একটি পূর্ণবৃত্ত রচনা করত; কখনও ওর সামনে চিতাবাঘ দেখা দিত, কখনও আমার কপাল খুলত; কখনও কোন চিতা বাঘকে আমাদের কাছ থেকে বেঁচে ফিরতে হয় নি।

ঘটনাটার বর্ণনা শুনে আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে মানুষখেকোটা তখনও গোয়ালদামের জঙ্গলেই রয়েছে। ঠিক করলাম পরদিনই তাঁবু গোটাবো আর বার্তাবহদের বলে দিলাম তারা যেন গ্রাম বাসীদের হুঁশিয়ার করে দেয় জঙ্গলে না যেতে। কাছেই একটা এলাকায় রবার্টের কাজ ছিল আর আমারও সুযোগ হলো আমার একজন ঠিকাদারের পাইন গাছকাটা দেখবার। এতে করে আমাদের রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে।

রবার্টের রাইফেলের হাত ছিল দুর্দান্ত। মানুষখেকোটার সাথে মোলাকাতের জন্য সে অধীর হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে মানুষখেকোটা ইতিপূর্বে তাকে একবার ফাঁকি দিয়েছে বলে। সেবারে বাঘিনীর ম ারা একটা গরুর অর্ধভুক্ত দেহাবশেষের কাছে মাটিতে একটা গর্ত করে সে বসে ছিল; তার চারপাশে ডালপালা আর পাতা দিয়ে আড়াল করে। অতি সন্তর্পণে মানুষখেকোটা যখন মড়ির কাছে ফিরে আসছে, জঙ্গলের মধ্যে এই কিম্ভুত বস্তুটা সে দেখতে পায় এবং প্রবল সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। ধূর্তভাবে ঝোপঝাড়ের আড়ালে দূরত্ব রেখে সে বস্তুটাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং শেষমেষ সরে পড়ে। রবার্ট তার ক্ষুব্ধ চাপা গর্জন শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু একবারের জন্যও তার তার চেহারাটা ঠিক মতো দেখা যায়নি যাতে গুলি করা যায়। রবার্ট যখন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে তার হাত-পা অসাড়, মন হতাশ, তবু সে বদ্ধপরিকর ছিল পরবর্তী সুযোগের জন্য।

এত অল্পক্ষণের প্রস্তুতি সত্ত্বেও পরদিন সকালে তাঁবু গোটাতে কোনই অসুবিধে ছিল না। পনেরটা তাগড়া খচ্চরের একটা খাসা দল ছিল আমার। সেগুলোর যত্ন-আত্তিও হতো ভালোমতো। আমার অফিসের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম এক দিনে বহু মাইল বয়ে নিয়ে যেতে পারত এই দলটা। এই খচ্চরগুলোর ব্যাপারে আমাকে বিশেষ যত্ন নিতে হতো যেহেতু তাদের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করতো আমার যাতায়াত এবং একটা বিরাট পাহাড়ি এলাকায় বিবিধ বিষয়ে সময়োচিত তদারকির কাজ।

কৌশানি থেকে উত্তর পশ্চিমে তাকালেই গোয়ালদাম চোখে পড়ে। মাঝখানে শুধু বৈজনাথ উপত্যকা ছাড়া কোন পাহাড় নেই। কৌশানি থেকে পায়ে চলা পথটা এঁকেবেঁকে খাড়াই পাইন বনের ম ধ্যে দিয়ে নেমে গেছে গরুড় পর্যন্ত। সেখান থেকে অল্প ঢাল নেমে গেছে, যার নিম্নতম প্রান্তে বিস্তীর্ণ ধাপে ধাপে চষা জমি নিয়ে রয়েছে একটা বড়সড় গ্রাম। এখান থেকে পায়েচলা পথটা খাড়াই উঠে গেছে খোলামেলা পাইন বনের মধ্যে দিয়ে একেবারে গোয়ালদাম পর্যন্ত।

কৌশানি থেকে গোয়ালদামের দূরত্ব মাইল দশেক। পাইন চূড়োর ফাঁক দিয়ে যখন আমাদের গন্তব্য নজরে
এলো, তখন দেখলাম একদল গ্রামবাসী আমাদের জন্য পথের ধারে অপেক্ষা করছে। তারা গোয়ালদামের উত্তর-পূর্ব দিকের গ্রামটা থেকে এসেছে। মৃতা স্ত্রীলোকটি তাদেরই গাঁয়ের। তার স্বামীও ওই দলে ছিল।

পরিচয়-সম্ভাষণের পর ঘটনাটার আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লোকগুলি যে জঙ্গলে স্ত্রীলোকটি মারা পড়েছে সেটা আঙুল দিয়ে দেখাল। তাদের বুঝিয়ে বললাম যে মানুষখেকোটাকে মারার জন্যই আমাদের এখানে আসা; এ-ও বললাম, দরকার পড়লে তাদের জঙ্গলে হাঁকা করবার কাজে লাগানো হতে পারে। এতে তার এককথায় রাজি। বাঘিনীর মারা পড়াটা তাদের নিজেদের স্বার্থেই খুব জরুরি।

আমাদের সঙ্গে গোয়ালদাম অবধি যেতে যেতে তারা সবিস্তারে জানাল তাদের গাঁয়ের মেয়েরা সকলেই আতঙ্কিত হয়ে বলে দিয়েছে যে তারা জঙ্গলে যাবে না ফলে পশুখাদ্য হিসেবে ঘাস এবং পাতার জোগানে টান পড়েছে। তাই শুনে আমরা বললাম যে আমাদের মতে তারা খুবই ন্যায্য কথা বলেছে এবং অবশ্যই গাঁয়ের মরদদের পালা জঙ্গলে ঘাসপাতা কাটতে যাবার। এতে যে তারা প্রবল আপত্তি তুলল তাতে আমরা অবাক হইনি; জানতাম, তাদের যে পরমপরা এবং প্রথা তাতে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের চাকরবাকর ছাড়া কিছু ভাবে না। এদের মধ্য একটা চালু কথাই ছিল: ''যত বেশি বউ, তত বেশি চাকর।''

তাঁবু খাটানোর জায়গা বা ক্যামপিং সাইট হিসেবে গোয়ালদাম সত্যি অতি চমৎ কার। এই অঞ্চলের দুটো প্রধান নদী, পশ্চিমবাহিনী পিণ্ডার আর পূর্ববাহিনী গোমতির মধ্যেকার একটা উঁচু তটভূমি যে বিভাজিকা তৈরি করেছে তার উপরেই গোয়ালদামের অবস্থান, ঠিক আলমোড়া আর নৈনিতাল জেলার সীমারেখা বরাবর।

বিখ্যাত পর্বতারোহী এফ এস স্মাইথ, যিনি ২৫,৪৪৭ ফুট উঁচু কামেট শৃঙ্গজয়ীদের অন্যতম, তাঁর ''দ্য ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স'' বইতে একটি চমৎ কার রঙিন ছবি দিয়েছেন গোয়ালদাম থেকে অপরাহ্ণের আলোয় দৃশ্যমান অনবদ্য পর্বতসানুগুলির, যদিও বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যে মেঘেরা সাধারণত: ভিড় করে আসে তারা উত্তুঙ্গ তুষারকিরীটগুলিকে দূর্ভাগ্যবশত: ঢেকে দিয়েছে।

মানুষখেকোটাকে মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর আমরা কালবিলম্ব না করে রাইফেল নিয়ে গ্রাম বাসীরা জঙ্গলের যে অংশটা দেখিয়েছিল সেইদিকে গেলাম। একটা অতি সঙ্কীর্ণ পায়েচলা পথ ধরে এগোলাম যেটা বুনো জঙ্গল আর কুলের ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা নি:শব্দে আমাদের সঙ্গে আসছিল কিন্তু আরও অগ্রসর হতে মনে হলো তাদের সঙ্গ বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষখেকোর পিছু নেওয়ার দরকার পড়লে একা যাওয়াই আমাদের পক্ষে সুবিধের। পরবর্তী নির্দেশের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে বলে এ-ও বললাম, জরুরি মনে হলে তাদের সাহায্য চাইব। দ্বিরুক্তি না করে তারা সেখানেই বসে পড়ল।

আমরা একটা ওক গাছের বনে ঢুকলাম যার প্রতিটা গাছই পশুখাদ্যরূপে ক্রমাগত পাতা কেটে নেবার ফলে পেঁচানো আর বদখত। আর একটু এগিয়ে যেতে দুটো পায়েচলা পথের সংযোগস্থলে এসে পড়লাম, যার মধ্যে একটা মোটামুটি সোজা পাহাড়ের গা বরাবর চলে গেছে আর অন্যটা দক্ষিণমুখো হয়ে একটা উঁচু গিরিশিরা বেয়ে উঠেছে। গোটা জঙ্গলটাই উত্তরমুখো। সেখান থেকে গোয়ালদাম আর পিণ্ডার নদীর মনোরম উপত্যকা চোখে পড়ে।

একটু দাঁড়িয়ে জায়গাটা জরিপ করে নিয়ে আমরা ঠিক করলাম, সংকীর্ণ প্রথম রাস্তাটা ধরেই এগোব, লোকগুলো এই দিকটাই দেখিয়েছিল। আততায়ী যাতে অতর্কিতে না করতে পারে সেজন্য চূড়ান্ত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল।ঝোপঝাড়গুলো থাকায় জঙ্গলটা ছিল মানুষখেকোর আদর্শ আবাস। বাঘিনী দু'সপ্তাহ আগেই শিকার করেছে, তারপর এই স্ত্রীলোকটি হল তার দ্বিতীয় শিকার। সুতরাং তার এই বিশেষ স্থানটিতেই থেকে যাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে এইবার প্রথম আমরা দেখতে পেলাম সেই ঘটনার নির্ভরযোগ্য চিহ্ন যা এতক্ষণ

খুঁজছিলাম। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গোছা করা ঘাস আর পাতা। একটি মেয়ে 'শের' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই আর সবাই এগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিল। আরও ষাট গজ এগোতে আমাদের চোখে পড়ল মর্মান্তিক ঘটনাটার অকাট্য প্রমাণ।

বান্ডিলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। গোটা দুই বান্ডিল পায়েচলা পথটার উপরদিকে, বাকি প্রায় সবগুলোই গড়িয়ে এসে ঝোপঝাড়ের গায়ে ঠেকেছে। যে দড়িগুলো দিয়ে বান্ডিলগুলো বাঁধা হয়েছিল, তার মধ্যে তখনও কাটারিগুলো গোঁজা রয়েছে। চারদিক খুঁটিয়ে দেখে আমাদের মনে হল, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামাটাই অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। অতএব এক পা এক পা করে পাশাপাশি আমরা নামতে লাগলাম। সবকিছু এত থমথমে যে আমরা বাতাসে সেই বিয়োগান্ত পরিণতি এবং নরখাদকটার উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম।

অবশেষে আমরা ঝোপের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার দাগ খুঁজে পেলাম। থেকে থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে আমরা ক্ষীণতম শব্দ শোনার অথবা সামান্যতম কোন নড়াচড়া দেখার চেষ্টা করছিলাম রাইফেল তৈরি রেখে। যথাসম্ভব নি:শব্দে এগোতে এগোতে আমরা লক্ষ্য করছিলাম, যদি ঝোপঝাড়ের মধ্যে হতভাগ্য স্ত্রীলোকটির দেহাবশেষ বা কাপড়ের কোন অংশ খুঁজে পাই।

আমরা আর দশ গজ না যেতেই সামনে ডানদিকে গজ কুড়ি দূরত্বে ঝোপগুলো প্রবলভাবে কেঁপে উঠেই থেমে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চাপা গর্জন শুনতে পেলাম। বাঘিনী! আংদের সাড়া পেয়েছে! সম্ভবত আমাদের দেখতেও পাচ্ছে। কিন্তু আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে তাকে দেখতেও পাচ্ছিলাম না।

আমরা যে বেকায়দায় পড়েছি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। এই মুহূর্তে সামান্য স্থান পরিবর্তন আবশ্যক যাতে তাকে এক ঝলক দেখা যায়। খুব সন্তর্পণে গজখানেক ডানদিকে সরে এলাম। এমনভাবে, যাতে ঢালের ওপরদিকে থাকবার সুবিধেটা হাতছাড়া হয়ে না যায়। যে কোন মুহূর্তে তার ধেয়ে আসার প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা, কিন্তু তখনও তার লালচে বাদামি দেহের কোন অংশ আমাদের নজরে আসছিল না।

তার নিচু গর্জন ক্রমশ উচ্চগ্রামে উঠল। তারপর আরা ডানদিকে আর এক পা সরতেই দুজনেই তাকে দেখতে পেলাম। এ সুযোগ ছাড়বার নয়। আমাদের দুজনের রাইফেল যুগপত গর্জে উঠল। বাঘিনী পড়ে গিয়েও সামলে নিল এবং ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে আর দেখতে পেলাম না। আমরা দুজনেই ভাবছিলাম, এইবারে সে হয়ত সটান আমাদের দিকে তেড়ে আসবে। কিন্তু ঝোপের ডালগুলো আন্দোলিত হতে দেখে বুঝলাম, সে ঢাল বেয়ে নেমে গেছে।

নিশ্চিতভাবে অন্তত একটা বুলেট তাকে জখম করেছে। এবং যত সময় যাবে তত সে আঘাত তাকে কাবু করে ফেলবে। দক্ষিণের যে উঁচু গিরিশিরাটার উত্তরপাশে আমরা রয়েছি, সূর্য একটু বাদেই

তার আড়ালে ডুব দেবে। আমার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম প্রায় পাঁচটা বাজে। এই পড়ন্ত আলোয় অভিযান চালিয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পরিস্থিতি তখন পুরোপুরি ওই নরখাদকের অনুকূলে। তার ওপর গুলি খেয়ে সে তখন রেগে আগুন হয়ে রয়েছে। সন্ধের মুখে হাঁকা করানোরও প্রশ্ন ওঠে না। তাতে অযথা কিছু প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া হবে। অতএব অগত্যা , অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা সেদিনের মত ক্ষান্ত দিলাম।

দুটো উদ্দেশ্য অবশ্যই সাধিত হয়েছে। বাঘিনীকে আমরা খুঁজে বের করেছি এবং আশা করা যায় তাকে গুরুতরভাবে জখমও করেছি যাতে সে জঙ্গলের ওই অংশটা ছেড়ে পালিয়ে যাবার মত অ বস্থে আর নেই। পরিস্থিতিটা পরদিন সকালে হাঁকা করানোর পক্ষে খুবই আশাব্যঞ্জক এবং তখন হয়তো তাকে আমরা পেড়ে ফেলতে পারবো। অতএব, যে পথে এসেছিলাম সে পথেই আমরা ফিরে চললাম। মৃতা স্ত্রীলোকটির দেহাবশেষ বা তাড় কাপড়চোপড়ের কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। পথটার ওপর পৌঁছে ঠিক যেখানটায় বাঘিনী মেয়েটিকে আক্রমণ

করেছিল সেখানে আমরা কয়েক মিনিট দাঁড়ালাম। চারপাশটা ভালো করে দেখে পরদিন সকালের ম হড়াটা কীভাবে করলে সবচেয়ে ভালো হয় সে ব্যাপারে একটা ধারণা করে নিয়ে আমরা ফিরে চললাম। এসে দেখি গ্রামবাসীদের আমরা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম তারা ঠিক সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

অনেকগুলো জিজ্ঞাসু, উৎ কন্ঠিত মুখ আমাদের দিকে চেয়ে ছিল। তাদের সব খুলে বলে শেষে বললাম, পরদিন সকালে যদি তারা অন্তত সত্তরজন হাঁকাওয়ালা (বিটার) জোগাড় করতে পারে তাহলে বাহিনীকে মারার আশা খুবই উজজ্বল। তারা মৃতার দেহাবশেষের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলতে হল, হাঁকা হয়ে গেলে পরে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজব।

সেই রাত্রে ডিনারের পর রবার্ট আর আমি কাগজ-পেনসিল নিয়ে একটা স্কেচ খাড়া করে ছকে ফেললাম, ঠিক কী হতে পারে এবং বাঘিনী যদি চলচ্ছক্তিহীন না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে পালাতে না দেওয়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা কী। এবং সে ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য গতিপথ কোনটি?

পশ্চিমদিকটায় বিস্তীর্ণ চষা জমি, কোন গাছ বা ঝোপঝাড় নেই। সুতরাং কোন আড়ালও নেই। এই সম্ভাবনাটাও আমরা মাথায় রাখলাম যে বাঘিনী এখানকার জমির প্রতিটি গজ চেনে। উত্তরে পি গুার নদীর দিকে নেমে যেতে যেতে বন ক্রমশ খোলামেলা হয়ে এসেছে। সেদিকেও আড়াল-আবডাল সামান্যই। আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে বাঘিনী পালানোর জন্য এইদিকটা বেছে নেবে না, কারণ, তা করতে গেলে তাকে তার পশ্চাদ্ধাবকদের একেবারে চোখের ওপর দিয়ে পিণ্ডার নদী সাঁতরে পেরোতে হবে। কাজেই চিন্তাটা রইল দক্ষিণ আর পূর্ব দিক নিয়ে। দু'দিকেই বন আর ঝোপঝাড় ভর্তি। অত:পর কমপাসের এই দুই বিন্দুতেই আমাদের মনযোগ নিবদ্ধ হল। একই সঙ্গে, আহত পশুর সাথে মোকাবিলার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় আমরা জানতাম, উত্তর আর পশ্চিম দিকদুটোও পুরোপুরি ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না।

আলোচনা শেষে এই আশা নিয়ে শুতে গেলাম যে গ্রামবাসীরা আমাদের ডোবাবে না আর পরদিন সকালে সব ঠিকঠাকই যাবে, বাঘিনীও খতম হবে।

পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা দলবল জুটিয়ে সাতটার সময় এসে হাজির। সবশুদ্ধ বাষট্টি জন লোক জোগাড় হয়েছে। আংরা রওনা দেব, এমন সময় ১৮ নং রয়াল গাড়োয়াল রাইফেলসের তিনজন প্রাক্তন অফিসার এসে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আগের দিনের ঘটনা তাঁরা শুনেছেন এবং

আমাদের হাঁকায় সাহায্য করবেন বলে এসেছেন। তাঁদের হাতে ছিল আধুনিক শিকারের রাইফেল। এই তিনজন জবরদস্ত সেনানি তাঁদের চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করেছেন, যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে ছিলেন, এবং তাঁদের বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মেডেল-টেডেল পেয়েছেন। এখন এঁরা গোয়ালদাম থেকে মাইল তিনেক দূরে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে এসে থিতু হয়েছেন। রবার্ট ওঁদের আমার সঙ্গে পরচয় করিয়ে দিল। এঁরা হলেন সুবেদার মেজর চমন সিং, সুবেদার ভবন সিং এবং জমাদার বলদেও সিং। রবার্ট এঁদের ভালোভাবেই চিনত। এঁদের রেজিমেন্টের প্রাক্তন সেনাদের দাবিদাওয়া এবং জমি বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে রবার্টের যে কমিটি ছিল এঁরা তার সদস্য ছিলেন।

দুটোর জায়গায় পাঁচটা বন্দুক এসে যাওয়াতে মস্ত সুবিধা হল এই যে পূর্ব আর দক্ষিণ, যে দুটো দিক দিয়ে বাঘিনীর পালাবার সম্ভাবনা প্রবল, সে দুটো ভালোভাবে সামলানো যাবে। আমরা অত:পর পুবদিকে তিন বন্দুকধারীকে রাখলাম, একজন বন্দুকধারীকে রাখলাম দক্ষিণে, যেদিকে পাহাড় উঠে গেছে, আর একজনকে রাখা হল উত্তরের ঢালে, যদি আহত বাঘিনী পাহাড় বেয়ে না উঠতে পেরে ঢাল বেয়ে নেমে যায় সে কথা ভেবে। পশ্চিমদিকে একাধিক লোককে আমরা গাছে চড়িয়ে দিলাম এই বলে যে তারা যঅদি বাঘিনীকে তাদের দিকে আসতে দেখে তবে যেন জোরে জোরে হাততালি দিয়ে তাকে দিক পরিবর্তন করিয়ে বন্দুকধারীদের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

আমরা ঠিক করলাম হাঁকাটা হবে পশ্চিম থেকে পুবে, যেদিকে অধিকাংশ বন্দুক অপেক্ষা করে থাকবে। বলদেও সিং থাকলেন উত্তরে, ভবন সিং দক্ষিণে, চমন সিং রবার্ট আর আমি পুবে। ক্রস ফায়ারিং-এর ফলে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য আমরা নিচুডালের ওক গাছে উঠে বসলাম। এর ফলে অনেকটা বেশি জায়গাও আমাদের দৃষ্টিপথে এসে গেল। হাঁকাওয়ালাদের বলে দিলাম, অল্পক্ষণ বাদে বাদে গাছে উঠে সামনেটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে তবে এগোতে।

তুমুল শোরগোল তুলে হাঁকা শুরু হল। আধঘন্টাও কাটেনি, তখন একজন হাঁকাওয়ালা গাছের ওপর থেকে তারস্বরে চেঁচিয়ে জানাল, সে বাঘিনীকে দেখতে পাচ্ছে। তার সবচেয়ে কাছে থাকা সুবেদার ভবন সিং তৎ ক্ষণাৎ তাঁর গাছ থেকে নেমে এসে হাঁকাওয়ালার গাছে, তার পাশে উঠে গেলেন। তারপর তিনিও চেঁচিয়ে বললেন, বাঘিনীকে তিনিও দেখতে পাচ্ছেন। সে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তারপর ফের গলা তুলে বললেন, বাঘিনী যেখানে রয়েছে সেখানটা তিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন। হাঁকাওয়ালাদের হুকুম দিয়ে রবার্ট , চমন সিং এবং আমি গাছ থেকে নেমে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগোলাম। যেন প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজ পরিচালনা করছেন এমন ভাবে ভবন সিং গাছের ওপর থেকে আমাদের দিকনির্দেশ করতে লাগলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে পাঁচ গজের ব্যবধান রেখে এগিয়ে চললাম।

একটু বাদে বাদে ভবন সিং দিকনির্দেশ করা বাদে বাঘিনীর থেকে আমাদের দূরত্বটাও জানাচ্ছিলেন। উনি এ-ও বলে দিলেন, বাঘিনী নড়লেই গুলি চালিয়ে দেবেন। আমরা প্রায় নি:সন্দেহ ছিলাম যে বাঘিনী আগের দিনের গুলিতেই মারা গেছে।। তবু খুব সন্তর্পণেই এগোচ্ছিলাম।

বাঘিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছে দেখা গেল, আগের দিন সন্ধ্যায় রবার্ট আর আমার দুজনের গুলিই লক্ষ্যভেদ করেছে। একটা পাকস্থলীতে, আরেকটা ফুসফুসে গিয়ে বিঁধেছে। এই দ্বিতীয় গুলিটার ফলে সে প্রচুর রক্তবমি করেছে। বস্তুত: গুলি খেয়ে সে পনেরো গজও যেতে পারেনি।

বাঘিনী ছিল বয়স্কা এবং খুবই দুরবস্থায়। তার পিছনের বাঁ পাটা দেখা গেল পঙ্গু এবং নিশ্চিতভাবেই তার প্রতিবন্ধকতার কারণ। দু'টো শ্ব-দন্ত সমেত একাধিক দাঁত ছিল না। আমরা তাকে

ক্যামপে এনে মেপে দেখলাম নাক থেকে লেজের ডগা অবধি তার দৈর্ঘ দাঁড়াল আট ফুট সোয়া পাঁচ ইঞ্চি।

জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আগে আমরা ঝোপঝাড়াগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে স্ত্রীলোকটির যৎ সামান্য দেহাবশেষ পেলাম। গোয়ালদামে ফিরে এসে ঘন্টাখানেক আমরা ওই তিন গাড়োয়ালী অফিসারের সঙ্গে আলাপচারীতায় কাটালাম। বিদায় নেবার আগে আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম দক্ষ সাহচর্যের জন্য, যা আমাদের পক্ষ থেকে খুবই স্বাগত ছিল।

আমাদের পোয়ালদাম সফর বৃথা যায়নি তবে রবার্ট আর আমি যে একাধিক মনোরম এবং উত্তেজনাপুর্ণ অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছি এটিই ছিল তার শেষ। তার লোকেদের জমিজমার বিলি বাটোয়ারা সুসমপন্ন হতে রবার্ট হিমালয়ের আকাশরেখা ছেড়ে পাড়ি দেয় সূদূর আফ্রিকার বিরল তুষারাবৃত কিলিমানজারো পর্বতের সানুদেশে কফির চাষ করবে বলে।

ছবি: মৌসুমী

ভারতের বীর কিশোর কিশোরী

মহাশ্বেতা

টিভিতে ২৬ শে জানুয়ারি, মানে গণতন্ত্রদিবসের প্যারেড দেখেছ কখনও? বিশাল জমকালো এই প্যারেডে অংশ নেয় ভারতীয় সেনাবাবাহিনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের কলাপ্রদর্শকেরা। এই প্যারেডেই আরেকটা খুব মজার জিনিস হয়। হাতির পিঠে চেপে প্যারেডের সঙ্গে সঙ্গে চলে কিছু ছেলেমেয়ে। তারা সকলেই প্রায় তোমাদের বয়সী কিম্বা একটু বড়। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তারা এমন সব দু:সাহসিক কাজ করেছে যা বড়রাও করতে ভয় পাবে। কেউ হয়তো অচেনা মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে, কেউ বা বাড়ির লোককে রক্ষা করেছে বড় কোন অঘটনের হাত থেকে। তাদের এই সাহসিকতা ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তাদের বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়, দেয়া হয় মেডেল, সার্টিফিকেট ও টাকা।

এবারকার বইয়ের নাম 'ভারতের বীর কিশোর কিশোরী'। এই বইতে সেই বিশেষ মেডেল পাওয়া ছ'জন ছেলেমেয়ের গল্প রয়েছে, যারা নিজের প্রাণের কথা না ভেবে ছুটে গেছে অন্যদের বাঁচাতে। ধরা যাক গোবিন্দনের কথা। ক্লাস এইটের ছাত্র, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, এমন সময় দেখে এক অন্ধ ভিখিরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে আর সেই রাস্তা ধরে দানবের মতো এগিয়ে আসছে একটা লরি। অন্ধ ভিখিরিকে চিৎ কার করে সেই কথা বলতে সে কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার মধ্যিখানে। গোবিন্দন দেখলো বুড়োর কাছে গিয়ে তাকে সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অতএব নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না করে অসমসাহসী ছেলেটি এক দৌড়ে গিয়ে বুড়ো ভিখিরিকে নিয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তার অন্যদিকে। এক মুহুর্ত দেরি করলেও হয়তো লোকটি বাঁচতো না।

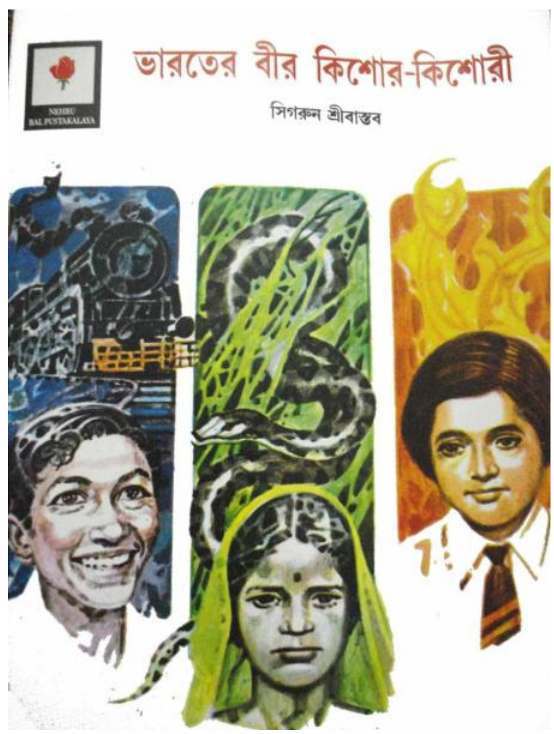

এইরকম মোট ছ'খানা ঘটনা নিয়েই 'ভারতের বীর কিশোর কিশোরী'। পড়তে ভুলো না।

নামঃ 'ভারতের বীর কিশোর কিশোরী'
লেখকঃ সিগরুন শ্রীবাস্তব (অনুবাদঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য)
দামঃ ১৬ টাকা
প্রকাশনীঃ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সাইকেল

—ছড়ারু—

সবে নতুন সাইকেলে পা,
দিন সাতেক এমনি চলে
যেইনা সিটে উঠে বসা
অমনি দূরের পিচরাস্তা
ছাড়িয়ে গলির মোরাম।

মোরাম ধুলোর লালমাখা পা
কপাল ভেজায় ঘাম
একটানা শিরশির বুকেতে
বাজছে বাঁশি কোথাও
উদাস সুরে আবিল মায়ায়
ডাকছে যে তার নাম।

আয় আয় আয়,এইখানে বুনো
মাটির গন্ধ পাবি,
ঠাঁই বাবলার ঝুপসি ছায়ায়
মেঘলা দুপুর জুড়ে
দু-দন্ড বসে অদেখা গ্রামের
কামরাঙা ফল খাবি।

আয় চলে আয়—
এমনি করে রাস্তা কাছে আসে-
বুক পেতে দেয় জলা, ঘাসের
প্রান্তদেশে মাঠ
পায়ে পায়ে প্যাডেল ঘোরে
রোমাঞ্চে আনমনে,
ধূসর রোদে মিলিয়ে যায়
গলির রাজ্যপাট।

আয় আয় আয় , এমনি করে
বিরামবিহীন দুপুর
গড়িয়ে যায় সাঁঝবেলাতে-
একটু দুটি তারাও জ্বলে
বুকের ভেতর জেগে ওঠে
নিশ্চিন্দিপুর।

ছবি মৌসুমী

কোলে বাড়ির লোকে

সুভাষ ঘোষাল

গল্প বলি শোনো
কোলেবাড়ির ছোটোছেলের তুলনা নেই কোনো।

সূর্য গেলে পাটে
এক-থালা-ভাত শেষ ক'রে সে সাঁতার কাটে ঘাটে।
চুল পেকেছে বলে
দু-হাত দিয়ে কয়লাগুঁড়ো মাথায় মাখে ডলে।
কলম থাকে কানে
লিখতে গেলে বাংলাটা নয় ইংরেজিটা আনে।
যখন বৃষ্টি পড়ে
ব্যাংয়ের ছাতার খোঁজ করে সে কোলাব্যাংয়ের ঘরে।
কান্না পেলে হাসে
মাঠের ওপর ডিগবাজি খায় সবুজ ঘাসে ঘাসে।
কোলেবাড়ির কোলে
দশ-বারোটা বল ঢুকেছে এবারও তার গোলে।

ছবি : সৌভিক

খাদ্য-খাদক

আবু হোসেন

‘রাম, শ্যাম, যদু, মধু, হরি ও হরীশ
ছয় ভাই মিলে তোরা বল কী করিস?’

‘সুখে থাকি ছয়জনে কোন কাজ নাই
সারাদিন ডাল-ভাত চচ্চড়ি খাই।
খুন্তি, কড়াই, ঝামা, ডেকচি ও হাঁড়ি
খিদে পেলে সেই সবই খেয়ে নিতে পারি।
আলনা ও আলমারি ধুতি ও কাপড়,
কাঁথা, মাটি, ছাতা, বাটি, হাতা কি হাপর
উত্তুরে হাওয়া, ছুরি, ফরাসি আতর,
গোঁফদাড়ি, ঘর-বাড়ি, কাঠ ও পাথর।
যাই পাই, তাই খাই, বড় ভালো ছেলে
আমগাছ, তিমিমাছ যদি হাটে মেলে,
কেটে বেটে ধুয়ে মুছে, নুনজল গুলে
শুখো চচ্চড়ি রাঁধি তেলে ভেজে তুলে।’

‘আহা বাহা বেশ বেশ থ্যাং কিউ ভাই
ইন্টারভিউ শেষ আজ তবে যাই?’

‘আরে আরে যাও কোথা দাঁড়াও খানিক
একটুকু বোস দেখি লক্ষ্মী মানিক।
ধরে গেছে আঁচ আর চেপেছে কড়াই
কেটেকুটে ধুয়ে মুছে রান্না চড়াই’

‘আরে নানা থ্যাংকিউ আজ মাপ দিন
এসে বসে খেয়ে যাবো আর একদিন।
তাড়া আছে আজ যাবো আরও এক বাড়ি--’

‘বল কী হে? এইভাবে ছেড়ে দিতে পারি?
না হে দাদা, যাওয়া-টাওয়া হবে না তো আর,
আজ রাতে রেঁধে খাবো ঘণ্ট তোমার।’

ছবি: সোমা

বন্ধু পাতানো

সুমন কুমার নায়েক

ফুরুৎ ফারুৎ উড়ছে চড়াই
বসছে গাছের মগডালে
‘অ্যাই পাখিটা, করছোটা কী
পড়া ফেলে সক্কালে?
তোমায় বুঝি মা বকে না?
করতে হয়না হোমটাস্ক?
আন্টি বুঝি এমনিই দেয়
ভূগোল অংকে ফুল মার্কস?
তোমার তো ভাই ভারী মজা!
খেলে বেড়াও সারাটা দিন
আমার তুমি বন্ধু হবে?
খেলব দুজন ছুটির দিন!

ছবি: ইন্দ্রশেখর

সারা বছরের ছড়া

জ্যোতির্ময় মল্লিক

বোশেখ মাসে ঘূর্ণিঝড়ে,
হামলে পড়ে কুঁড়ে ঘরে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে মধুর ফল,
করছে রসেই টলমাটল।

আষাঢ় মাসে মুষল ধারায়,
ঝম্ ঝমা ঝম্ বৃষ্টি ঝরায়।
শ্রাবন মাসে মেঘের বাদল
আকাশ পথে বাজায় মাদল।

ভাদর মাসের প্রবল ঢলে,
ভরল বাওড় অচিন জলে।
আশ্বিনেতে মেঘের শেষ,
জাগায় মনে খুশির রেশ।

দিকে দিকে হেমন্ত সুর,
কার্তিকে ভাই রয়না দূর
আঘণ মাসে সোনার ধানে,
মন ভরে দেয় গানে গানে।

পৌষালি দিন হিমেল বায়,
তীব্র শীতে হুল ফোটায়।
মাঘের শীতে সোঁদর বনে,
ভয় ধরে যায় বাঘের মনে।

ফাগুন মাসে অঢেল ফুল,
দুলছে দেখ দোদুল দুল।
চৈত্র মাসের ভীষণ খরায়,
প্রখর দারুণ আগুন ঝরায়।
এমনি ভাবে বছর শেষ,
কি অপরূপ বাংলাদেশ।

ছবি: সোমা

সাহেব-দেশ

ঈশিতা ভাদুড়ী

সাহেব-দেশে পুলিশ মামা
ভীষণ কড়া সফেদ জামা
মানুষ যদি করেন দোষ
পুলিশ তবে দেখান রোষ
আইন ফাঁকে ফাইন হয়
মুকুব নেই ভীষণ ভয়
মানুষ-জন ভালোও বাসে
বিপদ হলে পুলিশ পাশে
বাকিংহামে থাকেন রানি
সেই সে দেশ নামটি জানি
হাসেন না যে সেথায় কেউ
শিশুও চুপ কাঁদেনা ভেউ
কত কি আছে বলতে বাকি
নামী মানুষ মোমের নাকি
তাহার নাম মাদাম টুশো
আর কী আছে বলছি রোসো
দোতলা বাসে নেইকো ছাদ
মানুষ দেখে আকাশে চাঁদ
লম্বা পথ নদীর তলে
টানেল না কি কীসব বলে
মানুষ হাঁটে গাড়িও যায়
সাহেব তারা দুগ্ধ খায়
ট্রাউট মাছে টমাটো সস
কত যে আছে ফলের রস
তাদের কথা ভাবছো নাকি
আরো যে আছে বলার বাকি
শুনবে যদি কানটা এনো
নদীর নাম থেমস-ই জেনো।

ছবি ইন্দ্রশেখর

মামার কথা

তাপস শংকর ব্রহ্মচারী।

আনল কিনে নতুন জামা,
খোকন সোনার নকুড় মামা।
নকুড় মামা যাবেন কাশী,
সংগে যাবে কুট্টি মাসি
কুট্টি মাসি কাশী গিয়ে,
পিসির মেয়ের দেবেন বিয়ে।
জামাই থাকে শিমলাগড়ে-
ঐখানেতেই চাকরি করে।
ঐ জামাই এর খুড়তুতো ভাই-
মানিক চাঁদের ভাইয়ের বেয়াই।
বাগবাজারের খালের কাছে,
মানিক চাঁদের দোকান আছে।
বড় দোকান সবার চেনা,
ওখান থেকেই জামা কেনা।
খোকন সোনার রঙিন জামা-
কে এনেছে? নকুড় মামা।

ছবি: সোমা

ভালো রেখো

ইন্দ্রনাথ

বর্ষায় জল জমে গরমেতে হাসফাঁস,
এইমতো কেটে থাকে আমাদের বারোমাস।
শীত, সে তো তিনদিন থাকতে না থাকতেই
উসখুস করে বলে দক্ষিণে সুখ নেই।
শরতের মাসে শুধু কটা দিন মাত্তর
জননী দুর্গা এলে ভরে থাকে চত্বর।
গরীব অথবা ধনী সেয়ানা কী চালাকের
প্রার্থনা একটাই ভালো রেখো আমাদের।

ছবি ইন্দ্রশেখর

নির্মল করো ধরা

মুকুল মাইতি

ভোরের পাখিরা নানা সুরে গায়
জীবনের জয়গান
বুঝিনা আমরা কী যে বলে ওরা
ভাবি শুধু কলতান
মনে মনে ভাবি আমাদের ওরা
কিছু বলে নিশ্চয়
বুঝিতে পারিনা পারেনা বোঝাতে
সে ভাষা তো জানা নেই
মনে হয় যেন বলে বারে বারে
নহ প্রাণী একা তুমি
এই পৃথিবীতে আমরাও আছি
আমারো এ বাসভূমি
দূষণে ভরেছো জল ও বাতাস
কেমনে বাঁচি গো মোরা
ধ্বংসের মুখে দিওনা গো ঠেলে
নির্মল করো ধরা।

ছবি: সোমা

দিনরাত্রির গল্প

ছড়া ও গ্রাফিক্স: দেবজ্যোতি

রং-তুলি: মৌসুমী

।১।

মাটির নিচে আছে আলোর খনি
কেউ জানে না কেবল আমি জানি
আর আছে দিন কুশির বাসিন্দারা
মাটির নিচে রাজ্য করে তারা
মালিক তাদের দিনকুশিদের রানি।

।২।

দিনকুশিরা ছোট্ট, বেঁটে, কালো
অন্ধকারেও দিব্যি দেখে ভালো
হাজার যোজন সুড়ঙ্গপথ জুড়ে
অন্ধকারেই বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
মাণিক দিয়ে জ্বালায় ঘরের আলো।

।৩।

পাহাড়গুলোর শেকড়বাকড় ছেড়ে
আরও নিচে নামলে গিয়ে পরে
দেখবে হঠাৎ আঁধার গেছে কেটে
মাণিক হাতে হাজার বেঁটে বেঁটে
দিনকুশিরা চলছে সারে সারে।

।৪।

গাঁইতি দিয়ে পাথর ফুটো করে
তুড়ুক লাফে যাচ্ছে কেমন সরে
গর্ত বেয়ে ঝরছে আলোর ধারা
সাবধানে তার সামনে গিয়ে তারা
স্ফটিক পেতে রাখছে তাকে ধরে।

।৫।

কাজের শেষে সবাই গেলে চলে
দিনকুশিদের ছোট্ট যত ছেলে
আলোর গুঁড়ো কুড়িয়ে নিয়ে হাতে
চাঁদ হারানো আঁধার কালো রাতে
আকাশ জুড়ে তাদের নিয়ে খেলে

।৬।

হাতের মুঠোয় আলোর দানা পুরে
দশ দিগন্তে তাদের ফেলে ছুঁড়ে
কেউ গনগন কেউ বা ধিকিধিকি
আকাশ জুড়ে তাদের চিকিমিকি
ছড়ায় তারা ছড়ায় উড়ে উড়ে।

।৭।

আকাশ ছোঁয়া পাহাড় হিমালয়
তারও শিকড় যেইখানে শেষ হয়
তারও নিচে হাজার যোজন দূরে
দিনকুশিদের রামটামাটানপুরে
আলোর ছটা ছড়ায় আকাশময়।

।৮।

গুহায় ভরা রামটামাটান দেশে
নানান দেশের দিনকুশিরা এসে
গাঁইতি হাতে কঠিন পাথর খুঁড়ে
রত্নফসল ফলায় মাটি জুড়ে
তার ঝিলিকে আঁধার ওঠে হেসে।

।৯।
কঠিন কালো আঁধার সুড়ং বেয়ে
আলোর ঝলক ওপরপানে ধেয়ে
বাতাস বেয়ে সটান চলে ছুটে
একটি লাফে মেঘের গায়ে উঠে
ছড়িয়ে যায় রামের ধনুক হয়ে।

।১০।
ওপর তলায় মানুষ ছিল যারা
অন্ধকারেই থাকত সবাই তারা
সকাল বিকেল রাত্রি তাদের কালো
তারই ভেতর একটুখানি আলো
ছড়িয়ে যেত আকাশভর্তি তারা।

।১১।

আলোর খোঁজে সাতটা বুড়ো শেষে
হাজির হল দিনকুশিদের দেশে
রানির দুটি পায়ে প্রণাম করে
একশো মোহর রাখল থালায় ধরে
'কী চাও বলো,' বললো রানি হেসে

।১২।

'ওপর তলায় অন্ধকার যে বড়ো
জয় রানিমা, একটা কিছু করো
তারার আলোয় যায় না দেখা ভালো
যেদিকে চাই কেবল কালো কালো
ওপরতলার আকাশ আলোয় ভরো

।১৩।

'আচ্ছা বাছা, তাই হবে' এই বলে
রামটামাটান ক্ষেতের দিকে চলে
গেলেন রানি, একটু পরেই ফিরে
এলেন, হাতে মস্ত একটা হিরে
ঝরছে আলো হাতের মুঠো গলে।

।১৪।

মস্ত হিরে মাথার ওপর নিয়ে
রামধনুকের লম্বা সেতু বেয়ে
ছাড়িয়ে গিয়ে হিমালয়ের চুড়ো
উঠতে উঠতে সাতটা বেঁটে বুড়ো
দূর আকাশে হাজির হল গিয়ে।

।১৫।

সমস্ত দিন মাথায় হিরে ধরে
আকাশ জুড়ে সাতটা বুড়ো ঘোরে
সাতসমুদ্র সপ্তদ্বীপের দেশে
হীরের আলোয় আকাশ ওঠে হেসে
হিরের আলোয় পৃথিবী যায় ভরে

।১৬।

সন্ধেবেলায় ব্যস্ত দিনের শেষে
পৌঁছে গিয়ে অস্তাচলের দেশে
সাতটা বুড়ো যখন শুতে যায়
আকাশ জুড়ে ওমনি আঁধার ছায়
তারারা সব ওমনি ওঠে হেসে।

তিন বোন

আজ এসো তোমাদের তিন বোনের গল্প শোনাই। তাদের নাম বিদ্যা, পূজা আর নন্দা। তাদের বাবা মহাদেব রাইকোয়ার ছিলেন বাসের কণ্ডাকটর। টানাটানির সংসার ছিল, কিন্তু চলে যাচ্ছিল একরকম। মহাদেব জল বড় ভালবাসতেন। নর্মদা নদীর ধারে তাঁর ঘর।অবসর পেলেই তিন মেয়েকে নিয়ে চলে যেতেন মা নর্মদার কোলে। হাওয়া ভরা টিউব কোমরে বেঁধে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের জলে ছেড়ে দিতেন। আলাপ করিয়ে দিতেন নদীর স্রোতের সঙ্গে। এইভাবে ছোটবেলা থেকে জলের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তিন বোনের।

সমস্যার শুরু হল ২০০৫ সালে এসে। একদিন একটা দুর্ঘটনায় ভীষণ চোট পেলেন বাবা। জীবন নিয়ে টানাটানি চলল বেশ কিছুদিন ধরে। আমার দেশে সাধারণ মানুষের জন্য এখনও তো সামাজিক নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা নেই! কাজেই গরিবের সংসারে যেটুকু ধুলোগুঁড়ো জমা ছিল সেই সবই গেল বাবার চিকিৎ সায়। একসময় বেঁচে ফিরলেন মহাদেব কিন্তু আর বাইরে বেরিয়ে কাজ করবার মত অবস্থা রইল না তাঁর।

এইবারে সংসারের হাল ধরলেন মা রেখা রাইকোয়ার। হোসাঙ্গাবাদে একটা ফলের রসের ছোট্ট দোকান দিয়ে বসলেন তিনি। তারই রোজগারে কোনমতে ভেসে চলল সংসারের নৌকো।

তিন বোন ওদিকে পড়াশোনা করে আর সেইসঙ্গে আরও একটা গুণের চর্চা করে--তিন বোনই ভালো নৌকো বাইতে পারে।

পরের বছর, ২০০৬ সালে এলো নতুন বিপদ। কয়েকদিনের অসুখে মা রেখা রাইকোয়ার চলে গেলেন। তিন বোনের বয়স তখন ১৯,১৮ আর ১৬। মহাদেব এইবারে ফলের রসের স্টলের দায়িত্ব নিলেন। ওদিকে বিদ্যারা তিন বোন করেছে কি, একদিন রাজ্য সরকারের জল ক্রীড়া আকাদেমিতে গিয়ে নৌকো বাইচ-এর খেলা শেখবার ট্রায়াল দিয়ে এসেছে। তাতে দেখা গেল তিনবোনেরই এ ব্যাপারে বেশ সম্ভাবনা আছে। ২০০৭ সালে তাই মহাদেব শত অভাব ও সমস্যাকে মেনে নিয়েও তিন বোনকেই ভর্তি করে দিলেন রাজ্য সরকারের জল ক্রীড়া আকাদেমিতে।খরচ খরচা লাগেনা বিশেষ। তবু চারটে ম নুষের মুখের খাবারের সংস্থান করতে করতে অসুস্থ মহাদেব হাঁফিয়ে পড়ছিলেন। মেয়েরা সাহায্য করত খুব। তবুও।

এইভাবে আরও দুটো বছর কাটতে দুর্ভাগ্য আবার আঘাত হানল। অত ধকল আর সইছিল না অসুস্থ মহাদেবের। ২০০৯ সালে চোখ বুঁজলেন তিনিও। তিনটে মেয়ে এবারে অনাথ হল একেবারে। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল বাইশ বছরের দিদি বিদ্যার কাঁধে।

ছোটবেলা থেকে অভাবের সংসারে পড়াশোনা শেখা তো হয়নি বিশেষ! কে তাকে চাকরি দেবে? কিন্তু নৌকো বাইবার বিদ্যায় ততদিনে সে বেজায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। আকাদেমিই এবারে এগিয়ে এলো তার সহায়তায়। সহকারি কোচ হিসেবে আকাদেমিতে চাকরিতে ঢুকল সে। অন্যদের সাথে সাথে নিজের বোনদেরও প্রশিক্ষণের ভারও তুলে নিল নিজের হাতে।

তাদের সাধনার ফল ফলতে শুরু করেছে এইবারে। দেশের মুখ এবারে উজজ্বল করতে শুরু করেছে তিন বোন। রোয়িং, কায়াকিং, সিলিং ও ক্যানুইং এই চার ইভেন্টেই জাতীয় স্তরে মেডেল

জিতে চলেছে তারা। সাঁতারেও দক্ষতা কম নয় তাদের। বাবার কাছে কোমরে টিউব বেঁধে নর্মদায় সাঁতার শেখা শুরু করা বিদ্যা তো ভারতীয় স্তরের ইভেন্টগুলোতে এখন ম ধ্যপ্রদেশ রাজ্য সাঁতারু দলেরও নিয়মিত সদস্য। এখন তিন বোন তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের মুখ উজজ্বল করবার জন্য।

২০০৯ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে ডাক পেয়েছিল বিদ্যা। যেতে পারে নি। কারণ বাবা তখন
মৃত্যুশয্যায়। তবে তাতে তার উৎ সাহে ভাটা পড়েনি কোন। দেশের প্রতি ও নিজের ভাইবোনদের প্রতি তার কর্তব্য সে পালন করে চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

শেষে একটা হিসেব দিই শোন। জাতীয় স্তরের নানা ইভেন্টে রাজ্যের প্রতিভু এই তিন ক্রীড়াবিদের জীবন কাটে এইভাবে-- বড় দিদি বিদ্যা মাইনে পায় তিন হাজার টাকা। তার থেকে এক হাজার টাকায় তিন বোনের সংসার চালায়, আর দু হাজার টাকা পাঠায় ছোট ছোট দুই ভাই শেখর আর সুশীলের খাওয়াপরা আর পড়াশোনার জন্য।

জয়ঢাক তোমাদের তিন বোনকেই সেলাম জানায় বিদ্যা,পূজা আর রেখা। তোমাদের মত মানুষ যদি শয়ে শয়ে তৈরি হয় তাহলে আমাদের দেশটা সোনার দেশ হয়ে যাবে একদিন। ভালো থেকো তোমরা। আরো বড় বড় যুদ্ধে জিতে দেশের মুখ উজজ্বল কোরো। উজজ্বল কোরো নিজেদের মুখ।

ধাঁধা

জয়ঢাকের পাঠকদের কাছ থেকে ই মেইলে যেসব চিঠি আসে তা আমরা জয়ঢাকের নানান ছড়া-গল্প-আরও নানা লেখার লেখকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি। মানে তুমি যদি খবর দাও যে চিংকুমারী বা মহাশ্বেতা বা অরিন্দমদাদা বা শান্তনুদাদার লেখাটা দারুণ হয়েছে কিংবা বিচ্ছিরি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেয়া খবর চলে যাবে তাদের কমপিউটারের ডাকবাক্সে। তা সেই করতে গিয়ে এই মহা বিপদটা হয়েছে।

এখন তোমরাই ম্যাও সামলাও, বিশেষ করে ধাঁধা নিয়ে ইমেইল পাঠিয়েছিলো যে, সেই বন্ধুকে বলছি, তুমি ভাই সকলের আগে এই জাম্বো ধাঁধাটার জবাব বের করবে , কারণ দোষটা তোমার।

ব্যাপারটা বেশ গুরুচরণ। পুজোর ধাঁধা চাইতে গিয়ে দেখি মামামনি প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। আমায় দেখেই বলে, ''শোন ইন্দ্র। আমায় ইমেইল করে একজন লিখেছে, জয়ঢাকের ধাঁধা নাকি বেজায় সহজ হয়ে গেছে। আমি কেবল সহজ ধাঁধাই দিই বুঝি?'' বললাম, ''কই না তো! আমার তো সবই বেশ কঠিন লাগে। তোমায় বলবো বলে ভাবছিলাম একদিন।''

''আরে দুর! তোর মতো মূর্খের কথা কে বলছে। দুয়ে দুয়ে বাইশ বলেছিলি তুই সেবারে, আমার মনে আছে। আমি বলছি আর এক ছোকরার কথা। আমায় কমপিউটারে চিঠি লিখে বলে কিনা, ''মামামণি আপনার যেকোন ধাঁধা আমি মিনিটে দুখানা করে সলভ্ করতে পারি। আপনি পেনশন নিন!'' তা এইবারে সে ছোকরাকে গোটা দুই ধাঁধা দেবো। দেখি তার বুদ্ধির কতো দৌড়। নে লিখে নে:

প্রথম ধাঁধাঃ

একটা রাস্তায় পাঁচটা বাড়ি আছে। বাড়িগুলোতে যথাক্রমে পাঁচজন বিভিন্ন আলাদা দেশের মানুষ বাস করেন। প্রত্যেকে আলাদা পানীয়ের ভক্ত এবং প্রত্যেকে আলাদা রঙের জামা পরেন ও আলাদা আলাদা পুষ্যি রাখেন। বৃটিশ ভদ্রলোক থাকেন লাল রঙের বাড়িতে। সুইডিশ ভদ্রলোক কুকুর পোষেন। ড্যানিশ ভদ্রলোক চায়ের ভক্ত। সাদা বাড়ির ঠিক বাঁপাশে সবুজ বাড়ি দাঁড়িয়ে। সবুজ বাড়ির মালিক কফি খান। লাল জামা পরেন যিনি তিনি পাখি পোষেন। হলদে বাড়ির মালিক বেগুনি জামার ভক্ত। ঠিক মাঝখানে যে বাড়িটা তার মালিকের প্রিয় পানীয় হল দুধ। প্রথম বাড়িটায় থাকেন একজন নরওয়েজিয়ান। পিংক জামাধারী বেড়ালওয়ালার পাশের বাড়ি থাকেন। বেগুনি জামার পাশের বাড়িতে ঘোড়াওয়ালার নিবাস। সবুজ জামা বেলের পানা খান। জার্মান ভদ্রলোক নীল শার্ট পরেন। নীল বাড়ির পাশে থাকেন নরওয়েজিয়ান। পিংক জামাধারী যার পাশে থাকেন তিনি শুধু জল খান। কেউ একজন ম াছ পোষে। মাছটা পোষে কে ?

দ্বিতীয় ধাঁধা:

এক শহরে কিছু লোক কেবল সত্যবাদি আর বাকি সব লোক কেবল মিথ্যেবাদি। সেখানে একদিন বাজারে ক, খ, গ নামে তিন শহরবাসীর ঝগড়া লেগেছে। বাইরের শহরের অন্য একজন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে ক-কে জিজ্ঞাসা করল, ভাই আপনি সত্যবাদি না মিথ্যাবাদি? 'ক' যে জড়িয়ে মড়িয়ে কী বলল তার কিছুই বোঝা গেল না। লোকটা তখন 'খ'বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা উনি কী

বললেন? তাইতে 'খ' বাবু বলেন , 'ক' বলেছে ও মিথ্যেবাদি। শুনেই 'গ'বাবু তেড়ে এসে বলেন, না না, 'খ'বাবুকে বিশ্বাস করবেন না। ব্যাটা মিথ্যে কথা বলছে। 'ক' বাবু দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। বাইরের শহরের লোকটা তখন বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ 'ক'বাবু তার কাছে এসে বলেন, 'শোনো হে ছোকরা, তোমার মনের ধন্দ সাফ করে দি। আমার বউ যদি সত্যবাদি হয় আমি তাহলে একটা ডাহা মিথ্যেবাদি। কি, বুঝলে তো?

বলো দেখি 'ক'বাবু প্রথমবার আসলে কী বলেছিলো?

তৃতীয় ধাঁধা :

ওপরের ধাঁধায় 'খ' আর 'গ'-র মধ্যে কে সত্যবাদি আর কে মিথ্যেবাদি?

চতুর্থ ধাঁধাঃ

'ক'বাবু আর তাঁর বউ-- কে সত্যবাদি আর কে মিথ্যেবাদি?

কুইজঃ

১। কোন গ্রন্থিটাকে পিস্তলের মত দেখতে?

২। কোন গ্রন্থিটাকে বরবটির বিরাট বড়ো দানার মত দেখতে ?

৩। বর্ণান্ধতা পরীক্ষার জন্য যে পরীক্ষাটা করা হয় তার নাম কী?

৪। এক দিনে হৃৎপিণ্ড কতবার সংকুচিত-প্রসারিত হয়?

৫। মস্তিষ্কের শতকরা আশিভাগ উপাদান কী?

৬। মস্তিষ্কে কত নার্ভ কোষ থাকে?

৭।মানুষের চামড়ার প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কত ব্যাক্টেরিয়া থাকে?

৮। শরীরের ক্ষুদ্রতম হাড় কোনটা?

৯। শরীরে কতগুলো পেশী আছে?

১০। শরীরের সবচেয়ে লম্বা পেশী কোনটা?

সঙ্গের ছবিটা কীসের বলো দেখি? যা আন্দাজ করবে তার সব ভুল হবে। এটা হল রায়ো ডি জেনেইরোর কার্নিভ্যালের সময় তার সাম্বোড্রোমে সেখানকার সাম্বা স্কুলের একটা প্রদর্শনীর ছবি। সারা দুনিয়ার সংস্কৃতি সেখানে একাকার হয়ে যায় কার্নিভ্যালের উৎসবে। এইবারের মজার ইন্টারনেট-এ রইলো কার্নিভ্যাল নিয়ে কিছু সাইটের খবর।

গুড ফ্রাইডের আগের চল্লিশ দিন ধরে লেন্ট-এর ব্রত পালন করে খৃস্টানরা। এটা অনেকটা মুসলমানদের রমজানের রোজা রাখবার মতো ব্যাপার। অ্যাশ ওয়েডনেসডে নামের এক বুধবারে শুরু হয় ইস্টার। ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক খৃস্টানেরা সেদিন হিন্দু সাধুরা যেমন ছাইয়ের তিলক আঁকেন সেইরকম করেই কপালে ছাই দিয়ে তিলক কাটেন। তবে সে তিলকের চেহারাটা হয় ক্রুশের মত।

এর পরের চল্লিশ দিন ধরে চলে প্রার্থনা, উপবাস ও আরাধনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে পবিত্র করবার পালা। অবশেষে , গুড ফ্রাইডে(যিশুর ক্রুশে চড়বার দিন)-র পরের দিন শেষ হয় লেন্ট-এর ব্রত।

তা লেন্টের উপবাস ও প্রার্থনার দিনগুলি শুরু হবার আগে রোমান ক্যাথলিক দুনিয়া তিনদিনের জন্য এক বিরাট আনন্দ উৎসব করে। তাকে বলে কার্নিভ্যাল (শব্দটার আক্ষরিক অর্থ হল রিমুভাল অব মিট।) ২০১০-এর দুনিয়াজোড়া কার্নিভ্যালের রঙিন ও মনোমুগ্ধকর ছবির সংগ্রহ যদি দেখতে চাও তাহলে নিচের ওয়েবসাইটটাতে ঘুরে দেখতে পারো। (এখানে কার্নিভ্যালের একটা ফটোতে, এমনকি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও দেখা মিলবে।)

http://www.boston.com/bigpicture/2010/02/carnival_2010.html

এই ওয়েবসাইটটিতে অবশ্য আমাদের ভারতবর্ষের কার্নিভ্যালের কোন ছবি নেই। ভারতের গোয়ার কার্নিভ্যালের ছবি দেখতে হলে এই জয়গায় দেখতে পারো:

http://www.fotopedia.com/albums/0dc4c049-c716-4ac9-8524-a6473b81fd7f/entries/b0d9b3b0-545e-4b35-bddf-6c0b3276e78f

তাছাড়া , লেন্ট উৎসবের সম্বন্ধে জানতে হলে এই সাইটটা দেখে নিও:--

http://www.crivoice.org/cylent.html

জানো কি?

টিটোদের স্কুল থেকে সেদিন ডিবেট কমপিটিশনে নিয়ে গিয়েছিলো। পুলিশের এক হোমরা চোমরা বড়কর্তা তার বিচারক হয়েছেন। ডিবেটের বিষয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং। টিটো শিওর ছিলো ও-ই ফার্স্ট হচ্ছে এবারে। নেট সার্চ করে যা মেটেরিয়াল নামিয়েছে, যাকে বলে লা জবাব। লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপরে ওদের নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সেখানে স্ট্যান্ডার্ড টু থেকেই ও ডিবেটে ফার্স্ট হয়ে আসছে। আর এ তো হল কিছু কমনপ্লেস স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কমপিটিশান।

মুশকিলটা হল ডিবেটের আসরে গিয়ে। টিটোর আগে দুজন বললো। একজন দমদম বিদ্যামন্দিরের স্টুডেন্ট আর অন্যজন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট। দুটোই বাংলু, মানে বং ল্যাঙ্গোয়েজ। ডিসগাস্টিং। এদের স্কুলে এটাও শেখায় না যে পাবলিক প্লেসে যেখানে কসমোপলিটান ক্রাউড থাকে সেখানে কখনো কোন ভারনাকিউলার ল্যাংগুয়েজে কথা বলাটা ডিসকার্টিয়াস্। তাতে অনেকে হয়তো বুঝতেই পারবে না। যেমন টিটো। ও তো ওই কলাবিনুনী বাঁধা দমদম স্কুলের মেয়েটার স্পিচ-এর কন্টেন্ট অর্ধেক ধরতেই পারলো না। এনিহাউ, থার্ড-এ টিটোর টার্ন এলো। পোডিয়ামে গিয়ে যেই না বলতে শুরু করেছে, গুড মর্নিং লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, টুডে আই শ্যাল স্পিক এগেইন্স্ট দ্য টপিক----- অমনি সেই হোমরাচোমরা পুলিশ কর্তা একগাল হেসে টেবিলে একটা টোকা দিয়ে বলেন, ‘‘বিতর্কটা কিন্তু বাংলায় হচ্ছে শৌভিক। ইংরিজি বললে চলবে না যে!’’

কাঁচুমাচু মুখে খানিক চেষ্টা করে স্টেজ থেকে নেমে গেল টিটো। টিভির ক্যামেরায় সবটা উঠে গেল। সন্ধেবেলা সেটা টেলিকাস্ট হতে বন্ধুমহলে যাকে বলে স্ক্যান্ডাল! মা তো সেই জাজের ওপরে রেগে যাকে বলে টং। বলে কাগজে এই নিয়ে চিঠি লিখবে। ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এতো অবসেশন থাকলে, আর ইংরিজি বা অন্যান্য ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ একেবারে ছোটবেলা থেকে শিখতে এনকারেজ না করলে দেশের ভবিষ্যৎ থাকবে না কোন।

বাবা বসে মুচকি মুচকি হাসছিলো। হঠাৎ বলে, ‘‘ কেন?’’

মা বলল, ‘‘সিমপল। দ্য এনটায়ার ওয়ার্ল্ড স্পিকস দোজ ল্যাঙ্গুয়েজেস অনলি! হু স্পিকস্ ইওর বং অর সে তাম্বি ল্যাংগুয়েজ?’’

বাবা এইবারে জোরে জোরে হেসে ফেলল, তারপর পাশে টেবিলে রাখা ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে ইমেল ক্লায়েন্টা সরিয়ে গুগলে গিয়ে একটু সার্চটার্চ করে স্ক্রিনে কয়েকটা তথ্য নিয়ে মাকে দেখালো। এসো আমরাও দেখি সেই তথ্যগুলো--

১। পৃথিবীর বাইশ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা।
২। চৈনিক মান্দারিন ভাষায় কথা বলেন ১১৫ কোটি মানুষ।
৩। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কথা বলেন তিনটি দেশের ১২৩ কোটি মানুষ। (এতে উর্দুও ধরা আছে।)
৪। সে তুলনায় ইংরিজি ভাষা মাত্রই ১০০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা।
৫। ফরাসি বলেন বিশ্বের কুড়ি কোটি মানুষ।
৬। পৃথিবীতে যত মানুষ ফরাসী জানেন তার চেয়ে দু কোটি বেশি মানুষ বাংলা জানেন।
৭। জার্মান ভাষায় কথা বলেন আরও কম মানুষ---মাত্র সাড়ে ষোল কোটি।
চলো , বাংলা শিখি।

এইবারে সবুজ
ত্রিভুজের অক্ষর
গুলো দিয়ে সঙ্গের
ছবিটার একটা
জুতসই নাম দাও-

অবিশ্বাস্যঃ

এই নরকের জানালা খুলে দিয়েছে মানুষের তৈরি একখানা বিস্ফোরণ।

মজার খেলাঃ

সাতটা সমকোণী ত্রিভূজ দিয়ে এই লোকটাকে ধরো দেখিঃ

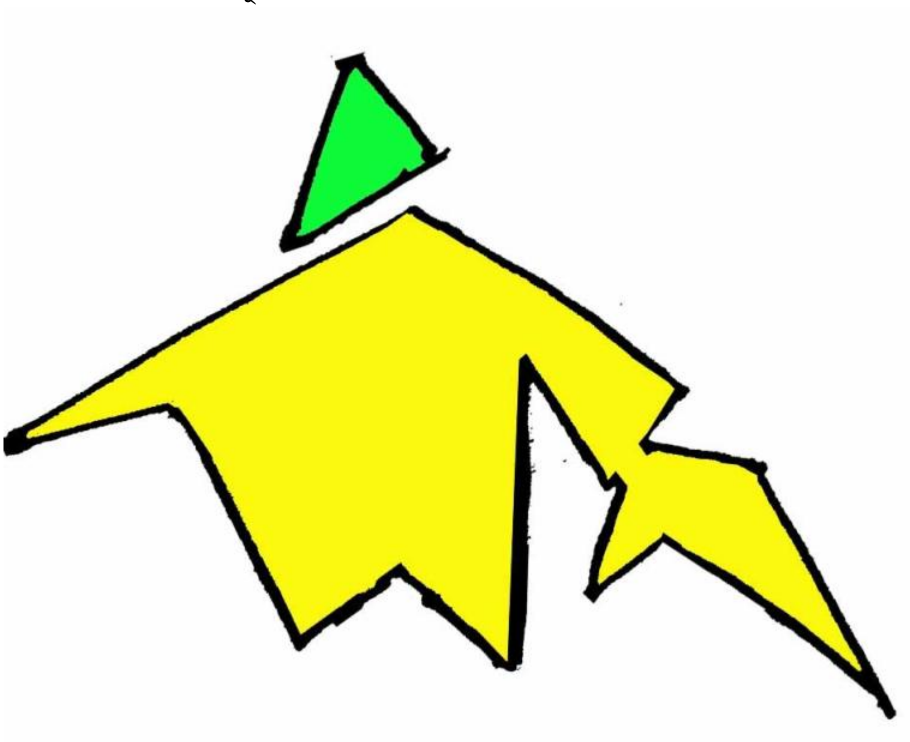

গত সংখ্যর উত্তরঃ

প্রথম ধাঁধা: কখনই ডেক অবধি জল আসবে না কারণ জল যত উঁচুই হোক, জাহাজ তার ওপরেই ভেসে থাকবে।

দ্বিতীয় ধাঁধা: দুটো খেলনা একসঙ্গে দম দিয়ে চালিয়ে দাও। দু মিনিটের খেলনাটার দম যেই ফুরোবে ওমনি ডিম গরম জলে ফেলে দেবে। এবারে বড় খেলনার দম যেই ফুরোবে ওমনি ডিম তুলে নিলেই হবে

তৃতীয় ধাঁধা: 1+2+3+4+5+6+7+(8x9)=100

কুইজের উত্তরঃ ১। চার মিনার। ২। এ আর রহমান। ৩। পোশাক ডিজাইনে। ৪। মহিলা ৫। নেপাল ৬। কু ঈ কর্ণ ও মেঘনাদের। ৭। আলো। ৮। লাম ক্রিয়োং। ৯। বিনায়ক দামোদর সাভারকার। ১০। অ্যাটলি

হযবরল-র উত্তরঃ

শিবসমুদ্রম ,পাগলাঝোড়া ফলস, উশ্রী যোগ কেমপটি, নায়গারা ফলস।

গোল দেয়া ঘরের অক্ষরগুলো একত্র করলে ধাঁধার উত্তর দাঁড়াবে-- শিব যোগ রাগ গায়।

মজার খেলার উত্তরঃ

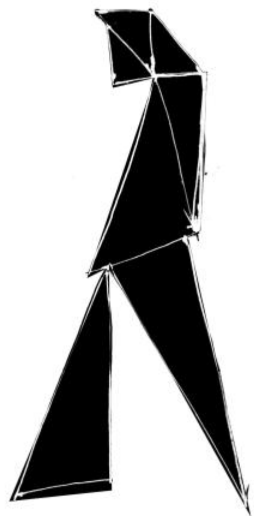

শব্দছকের উত্তরঃ

পাশাপাশি: ১। কাবেরি ৩। তাপ ৪। বাকল ৫। পবন ৭। গরান ৮। রবাব ১১। গফুর ১৩। সকাল ১৫। লংকা ১৭। সুরেলা ১৮। তরল ১৯। শাবল ২১। গরু ২২। শকল

ওপর-নীচ: ১। কাক ২। বেল ৩। তান ৪। বাজার ৫। পরাগ ৬। বন ৯। বাস ১০। বকাসুর ১২। রং ১৪। লরেল ১৬ কাজল ১৮। তরু ১৯ শাক ২০। বল

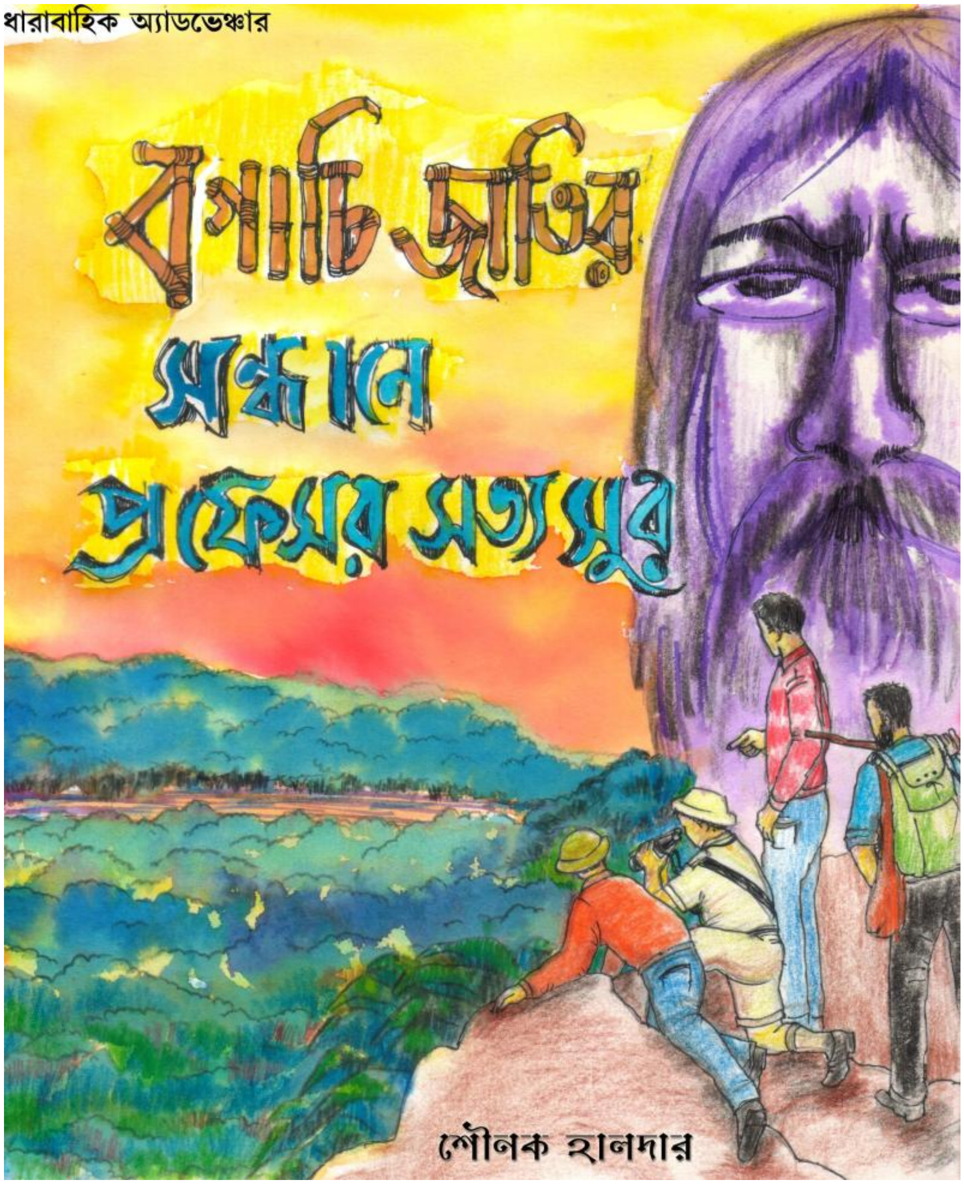

বর্মামুলুকের পাহাড়ে ইহুদিদের হারিয়ে যাওয়া শাখার খোঁজে বেরিয়ে অভিযাত্রী ক্লাবের সদস্যরা এসে পৌঁছোল আইজল শহরে। সেখানে শহর ঘুরতে বেরিয়ে খোঁজ মিলল ইহুদি দোকানদার সাইমন-এর। সে বললো আইজলে এখনও কয়েকঘর ইহুদি আছে। আইজলের রোজিকা সাহেবের কাছে শোনা গেল, মৃত্যুর পরে আত্মারা একটা হ্রদের দিকে চলে যায়। পরে, চামপাই যাবার পথে ড্রাইভার জিমি জানালো, সে হ্রদ ছাড়িয়ে স্বর্গভূমি 'পিয়াল'। যে আত্মারা সে অবধি যেতে পারেনা তাদের ঠিকানা হয় হ্রদের পারের মৃত আত্মাদের বসতিতে। মৃতের হ্রদের খোঁজে অভিযাত্রীরা এই বার চলেছেন চামপাইয়ের দিকে। তারপর---

২০শে অক্টোবর

চামপাইতে একদিন থাকা হল। সরকারি কাজকর্ম, রসদ জোগাড় এসব হল। গাইড এল। আপাত-গম্ভীর মানুষটা, দৃষ্টিটাও কঠিন। পরিচয় দিল রোসিংথাঙ্গা, আমাদের বলল ওকে থাঙ্গা বলে ডাকতে।

. বাতে যখন থাঙ্গাকে আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য আর কোথায় কোথায় যেতে হবে, এইসব বোঝানো হচ্ছে, হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দুহাত ছড়িয়ে গমগমে গলায় গান গেয়ে উঠলো------

কা রন ফাং লে (হ) মানা কান তুয়ানা ত্লাং

মানে বুঝলাম না, তবে গানটির সুর সবাইকে ছুঁয়ে দিল।

তারপরই সে তড়াক করে লাফিয়ে সত্যদার সামনে এসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, ''অবিশ্বাসী, নিষিদ্ধ দেশে যেতে চাও কেন? জানো ও সব জায়গা হল রি আর এর বাসভূমি, যার ডিম ছুঁলেই পাথর হয়ে যায় সবাই?''

সত্যদা অবিচলিত গলায় বলল,''কেন যাচ্ছি, সে তো এতক্ষণ ধরে তোমাকে বোঝালাম। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো থাঙ্গা? নাকি যেতে চাও না?''

''যাবো যাবো স্যার, আমি ছাড়া কেউ আপনাদের ওসব জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না----'' দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সে বাইরে সিগারেট খেতে চলে গেল। জিমি মুচকি হেসে বললো,''চিন্তা করবেন না স্যার, থাঙ্গা একটু নাটুকে হলেও এসব এলাকা ওর নখদর্পনে।ওর মত ভাল গাইড আর হয় না। রাস্তায় বেরোলেই বুঝতে পারবেন---''

পরদিন আমরা ফারকন যাবো- সেটা নাকি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর কিংবদন্তীর জায়গা। উপত্যকা ছেড়ে পাহাড়ে উঠতে হবে।

২২শে অক্টোবর

নীল সবুজ পাহাড় চারদিকে। মাঝেমাঝে কুয়াশা বা মেঘ। এ এক অপূর্ব জায়গায় আমরা এগিয়ে চলেছি। ঘন বনানীর মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে সতেজ হাওয়া, যেন সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এই পবিত্রভূমিতে। উচ্চতা কত হবে? এই সোয়া দুহাজার মিটারের কম। স্থানীয় সমস্ত মানুষ এই পাহাড় শীর্ষকে জানে দেবতাদের বাসভূমি ফঙপুই বা নীলপর্বত নামে। চারদিকে ঘন অরণ্যভূমি। বাঁশ, অর্কিড,ফার্ণ,রডোড্রেনডন আর অজানা গাছগাছালিতে ঠাসাঠাসি বন। বিশাল সব চিরসবুজ বনস্পতির সারি। ভিজে আবহাওয়া। কত না জানি পাখি, পতঙ্গ, উদ্ভিদ আর জানোয়ারদের বাসভূমি।

প্রথমে ঠিক হল সরাসরি নীলপর্বতের দিকে যাওয়া হবে। ফাদার ইগনেশিও ফিনিকোর চিঠি অনুসারে জায়গাটা পাহাড়-ই-পাহাড় আর জঙ্গলে ঠাসাঠাসি।থাঙ্গা জানালো যে আরো পূবে এগোলে দু চারটি আদিবাসী গ্রাম পড়বে। আচুই আর পুশাউ হ্রদের ব্যাপারটা তাদের সাথে মিলিয়ে দেখা যাবে।

কিন্তু দলনেতা সত্যদা গোঁ ধরলেন আগে সেই কিংবদন্তীর হ্রদ দেখতে যাবেন। তার আশপাশটা মিলিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে। বাপী তালুকদারের বয়ান অনুসারে আর কিউরোর মিশনের সূত্র ধরলে নাকি হ্রদটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সত্যদার ধারনা ওখানেই হারানো মানবের খোঁজ পাওয়া যাবে।

অতএব রুয়ানথ্লাং এর দিকে গাড়ি ঘুরল। কেইফং এ প্রথম থামা হল। ''রুল চম পুক দেখে যাবেন না?'' থাঙ্গার প্রশ্ন ''সে আবার কী?''

''একটা বিশাল গুহা। আমাদের গল্পে আছে, এখানে থাকত এক অতিকায় সাপ, তার নাম ছিল রুলপুই। মানুষখেকো ভয়ংকর সাপ---''

যদিও বগাচি ও পুশাউ হ্রদের সঙ্গে মানুষখেকো সাপের কিংবদন্তীর কোনো যোগাযোগ নেই। তবুও নামলাম। বিশাল গুহা, ভেতরটা ভিজে-ভিজে, তাই ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। এই গুহা দেখে আমার পাচমাঢ়ি-র জটাশংকর-এর কথা মনে পড়ে গেল।

কিংবদন্তীর হ্রদ আপাতত বর্মাদেশে, তাতে যেতে বিশেষ পারমিশান লাগে। তিয়াও নদী পার হয়ে চেকপোষ্ট হয়ে আলাদা জিপে করে পাহাড়ের ওপরে চড়লাম। পাহাড়ের ওপর অতীতের ঘন জঙ্গলের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মনে হচ্ছিল যেন ঘন জঙ্গলে ভরা কোথায় অভিযানে যাচ্ছি না, যেন কোনো পিকনিক স্পটে বেড়াতে যাচ্ছি। পাহাড়ের ওপর থেকেই সেই মায়াবি হ্রদ দেখা দিল। নীল

আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার জলে,স্বচ্ছ টলটলে জল। পাশে ঘাসজমি। কি অপূর্ব সে হ্রদ। নির্জনে নিভৃতে যেন এক টুকরো স্বর্গ রচনা করে রেখেছে।

কি অপূর্ব সেই হ্রদ! নির্জন নিভৃতে যেন একটুকরো স্বর্গ রচনা করে রেখেছে।

কিন্তু সবার মুখে শোনা ও বইয়ে পড়া ঘন অসূর্য্যমপশ্যা বনানী আর জন্তুজানোয়ারে ভরা রহস্যময় সেই হ্রদ কি এই? বিশ্বাস হচ্ছিল না। একে নিয়ে এত রহস্য,মিথ আর গল্পগাথা? মানুষ নাকি ভয়ে এই এলাকার ধারে কাছে আসত না। ভূতপ্রেত থেকে নিজেদের আর ছেলেপিলেদের রক্ষা করতে কত রকমের তুকতাক করত, বিশ্বাস করত যে ঐ জল ছুঁলেই মৃত্যু। এসব অতীত দিনের রোমান্স ও রহস্য কাহিনী এই ছিমছাম বনবীথি ঘেরা টলটলে হ্রদটি দেখে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।

''এই নাকি তোমাদের মৃতদের দেশ?'' সত্যদা ক্যাটক্যাট করে বলে উঠল।থাঙ্গা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল।সত্যদার প্রশ্ন শুনে, চোখে যেন তার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে করুণ গলায় সে গেয়ে উঠল কা রন ফাং লে (হ) মানা কান তুয়ানা ত্লাং--

''এর মানে কি থাঙ্গা?'' চঞ্চলদা পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করছিল। এবারে জিমি মুখ খুলল। বলল,'' এটা একটা প্রচলিত গান।এর মানে পুরানো দিনের সুন্দর স্মৃতিরা চলে গেছে একেএকে। উন্মুক্ত নীল আকাশ, চিরহরিৎ বনভূমি, উচ্ছল ঝর্ণা আর জ্যোৎস্নাভরা রাত,একত্রে কাটানোর সেসব দিন আজও মনে করি।''

কথাগুলো আমাদের মনে দাগ কেটে গেল।

সূর্যাস্ত অবধি সত্যদা পুরো এলাকাটা চষে ফেলল। দানিকেন, চঞ্চলদা ও অতনুও সঙ্গে ছিল। তবে সব কিছুই একটু সতর্ক ভাবে করতে হচ্ছিল। বর্মাদেশে এখন মিলিটারি শাসন, একটু সন্দেহ হলেই সমস্যায় ফেলে দেবে। আমি ওপরেই থেকে গেছিলাম শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে। জিমি গাছের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল। ওপর থেকে হ্রদের দিকে চেয়ে থেকে থেকে মনটা কি যেন একটা আবেশে ভরে যাচ্ছিল।

বুনজুম ফিরে গেলাম রাতে। সবারই মুখ গম্ভীর। সত্যদা হাত পা ছুঁড়ে পায়চারি করে চলেছে তো চলেছেই। আর অর্নগল কথা বলে যাচ্ছে।

'' এরা তো বগাচিদের নামই শোনেনি। আর হ্রদটা দেখেছিস, আশেপাশে সেরকম উচুঁ পাহাড় তো নেই-ই। তা ছাড়া ভূতের ভয়ে আশেপাশের এলাকায় কোনোদিনই নাকি বসতি করেনি। অথচ ফাদার ইগনেশিও ফিনিকোর চিঠি অনুসারে সেখানে উচুঁ পাহাড়,গভীর জঙ্গল আর মানুষের বাস। অথচ যদি হ্রদের গল্পটার সঙ্গে কো- রিলেট করিস, তবে বুঝতে পারবি পুশাউ হ্রদের রহস্যের সঙ্গে এই হ্রদটার অনেক মিল আছে। আবার বর্ণনা অনুসারে জায়গাটার সঙ্গে কোনো বাস্তবের মিল নেই। না না----এ হয় না----'' সত্যদা অদৃশ্য ঘুঁষি ছুঁড়তে থাকলেন।

'' আমরা তো সব জায়গায় যাইনি এখনো সত্যদা'' চঞ্চলদা বলল।

'' যদি বার্মাতে হয়?'' দানিকেন ফস্ করে বলে বসলো,'' বর্মা তো নিষিদ্ধ দেশ,ওখানে কি করে যাবো?''

'' আরে বাবা, বর্মার কথা পরে ভাবা যাবে। আগে তো দেখে নি আশপাশটা, তারপর না হয় সেকথা চিন্তা করা যাবে।''

২৫শে অক্টোবর

থাঙ্গার সঙ্গে একটা বিশেষ কারণে আমার একটু ভাবসাব হয়ে গেছিল। থাঙ্গা হচ্ছে গল্পের রাজা। এইসব এলাকায় পাহাড়, বন, জন্তু,সরীসৃপ আর পাখিদের নিয়ে কত যে লোককথা রয়েছে। থাঙ্গার সব গল্প জানা। যখন সে গল্পগুলো শোনায়, তার সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে, গলা উচুঁনীচু করে বেশ নাটকীয়তা জুড়ে দেয়। কিংবদন্তীর হ্রদ আমাদের নিরাশ করেছিল। নতুন আশা নিয়ে পরদিন আমরা নীলপর্বতের দিকে রওনা হলাম। যেতে যেতে থাঙ্গা তার গল্পের ঝাঁপি খুলে বসল।

'' থাসিয়ামার সঙ্গে অপরূপ সুন্দরী পরী ছংতিংলেরির ভালোবাসা হয়েছিল। পরী তাকে বর দিয়েছিল যে তার একদিন শয়েশয়ে মিথুন (স্হানীয় গরু) হবে। থাসিয়ামার মিথুনদের পরী নিয়ে তুলেছিল এক পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ের সেই নিরাপদ আশ্রয়ে মিথুনদের শয়েশয়ে বাছুর জন্মেছিল। ঐ দেখুন সেই পাহাড়---থাসিয়ামা সেনো নেহ্হনা----'' থাঙ্গা দূরে হাত দেখালো। ভাপাই গ্রামে আমরা দুপুরের খাবারের জন্য নেমেছিলাম। তখনই থাঙ্গার গল্পটা শুনলাম।

থাঙ্গার হাত অনুসরণ করে যে পাহাড়টা দেখলাম ,সেখানে গরু বাছুর কেন, মানুষের ওঠাও অসাধ্য মনে হল। কর্কশ উপত্যকার মধ্যে হঠাৎ করে জেগে ওঠা একটা খাড়াই পাহাড়-গায়ে কোনো খাঁজ নেই।

''কি করে যে মিথুনরা ওখানে উঠত, কে জানে'' কথাটা বলেই ফেলল অতনু। সে আবার শিক্ষিত পর্বতারোহী বলে, ''সত্যদা, এটা বগাচিদের পাহাড় হবে না, আশপাশে আর কিচ্ছু নেই, হ্রদ তো নেই-ই। কি বলো?''

''ঠিক বলেছিস। আরো এগোনো যাক।''

যাবার পথে তান-এর পূবদিকের ঢালে চোখে পড়ল ফিয়ারা তুই। এর জল স্বচ্ছ ও পবিত্র। গল্পে আছে গরীব বিধবার একমাত্র ছেলে ফিয়ারা হঠাৎ করে পাহাড়ি ঢালের পাথর সরাতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছিল এক স্বচ্ছতোয়া জলস্রোতকে। তারা মা-ছেলে মিলে অনেকদিন এই সুস্বাদু জলের কথা লুকিয়ে রেখেছিল নিজেদের মধ্যে। পরে আস্তে-আস্তে সবাই জেনে যায়। সেই সঙ্গে ফিয়ারার সুমিষ্ট পবিত্র জলের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ঐ দেখুন সেই পাহাড়—খাসিয়ামা সেনো নেহ্হনা—" থাঙ্গা দূরে হাত দেখালো।

আমরা নেমে জল স্পর্শ করলাম, হাতে মুখে দিলাম। বেশ ঠান্ডা জল। তবে জল খেতে সাহস করলাম না, কেননা, থাঙ্গা বলছিল যে এখন জলের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেছে।

'' পাপ, স্যার, পাপ, মানুষের পাপের কি শেষ আছে,'' বিড়বিড় করে চলল থাঙ্গা, ''এইসব জায়গায় ছিল ঘন গাছপালা, পাখপাখালির ভিড়। আর ফিয়ারার জল, লোকে কলসি কলসি ভরে নিয়ে যেত, একবার খেলে আর ভুলতো না। প্রাণ জুড়িয়ে যেত--- আহা ! এখন সেই গাছপালা কই?--- লোকজনকে না জানিয়ে ভালোই করেছিল ফিয়ারার মা।--- সব ভালোভালো জিনিস যতই বাইরের লোকে জেনে যাবে, ততই তার লোকসান। এই যে আপনারা স্যর, সেই কোন মুলুক থেকে এসেছেন--''

''তোমাকে তো আগেই বলেছি থাঙ্গা যে আমাদের কোনো পাপ উদ্দেশ্য নেই। আমরা কোনো গুপ্তধন খুঁজতে আসিনি। একটা অচেনা জিনিস জানতে এসেছি। যদি জানতে পারি, তবুও ফিরে যাবো। তোমাদের পবিত্রভূমির কোনো লোকসান করবো না। চঞ্চলদা বলে উঠলো। চঞ্চলদার গলায় একটা ঝাঁঝ ছিল বোধহয়- থাঙ্গা এবারে চুপ করলো।

'' লিয়াংছিয়ারি লুংলেন তলাং'' অর্থাৎ সুন্দর লিয়াংছিয়ারি যেখানে তার প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করত, সেই ঘন বন ঘেরা পর্বতভূমি দেখেও থাঙ্গা একই রকম উত্তেজিত হয়েছিল। ওর কি দোষ, আমাদেরই মন খারাপ হয়ে গেছিল জঙ্গলের অবস্থা দেখে।সব গাছপালা কেটে ফাঁকা।

২৭শে অক্টোবর

ছ'দিন হয়ে গেছে আমরা চামপাই- থেকে এপাশ ওপাশ ঘুরেই যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় সেই দেশ? রাত হলে সত্যদার পায়চারি আর বকুনি বেড়েই চলেছে, দানিকেনের প্রাণপণ তোষামোদেও সে মেজাজের পারা নামছে না। চঞ্চলদা,অতনু আর আমি জেরবার হয়ে যাচ্ছি ম্যাপ নিয়ে।

'' ওরা আমাদের উল্টোপাল্টা ঘোরাচ্ছে না তো? ওরা তো আমাদের অবিশ্বাস করে---''

'' মনে হয় না, সেরকম হলে রোজিকা সাহেব ওদেরকে আমাদের সঙ্গে দিতেন না। অত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মানুষ, এলাকায় সবাই শ্রদ্ধা করে---''

'' চলো দেখি, একবার থাঙ্গাকে জেরা করি তো।''

থাঙ্গা আগুনের সামনে বসে বিড়ি খাচ্ছিল আর গুণগুণ করে গান গাইছিল। জিমি যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছে। জিমি মানুষটা শান্ত আর পরিশ্রমী। যেমনি অক্লান্ত ড্রাইভ করে যায়, তেমনি যখনই সুযোগ পায়, ফাঁকে ঘুমিয়েও নেয়। কাজে ও বিশ্রামে কোথাও কোনো ফাঁকিবাজি নেই তার।

কাছে গিয়ে ডাকতে থাঙ্গা উঠে এল।

সত্যদা বললেন,''থাঙ্গা, তুমি বলো দেখি, আমরা কোথায় চলেছি?''

থাঙ্গা গম্ভীর মুখে বললো,'' এই জেলার সব কিছু আমি হাতের তেলোর মতন জানি। বুঝতে পারছি তোমাদের মনে সন্দেহ জাগছে---''

'' না না সেরকম কিছু ভেবো না। রোজিকাসাহেব তোমাকে দিয়েছেন।''

''পু-রোজিকা দিয়েছেন বলেই এসেছি, নইলে থোড়াই তোমাদের মতন বিদেশীকে ---'' জিভ কেটে ফেলল থাঙ্গা।

যেন শুনতেই পায়নি এরকম ভান করে চঞ্চলদা বললো, ''আমাদের রুটটা ঠিক আছে তো ? আমরা এখন নীলপর্বতের দিকে যাচ্ছি, তাই না?''

''রাস্তায় দাপুং গ্রাম পড়বে। ওখানকার গাঁওবুড়োর বয়েস নব্বই পার হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কথা বলে তবেই এগোতে হবে। পু-রোজিকা ওকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ক্রমশ

ছবি: মৌসুমী

বিধুবাবুর নেগেটিভ

যশোধরা রায়চৌধুরী

বিধুবাবু পার্ক স্ট্রিটে একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি করেন, কয়েক হাজার টাকা মাইনে, টিফিনে ঝালমুড়ি খেয়ে আর কিছুটা পায়ে হেঁটে কিছুটা বাসে চেপে পয়সা বাঁচিয়ে তাঁর দিব্যি চলে যায়। থাকেন এন্টালিতে একটা আদ্দিকালের ভাড়া বাড়িতে। সেই ফ্ল্যাটে খানদুই ঘর, একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার জমাদার আসার প্যাসেজ, আর একটা বাথরুম। কিন্তু তবু তো নিজের বাড়ি। বাড়িতে কোন ঝামেলা নেই, একা একা থাকেন। বাবা মা সবাই এককালে দেশের বাড়িতে থাকলেও এখন পরলোকগত। বিধুবাবু একবার বিয়ে করেছিলেন, ছেলেপুলে অবশ্য ছিল না। বউ বড্ড খাণ্ডারনি ছিল।কথায় কথায় বাপের বাড়ি চলে যেত। একবার বাপের বাড়ি থেকে বলে পাঠাল, আর আসবে না। বিধুবাবুও আর তাকে নিয়ে আসেননি। এখন তিনিও কারুর সাতে পাঁচে থাকেন না। তাঁকেও কেউ জ্বালাতন করেনা।

বিধুবাবু প্রতিটা দিনই রুটিনে চলে।সকালে উঠে প্রথমে একমাইল হাঁটতে যান। হেঁটে ফেরেন, মোড়ের চায়ের দোকানে এক গেলাস চা আর দুটো লেড়ো বিস্কুট খেয়ে। অল্প বাজারও করে আনেন। তারপর ভাতে ভাত চড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে বসেন নিজের এক এবং একমাত্র ইজিচেয়ারে। পার্ক স্ট্রিটের এক পুরনো আসবাবের দোকান থেকে খুব শখ করে কিনেছিলেন। ওই একটাই বলা যায় তাঁর জীবনের ভালবাসা, দুর্বলতা, যা বলো তাই। ওটাকে ছাড়া তিনি আর কিছু ভাবতে পারেন না।টিভি দেখেন না, রেডিও শোনেন না, খেলা দেখতে যান না, সিনেমা দেখতে যান না। শুধু আরামকেদারায় বসে বসে খবরের কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়েন। বিধুবাবুর ভাষায় সেটা ‘পেপার’ পড়া। খেলার খবর পড়েন,সিনেমার খবর পড়েন, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পড়েন। কেউ মরে গেছে দেখলে সেটাও খুঁটিয়ে পড়েন, তারপর ভুলে যান। কাগজ পড়া শেষ হলে সেটাকে নিপুণভাবে ভাঁজ করেন, যাতে নাকি সন্ধ্যেবেলা আবার সেটাকে একেবারে মচমচে তাজা নতুন পেপারের মত করে ভাঁজ খুলে পড়তে পারেন। রসিয়ে রসিয়ে। ভাঁজ করে, তক্তপোশের একদিকে সেটাকে রেখে, বিধুবাবু স্টোভের কাঁটা একেবারে নিচে নামিয়ে দিয়ে স্নানে যান। স্নান থেকে ফিরে ভাত খেয়ে আপিসে যান। আপিস থেকে ফিরে আবার সেই আরামকেদারা, কাগজ। তারপর দুটো রুটি আর একটু ঢেঁড়শের চচ্চরি বানিয়ে খেয়ে ঘুম।

তো এ হেন বিধুবাবুর জীবনে যে কোন অ্যাডভেঞ্চার নেই সে তো বলাই বাহুল্য। আর গল্পের বই পড়ে পড়ে এটাও তোমরা জেনে গেছ যে এইসব লোকেদের জীবনেই একদিন হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যায়। তাই এই গল্পে বিধুবাবুরও তাই হবে। হঠাৎ তিনি একটা ভয়ংকর গা ছমছমে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন। পড়তেই হবে।

তোমাদের তাই বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বোরিং লোকেরাই কেন গল্পের ক্যারেকটার হয় সেটা ভাবতে যেটুকু সময় লাগে আর কি। আমার মনে হয়, বোরিং লোকেদের

দেখার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। বোঝার ক্ষমতাও। তারা তো সারাদিন সারাদিন টো টো করে অদ্ভুত জিনিসের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় না, তাই অদ্ভুত জিনিসই এসে তাদের সামনে নিজেদের ধরা দেয়।

একদিন বিধুবাবু অফিস থেকে ফিরছেন। সদ্য অন্ধকার হয়ে গেছে, অক্টোবর-নভেম্বর-এর বিকেল বেলা। এই সময়টা আকাশে বড্ড ঝুলকালি ঝোলে। কলকাতা শহরের রাস্তায় বায়ুদূষণের মাত্রা খুব বেড়ে যায়। তাই আরো কালো কুচকুচে ঝুপসি হয়ে যায় সবদিক। এমন একটা মন খারাপ করা বিকেলেও বিধুবাবুর আলাদা করে কোন মন টন খারাপ হয়নি। তবে পাড়ার কাছেই একটা ফাস্ট ফুড কাউন্টার থেকে মটন চপের গন্ধ আসছিল, তাতে তিনি একটু উদাস হয়ে পড়েছিলেন। পকেট হাতড়ে দেখলেন, কালকের বাসভাড়া ছাড়াও আরো গোটাদুই দশ টাকার নোট আছে। হিসেব করে দেখলেন, পরশু মাইনে পাবেন।

কাজেই আজ একটু বাড়াবাড়ি করা যায়। দুটো মটন চপ কিনে খেলেন, তেলতেলে প্যাকেটে হাত মুছে সেটা ফেলে দিলেন। তারপর বাড়ি ফিরলেন।

আজ বিধুবাবু যে একটু রুটিনের বাইরে বেরোলেন, এর থেকেই তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল আজ দিনটা অন্যরকম কাটবে। কিন্তু বিধুবাবু তো তা বোঝেননি। তিনি অভ্যাসমত চাবি খুলে ঢুকলেন নিজের দু কামরার ফ্ল্যাটে। ঢুকেই, চমকে উঠলেন তিনি। তখনো ঘরের আলোটা জ্বালাননি । আধো অন্ধকারের ভেতরেই দেখলেন, সামনে ছায়ামূর্তির মত একটা লোক বসে আছে না? মনে হচ্ছে লোকটা সাদা পাঞ্জাবী পরা, হাতে একটা সাদা মতন কী যেন! তিনি স্বাভাবিকভাবেই আঁতকে উঠলেন। চোখ কচলে দেখলেন। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে হেই--- এই এই এমন একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। কিন্তু লোকটার তাতে কোন ভাবান্তর হল না।

এবার বিধুবাবু থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছেন। তাঁর এই ছোট ফ্ল্যাটে কিছুই নেই যা চুরি করা যায়। টাকাকড়ি, দেওয়াল ঘড়ি, টিভি, রেডিও, এমনকি দেওয়ালে ঝোলানো মা কালির ছবিটি পর্য্যন্ত নেই।আর চোরই যদি হবে, তাহলে অমন আরাম করে বসে থাকবে কেন? বিধুবাবু আলোর সুইচের দিকে হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে, কাঁপা কাঁপা হাতে সুইচটা অন করলেন। অন্যদিন এই কাজটা করতে তাঁর দু সেকেন্ড লাগে না। আজ লাগল পাকা চল্লিশ সেকেন্ড। কিন্তু সুইচ টিপতেই বুঝতে পারলেন, আজ আর আলো জ্বলবে না। মনে ছিল না। সকালেই দেখেছিলেন, কাছাকাছি একটা ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে। কেবল্ ফল্ট।

ভয়ে ভয়ে নিজের রান্নাঘরের দিকে গেলেন অন্ধকারের মধ্যেই। দেশলাইয়ের কৌটো আর মোম বাতিটা বের করলেন। আলো জ্বেলে ফিরে এলেন, ভাবলেন, সবই বোধ হয় তাঁর চোখের ভুল। অন্ধকারে সাদা কাপড়টাপড় পড়ে থাকলেও, একটা লোক বসে আছে, এমন মনে হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু না। ফিরে এসে মোমবাতির আলোতেই বিধুবাবু দেখলেন, সাদা পাঞ্জাবি, সাদা চুল। আর হাতে সাদা খবরের কাগজ। এই সবের পেছনে লোকটির মুখ ঢাকা। তাই বেশিরভাগ অংশটাই সাদা। এ ছাড়া বিশেষ কিছু একটা চোখে পড়ছে না। বিধুবাবুর কপালে জমে ওঠা ঘামের ফোঁটাগুলো টপ টপ করে পড়তে শুরু করেছে।

বিধুবাবু বুঝতে পারলেন, লোকটি যে তালা দেওয়া বাড়ির ভেতরে ঢুকে বসে আছে, শুধু তাইই নয়, বসে আছে একেবারে তাঁরই আরামকেদারায়, তাঁরই খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে। এবার শুধু ভয়ই পেলেন না বিধুবাবু, বেশ রেগেও গেলেন। তাঁর, যাকে বলে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। তিনি তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে বললেন, ''আরে আরে, ব্যাপারটা কী মশাই? আপনি কে? আর লোডশেডিং-এ বসে বসে কাগজ পড়ার ভাণ করছেন কী আক্কেলে?''

বেশ চেঁচিয়েই বললেন নিশ্চয়, কারণ এতক্ষণে তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে লোকটি মুখ তুলে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ভিরমি খেলেন আমাদের বিধুবাবু।

আর খাবেন না-ই বা কেন? লোকটার মাথার ভেতরে লাল লাল ভাঁটার মত দুটো চোখ। জ্বলছে, যেন আগুনের গোলা। চুলগুলো ধবধবে সাদা, দাড়ি ধবধবে সাদা, গায়ের রঙ কুচকুচে কালো।

ভীষণ চেনা চেনা লাগল মূর্তিটা। যেন কেউ একটা স্বাভাবিক মানুষকে উলটে দিয়েছে। সাদার জায়গায় কালো। কালোর জায়গায় সাদা করে দিয়েছে। অবিকল একটা ফোটোর নেগেটিভের মত।

বিধুবাবু অজ্ঞান হয়ে যেতে লোকটার কাজ বেড়ে গেল। নেগেটিভের মত লোকটা কাগজ রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আগে বিধুবাবুকে মেঝে থেকে টেনে তুলল। তাঁকে তাঁর তক্তপোশে শুইয়ে দিল সযত্নে।

তারপর তাঁর চোখে জলের ছিটে দিল।কানের পাশে সুড়সুড়ি দিল। কোমরে কাতুকুতু দিল। একটু পরে বিধুবাবুর জ্ঞান ফিরে এল।

চোখ খুলে দেখলেন, তাঁর উপর ঝুঁকে পড়েছে নেগেটিভের মত দেখতে লোকটা। সেই দুটো ভাঁটাচোখ নিয়ে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে। সেটা দেখে আবার ভিরমি খেতে যাবেন, এমন সময় লোকটা কথা বলে উঠল, ''কি, কেমন আছেন? আমাকে দেখে আপনিও ভিরমি খেলেন তাহলে। এই নিয়ে চুয়ান্নজন হল।''

শুনেই আবার ভিরমি খেলেন বিধুবাবু।

আর খাবেননা-ই বা কেন? লোকটার চোখদুটো আর মুখখানার মতই, গলাটাও বেজায় পিকিউলিয়ার। দুটো এবড়ো খেবড়ো পাথর একটা আর একটার সঙ্গে ঘষলে যেমন একটা ঘ্যাঁশ-ঘ্যাঁশ আওয়াজ হয়, তারসঙ্গে একটু ক্যাঁচক্যাঁচ মেশানো, তেমনি একটা আওয়াজ। যে কোন লোকেরাই ওই গলা শুনলে পিত্তি চটকে যায়, কান চুলকোতে থাকে, মাথা ভোঁ ভোঁ করে।

সুতরাং বিধুবাবু অজ্ঞান হলেন। মুচ্ছো যাবার মুহূর্তে শুনলেন, ঘ্যাসঘ্যাসে গলাটা বলছে, ''আরে কি মুশকিল, আবার সেই তিপান্নজনের মত একেও কাতুকুতু দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে নাকি? আমার যে আবার আঙুল নেই!''

তবুও কাতুকুতু দিলেন উনি। কীভাবে ম্যানেজ করলেন কে জানে। তবে এবার জ্ঞান ফেরার পর বিধুবাবু আর অজ্ঞান হননি। অসম্ভব মনের জোর ওনার। বোরিং লোকেদের এমন হয়। এরপর ওনার সাথে কিছু কথাবার্তা হয় ওই নেগেটিভের মত লোকটির।

''আ- আপনি কে বলুন তো?'' ঘড়-ঘড় করে বললেন বিধুবাবু।

''আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি এই অঞ্চলেরই মানুষ। আমার নাম মুদাব্বির হুসেন। এন্টালিতেই আমার বাড়ি ছিল। মারা যাই উনিশ শো ষাট সালে।''

''আ-আ-আপনি ভূত!'' বিধুবাবু আবার অজ্ঞান হতে গেলেন, কিন্তু কাতুকুতু লাগার ভয়ে আবার জেগে উঠলেন, ''ও বুঝেছি, ওইজন্যই আপনার এই ঘরে ঢুকতে তালাচাবি লাগেনি। আমি ভেবেছি প্যাসেজের দরজাটা দিয়ে জমাদার আসার দরজাটা বুঝি ভুল করে খুলে রেখেছিলাম।''

''শুনে খুশি হবেন, আমার কোন দরজা লাগে না। আমি সূক্ষ্ম শরীরে চলাফেরা করি।''

''অ, সূক্ষ্মশরীর। তাই বুঝি বললেন, আপনার আঙুল নেই। আপনার আঙুল নেই, তো কাতুকুতু দিলেন কীভাবে স্যার?''

''মনের জোর লাগে। মনের জোরেই তো এই ছায়ামূর্তি ধারণ করেছি। মনের জোরেই আপনাকে মেঝে থেকে তুললাম, আবার কাতুকুতুও দিলাম। এর আগে আরো বেশ কয়েকজনকে তুলেছি। গুনে গুনে তিপান্নজন। কয়েকজন আবার পটল তুলেছে। ভূত দেখার অভ্যাস তো থাকে না সবার, দোষ দেওয়া যায় না।''

''মরেই গেছে? সে কী? তাহলে তো চিন্তার কথা!''

'না, চিন্তা আর কিসের, মরে গেলে তো আমার ভালোই। বন্ধু জুটে যায়। সুখ দু:খের কথা হয়। শিখিয়ে পড়িয়ে দিই। তারাও আমার মত সূক্ষশরীরে ঘোরে ফেরে।''

''তো আপনার খাওয়া-পরা চলে কীভাবে, জামাকাপড়ই বা পান কোথায়? চুরি করেন নাকি?''

''হা: হা:, না মশাই, ভূত হবার পর থেকে আর সব বিষয়ে আমার বেশ সুবিধে হয়ে গেছে। খাবার খেতে চাল,ডাল,তেল,নুন কিছুই লাগে না। একটুখানি খাবারের কথা বললেই পেট ভরে যায়। জামাকাপড় পরতেও কাপড়চোপড় লাগে না। অন্যদের জামাকাপড় থেকে মনের মধ্যে একটা ছবি তুলে

নিলেই হল। যেমন এই ঘরে ঢুকে আপনার আলনায় রাখা পাঞ্জাবি-পায়জামা থেকে একটা ছাপ তুলে নিয়েছি মনের মধ্যে। আপাতত আমার কাজ হয়ে গেল।''

''কাজ! কী কাজ?''

''আরে সেটাই তো কথা । কেন এলাম আপনার ঘরে? এত রিস্ক নিয়ে। শুধুশুধু জামাকাপড়ের ছবি তুলে মানুষ সেজে বসলামই বা কেন? এই করে করে তো কম খারাপ অভিজ্ঞতা হল না! ঘরের ম ধ্যে একটা উটকো মানুষ ঢুকে বসে আছে দেখে কতগুলো লোক বেঘোরে প্রাণ দিল, কতগুলো ভিরমি খেল। তার উপর আমার মুখ হাত পা-টা তো আবার বিশেষ চুনকাম করে উঠতে পারিনা। কালো কুচকুচে রয়েই গেল। ঈশ্বরের মার। ভূতেরা কোনদিনই ফর্সা হবে না। এতগুলো ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা তবু পারিনা জানেন। এমন নেশা। এটা ছাড়া পারি না। আমাকে এটা করতেই হবে।''

''কী করতে হবে মশাই? কীসের নেশা? ব্যাপারটা কিছুই বুঝছি না।''

''খবরের কাগজ মশাই, খবরের কাগজ। বহুদিনের নেশা তো কাগজ পড়ার! রোজ তিনটে কাগজ পড়তাম। একটা বাংলা, একটা ইংরিজি, একটা হিন্দি। এককালে আমি রইস লোক ছিলাম। নিজের ভাল ব্যবসা ছিল। বড় দোতলা বাড়ি। সব গেছে। আমার বাড়িও আর নেই, ওখানে ম াল্টিস্টোরিড হয়ে গেছে। ষাট সালে মরার পর থেকে আপনাকে তো বললাম, খাওয়া-পরার কষ্ট নেই, গাড়ু-গামছা লাগে না, শোয়া বসা সমান, শুতে খাট লাগে না, বাতাসে মিলিয়ে থাকি, বেশ থাকি। কিন্তু মশাই, ওই একটা কষ্ট। খবরের কাগজ পড়াটা যে বহুদিনের অভ্যাস, সেইটি করব কী করে বলুন দেখি। সব পাই, কাগজ পড়তে পাই না।''

''সেইতো, এটা তো কখনো ভেবে দেখিনি! ভূতেরা কাগজ পড়ে কী করে।''

''হ্যাঁ, মনের ছবি তুলে জামাকাপড় বানানো যায়, খবরের কাগজ তো বানানো যায় না। মানে একদিনের কাগজ থেকে আর একদিনের কাগজটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে না? প্রত্যেকদিন নতুন নতুন খবর পড়তে হবে তো। বাসি খবর পড়ব নাকি। ডুপ্লিকেট করলে চলবে কী করে?''

''হ্যাঁ আজ্ঞে, ঠিকই তো। তাহলে উপায়?''

''প্রথমে শুরু করলাম নিউজপেপার স্ট্যান্ড থেকে কাগজ পড়া। ওই যে আড়াআড়ি ভাবে ঝোলানো সারবাঁধা কাগজ থাকে না! রোজ পাল্টে যায়।''

''পেপার স্ট্যান্ড? বুঝেছি। উরিব্বাস, কী করে পড়তেন?''

''প্রথম নব্বুই ডিগ্রি বেঁকে বাতাসে ভাসতে ভাসতে ঝোলানো কাগজের হেডলাইনটা পড়তাম। তারপর দেখলাম, ঘাড় ব্যথা করে।''

''ঘাড় ব্যথা করে? সেকি, আপনার তো ঘাড়ই নেই।''

''মানে মন-এর ঘাড়ে ব্যথা করে, অনেকদিনের অভ্যাস তো মনের, আরামকেদারায় বসে সোজা হয়ে কাগজ পড়ার!সেই আরামটা না পেলে কি আর কাগজ পড়ে সুখ আছে, বলুন?''

''না, তা নেই। তখন কী করলেন?''

''তখন বাস স্ট্যান্ডে টিনের পাতে সাঁটানো কাগজ পড়তে শুরু করি। সেটাতেও আরাম নেই। পা ব্যথা হয়ে যায়, থুড়ি, মনের পা ব্যথা হয়ে যায়।''

''তখন কী করলেন?''

''এই করে করে তো বেশ কিছুদিন কাটল। শেয়ালদা স্টেশনের হুইলারের থেকে কাগজ চুরি করে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে পড়েছি, লোকের ফেলে দেওয়া কাগজের ঠোঙা খুলে খুলে নর্দমায় বসে পড়েছি, কোনটাই রেসপেক্টেবল নয়। এখন তো আবার কাগজের ঠোঙা আর কেউ ব্যবহারই করে না,

সব প্ল্যাস্টিক। কী আর করি। ঠিক করলাম একটা হেস্তনেস্ত করব। একদিন একটা ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।''

''আমার বাড়িতে যেমন ঢুকেছেন?''

''হ্যাঁ, রোজই চেষ্টা করি একটা ফাঁকা বাড়িতে ঢুকতে। আপনার বাড়িতে যেমন দেখলাম কেউ নেই,খাটের উপর কাগজটি ভাঁজ করে রাখা। একেবারে আদর্শ অবস্থা। আপনি যে এসে যাবেন হট করে, সেটা ভাবিনি। রোজই তো নানান বাড়িতে ঢুকে পড়ি, বেশির ভাগ দিনই, জানালার পাশের চেয়ারে বসে কাগজ পড়ে ঠিক বেরিয়েও যাই, এক এক দিনই ঘটে যায় আজকের মত অঘটন। এটা আমার একটা রিস্ক। নিতেই হয়। তিপান্নবার হল এই নিয়ে। আপনার মত ভিরমি খেয়েছে লোকগুলো।''

''মরেও গেছে বলছেন কতজন।''

''হ্যাঁ, তাও বেশ কিছু, গোটা আঠারো। হার্ট উইক মশাই, আর কিছু না। তবে এটাও বলতে পারেন আমি একটা সার্ভিস দিয়েছি সোসাইটিকে।''

''অ্যাঁ ?''

''না, মানে কাগজে যে খবরগুলো পড়ি, সেগুলো তৈরি করাটাও তো একটা কাজ, নাকি? তো, হিসেব করে দেখুন, যে আঠারো জন মারা গেছে, সেই আঠারদিনের পরের দিন সকালে কাগজে একটা করে নিউজ তো হয়েছে। 'অজ্ঞাত কারণে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু।' চোখ কপালে উঠিয়া হার্ট ফেল করিয়া গত রাতে অমুক স্ট্রিটের তমুক বাড়ির বাসিন্দা সেমুক চন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। কে বা কারা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিল, নতুবা শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই।''

''আপনি তার মানে খবর সাপ্লাইও করেন।''

''এঁজ্ঞে, ওই আর কি ঘটনাচক্রে। তবে আমার নিজেরই পরের দিন আবার এই ব্যাপারটা খবর হিসেবে পড়তে বেশ আনন্দ হয়, বলতে কি একটু লজজা লজজাও করে বৈকি।এসব ঘটনা-টটনা না ঘটলে কাগজগুলোই বা চলে কী করে বলুন।

''সবই বুঝলাম, শুধু একটা কথা। অন্ধকার ঘরে বসে কাগজ পড়া তো চাট্টিখানি কথা না। আপনার চোখ, মানে মনের চোখ, এত পাওয়ারফুল ?''

''না, অসুবিধে তো হয়ই। তবে কিনা আমার চোখের ভেতরে কিছুটা সৌরশক্তি দিনের বেলা জমিয়ে নিয়েছিলাম। আপনাদের বাড়ির ছাতে পাটপাট হয়ে শুয়ে ছিলাম কিনা। তখন তো জামাকাপড়ও পরিনি, মানুষ সেজে থাকার দরকারও ছিল না।''

''এতক্ষণে আপনার ভাঁটার মত চোখদুটোর রহস্য বুঝেছি। তো এবার আমার বাড়িতে আপনার যে দরকারটা ছিল, সেটা মিটেছে তো?''

''হ্যাঁ, কাগজটা আমার পড়া হয়েই গেছে ধরে নিন। আমার আর একটা আর্জি ছিল। আপনি বড় সদাশয় মানুষ, তাই সাহস করে বলছি।''

''অ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন।''

''আপনি একটা কাজ করতে পারেন? আমার হয়ে একটা কাজ?''

'' কী বলুন তো? পারলে নিশ্চয় করব।''

''ইদানিং বড্ড অসুবিধে হয় সাদা কাগজে কালো অক্ষর পড়তে। বুঝতেই পারছেন, আমার জগতটা এখন সাদাতে কালো নয়, কালোতে সাদা। তাই, কাগজটাও যদি সাদা কাগজে কালো দিয়ে না

ছেপে, কালো কাগজে সাদা দিয়ে ছাপা হত, বেশ হত। সহজে, অন্ধকার ঘরে পড়ে ফেলতাম। সৌরশক্তির আর দরকার হত না। কাগজওয়ালাদের একটু বলে দিতে পারেন?''

''মাথা চুলকিয়ে বিধুবাবু বললেন, আমার আর কত ক্ষমতা মশাই! আপনি এক কাজ করুন না। যতদূর জানি প্রেসে যখন ছাপা চলে, ছাপার আগে কাগজের একপ্রস্থ নেগেটিভ তৈরি হয়, নইলে আর ফোটো অফসেটে ছাপা বলে কেন ! কালো না হলেও, সে নেগেটিভ বাদামি বা ধূসর রঙের উপরে সাদা দিয়ে ছাপা।''

''বা:, গ্রেট! অনেক জ্ঞান আপনার।''

''না না, তেমন আর কি। আরে আমি মশাই পুরনো আমলের লোক। তবে সব জানি। কমপিউটার, বায়ুদূষণ, টি টিয়েন্টি, আইপিএল, আয়লা ঝড়। খবরের কাগজ পড়ে পড়েই জেনেছি। কমপিউটার দিয়ে সব কিছু করা যায়। পজিটিভ নেগেটিভ।''

''আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলুম। আজ চলি। মাঝে মধ্যে আপনার কাছে এসে গল্প-টল্প করে যাব, বুঝলেন কিনা। ভূতের ভয়টয় পেলেন না, দিব্যি লাগল। এতটা সদাশয় মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি।''

''আমারো আপনাকে বড্ড ভালো লেগেছে যে। আরামকেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ার রোগটা তো মশাই একা আপনার নয়, আমারও ওই নেশা। তবে আজকাল বড্ড লোডশেডিং হচ্ছে কি না, সন্ধ্যেবেলা রান্না করা, কাগজ পড়া, সবেতেই অসুবিধা। এই তো, নটা বাজতে চলল। এখনো কারেন্ট এল না, আর এলেও কখন যে রাঁধব-বাড়ব, কখন যে খাব!''

''আপনি যখন আমার বন্ধু, আর আমাকে দেখেও মরে টরে যাননি, তখন একটা ছোট্ট তোফা আপনাকে আমি দিতেই পারি মশাই।''

''বলেই ভূত শ্রী মুদাব্বির হুসেন নিজের জ্বলজ্বলে চোখদুটো খুলে, বিধুবাবুর বেডসাইড টেবিলে খবরের কাগজের পাশে রেখে দিলেন। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মত, বসে বসে আলো ঠিকরোতে লাগল। এদিক ওদিক একটু একটু গড়াতেও লাগল। বিধুবাবু ভাবলেন, পড়ে না যায়।''

বিদায় জানিয়ে, মুর্দা মুদাব্বির হাপিশ হলেন। আর অমনি একটা মন কেমন করা গন্ধ পেলেন বিধুবাবু, রান্নাঘরের দিক থেকে। দৌড়ে গিয়ে দেখলেন, রান্নাঘরের উনুনের উপরে একটা ঢাকা দেওয়া বাটিতে কী যেন, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঢাকা খুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বিধুবাবু। একবাটি মোলায়েম মাটন বিরিয়ানি। গন্ধে ভুর ভুর। সারা বাড়িটা যেন সেই সুবাসে অমোদিত। আহা, খাবারের ভাবনা থেকেও এমন চমৎ কার সুবাস আসে! ভুতের খাবার-- সে তো ভাবনার খাবারই-- তবে খেয়ে পেট ভরলে হয়। মন যে ভরবে, নি:সন্দেহ হলেন বিধুবাবু।

নতুন পাওয়া বন্ধু মুদাব্বিরকে মনে মনে ধন্য বলে, বিধুবাবু মুখ হাত ধুতে গেলেন বাথরুমে। যাবার সময় ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা একটা ভাঙা টর্চ খুঁজে চোখদুটোর একটাকে তার ভেতরে গেঁথে নিলেন। ব্যাটারি বাঁচাবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। যেখান থেকে তিনি মার্বেলের মত আলোর গুলিদুটোকে তুলে নিলেন, সেখানেই একটা সাদা খাম রাখা। খামের উপরে লেখা ''দাস ফোটো স্টুডিও''। আগেও ছিল, এখনো আছে। খামটা চেনা, খামের ভেতরে কী আছে বিধুবাবু জানেন। আই কার্ড রিনিউ করাতে হবে আপিসে। তাই ছবি তুলিয়েছিলেন পাসপোর্ট সাইজের। ছবিগুলো জমা পড়ে গেছে আপিসে। এখন সেই ছবির নেগেটিভটা আছে ভেতরে।

ওটা ওনার নিজের ছবির নেগেটিভ। বুকের ধকধক আওয়াজে তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছিল। বিধুবাবু বুঝে গেছেন ওই খামটা খুললে তিনি এখন কী দেখতে পাবেন। মুদাব্বির হুসেনের ছবি।

নেগেটিভের বিধুবাবুই মুদাব্বির হুসেনকে তাঁর সূক্ষ্ম শরীর ছেড়ে মানুষের মূর্তি ধরার মডেলটা জুগিয়েছিলেন। বোধহয় সব বাড়িতে ঢুকে এত সহজে গৃহকর্তার নেগেটিভ তৈরি করে নেওয়ার ম ালমশলা পান না মুদাব্বির। তাই বাকি তিপান্ন জনের ভিরমি লেগেছে, পটলও তুলেছে কেউ কেউ। তাদের তো চেনা চেনা লাগেনি মুদাব্বিরকে। যেমনটা লেগেছিল বিধুবাবুর!

তাড়াতাড়ি আবার খামটা খুললেন বিধুবাবু। নেগেটিভটা কোথায়? এর ভেতরে তো বেশ কয়েক কপি ফোটোর প্রিন্ট। কোন মন্ত্রবলে এসে হাজির হয়েছে!!!

না:, মুদাব্বিরকে আরো আপন জন মনে হল তাঁর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারলেন, আরো প্রিন্ট করার জন্য যে টাকাটা খসত, সেটাও বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন ভুত-মশাই। না: বন্ধুত্বটা বেশ পাকাপাকিই হয়ে গেল তাহলে। এবার আর টেবিল ল্যামপের বালব্‌টাও বদলাবেন না। চোখটার একটা সেটাতে লাগিয়ে রাখবেন। শুধু মনে করে রোজ সকালে চোখদুটোকে রোদ্দুরে দিয়ে যেতে হবে। পুবদিকের জানালার ধাপে। সৌরশক্তির একটা সুবিধে। অফুরাণ।

ছবি: মৌসুমী

ছায়া

রাজকুমার রায়চৌধুরী

কৃষ্ণধন ঘোষদস্তিদার কয়েকদিন ধরেই টের পাচ্ছিলেন যে একটা লোক ওঁকে ফলো করছে। প্রথম দু-এক দিন উনি ব্যাপারটাকে কাকতালীয় ভেবেছিলেন। কৃষ্ণধন থাকেন উত্তর কলকাতার এক শহরতলীতে। কাজ করেন মধ্য কলকাতার এক বেসরকারী অফিসে। অফিস ছুটি হলে মেট্রো করে শ্যাম বাজারে নামেন। তারপর বাসে করে প্রায় আধঘন্টার পথ। বাস স্টপ থেকে একটা সাইকেল রিকশা চেপে বাড়ি যান। হাতে সময় থাকলে হেঁটেও যান দশ মিনিটের হাঁটা পথ। গত মঙ্গলবার ওঁর সঙ্গে একই কামরায় পার্কস্ট্রিট থেকে একটি লোক ওঠে। হাতে চামড়ার ব্যাগ বেশ বড় সাইজের। লোকটার চেহারা এমনিতে মনে রাখার মতো নয়। কিন্তু লোকটার চোখে মুখে এমন একটা কিছু ছিল যা কৃষ্ণধনবাবুর মনে একটা ছাপ ফেলেছিল।

কৃষ্ণধনবাবু শ্যামবাজার থেকে একটা সাদা বাসে চড়েন। বাসটা নতুন, রুটটাও নতুন। কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গী লোকটাও একই বাসে চড়ে। কৃষ্ণধনবাবু যে স্টপে নামলেন লোকটাও একই স্টপে নামে। শুধু তাই নয় কৃষ্ণধনবাবু রিকশায় উঠে খেয়াল করেন যে লোকটাও আর একটা রিকশায় চড়ে ওঁর পিছু পিছু আসছে। বাড়িতে ঢোকার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন যে লোকটা একদৃষ্টে ওঁর বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে।

পরদিন বুধবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এ পর্যন্ত ঘটনাটা কাকতালীয় বলতে কৃষ্ণধনবাবু রাজি ছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার ঠিক করলেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া দরকার। কৃষ্ণধনবাবু অফিস থেকে সোজা বাড়ি না গিয়ে বাসে করে শেয়ালদা গেলেন। বউবাজারে একটা চশমার দোকান থেকে একটা চশমার ডেলিভারি নিয়ে হেঁটে আবার শেয়ালদা স্টেশনের কাছে একটা বাসস্টপে এসে দাঁড়ালেন। লোকটিও ওই বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে এবার আর কৃষ্ণধনবাবু চমকালেন না। তবে উনি ওঁর রুটের প্রথম বাসটা ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলেন। দ্বিতীয় বাসটাতেও উঠলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। লোকটাও বাসটা ছেড়ে দেওয়ার পরে লাফিয়ে উঠল। এরপর মঙ্গলবার ও বুধবারেও লোকটা ওঁকে বাড়ি অবধি ফলো করল।

২

লোকটা যে ওঁকে ফলো করছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও কৃষ্ণধনবাবু ঠিক করতে পারছেন না কী করবেন। একবার ভাবলেন পুলিশকে জানাবেন। কিন্তু আরও পাঁচটা লোকের মতো কৃষ্ণধনবাবু পুলিশকে ভয় খান। ভাবলেন মেয়েকে জানাবেন। মেয়ে বিয়ের পর ওঁর বাড়ির কাছেই থাকে। নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে তবে জামাইটি ভালো পেয়েছেন কৃষ্ণধনবাবু। একটি মফস্বল কলেজে পড়ায় আর থিয়েটার নিয়ে মেতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন আগেই মেয়ের সঙ্গে ওঁর একটু মনোমালিন্য হয়েছে। বিতর্কটা একটা গাছ নিয়ে। কৃষ্ণধনবাবুর বাগানে একটা কদমগাছ আছে। আপনা হতেই হয়েছে, পাখিতে হয়তো বীজ ফেলে গেছে। গাছটা খুব তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে। এরমধ্যে পনেরো ফুটের মতো লম্বা হয়েছে। মুশকিল হয়েছে কি কৃষ্ণধনবাবুর দোতলার শোবার ঘরের সামনে দিয়ে গাছটা উঠেছে। জানালা খুললেই ডালপালা ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর জানালার ফাঁক দিয়ে। ওই জানালাটা কৃষ্ণধনবাবুর খুব প্রিয় জায়গা। ছুটির দিন সকালে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে কৃষ্ণধনবাবু চা খান। এখানে এখনও কংক্রিটের জঙ্গলের মতো বাড়ি গজায় নি। অনেকটা ফাঁকা জায়গা জানালা দিয়ে দেখা যায়। কাছে একটা ঝিলও আছে। এই সমস্ত দৃশ্যই আড়াল করছে গাছটা। তাই কৃষ্ণধনবাবু ঠিক করেছেন যে গাছটা কেটে ফেলবেন। ওঁর বাড়িতে যে জমাদার আসে তাকে বলে রেখেছেন। লোকটা কোনো পয়সা

নেবে না, উপরন্তু গাছটার কাঠের জন্য কিছু দামও দেবে বলেছে। কিন্তু মেয়ের বেশ আপত্তি। ওঁর মেয়ে ব্রততী যে শুধু বটানির ছাত্রী তাই শুধু নয়, গ্রিন আর্থ বলে একটা সোসাইটির সহ-সমপাদক। এই সোসাইটি যে কোন গাছ কাটার ঘোর বিরোধী।

৩

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে কদম গাছটা এখনও কাটা হয় নি। জমাদার ছুটিতে আছে। লোকটি নিয়মিত কৃষ্ণধনবাবুকে ফলো করছে। কৃষ্ণধনবাবু এখন বেশ শঙ্কিত বোধ করছেন। রোজই কাগজে দেখছেন সামান্য কারণে একে অপরকে মারছে। একটা মোবাইলের জন্য নামী-দামী স্কুলের ছাত্র তার সহপাঠীকে খুন করছে। কৃষ্ণধনবাবু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে ছুটির দিনে লোকটাকে উনি দেখতে পান না। কৃষ্ণধনবাবু ছুটির দিনে কোথাও বেরোন না। ওঁর স্ত্রী বাতে পঙ্গু। রাত-দিনের একটা লোক আছে। তবে ছুটির দিন কৃষ্ণধনবাবু মাঝে মাঝে নিজে দু-এক পদ রাঁধেন। রবিবার দিন ওঁর মেয়ে আসে। তবে গাছ নিয়ে ঝগড়া হওয়াতে হয়তো এ রবিবার মেয়ে আসবে না। এদিকে গাছটা নির্লজজ বেহায়ার মতো বেড়ে উঠছে। কৃষ্ণধনবাবু তিনটে দেবদারু গাছ লাগিয়েছিলেন। তারা আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের মতো বাড়ছে। কৃষ্ণধনবাবু ইতিমধ্যে কদমগাছটার নীচের দিকের কিছু ডাল-পালা ছেঁটে দিয়েছিলেন। দেবদারু গাছগুলো যাতে বাড়তে পারে সেই ভেবেই এ কাজটা করেছিলেন। কিন্তু কদমগাছটা বোধ হয় রক্তবীজের ঝাড়। আবার ডালপালা গজিয়ে উঠেছে। এত প্রাণশক্তি কোথা থেকে পায় কে জানে। কৃষ্ণধনবাবু ঠিক করলেন আর দেরি করা উচিৎ না। গোড়া থেকেই গাছটাকে কেটে ফেলতে হবে।

৪

আজ ছুটির দিন। কৃষ্ণধনবাবু জমাদারকে সকাল দশটার মধ্যে আসতে বলেছেন। কদম গাছটা আজই কাটা হবে। তবে যে লোকটা ওঁকে ছায়ার মতো ফলো করছে তার কথা কৃষ্ণধনবাবু মন থেকে ম ুছে দিতে পারছেন না। গলার কাঁটার মতো ব্যাপারটা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। সকালে দাড়ি কামাবার সময় লোকটার চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করছিলেন। কৃষ্ণধনবাবুর মতোই লোকটার সামান্য ভুঁড়ি আছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। হঠাৎ কৃষ্ণধনবাবুর দাড়ি কামানো থেমে গেল। ব্লেডের খোঁচায় থুতনির কাছটা খানিকটা ছড়েও গেল। খানিকটা রক্তপাতও হল। এর কারণ আয়নায় নিজেকে দেখে কৃষ্ণধনবাবুর মনে হলো লোকটার সঙ্গে ওঁর চেহারার খুব মিল আছে। ওঁর যমজ ভাই বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। দাড়ি কামানো শেষ হলে কৃষ্ণধনবাবু জানালার পাশে বসে চা খেতে খেতে কদম গাছটাকে দেখছিলেন। একটা সরু ডাল খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। জানালা বন্ধ করতে হলে ডালটাকে সরিয়ে দিতে হবে । ডালটায় নতুন পাতা গজিয়েছে। কৃষ্ণধনবাবু একটা পাতায় হাত বোলালেন। খুব নরম পাতা। কৃষ্ণধনবাবুর মনে হলো ওঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে পাতাটা বোধ হয় কাঁপছে। হয়তো মনের ভুল। না: আর একবার হাত বুলিয়ে একই অনুভূতি হলো। কৃষ্ণধনবাবু অন্যমনস্ক হলেন। অন্য একটা ডালে একটা বুলবুলি বসে ছিল। কৃষ্ণধনবাবুকে দেখেও উড়ে গেল না। কৃষ্ণধনবাবু ঘড়ি দেখলেন, জমাদারের আসার সময় হয়ে গেছে।

৫

কদমগাছটার ভাগ্য ভালো। কৃষ্ণধনবাবু ঠিক করলেন গাছটা আর কাটবেন না। আজকাল সকলেরই মোবাইল আছে। কৃষ্ণধনবাবু জমাদারকে মোবাইলে জানিয়ে দিলেন গাছটা কাটবেন না; দরকার হলে দড়ি দিয়ে ডালপালাগুলোকে একটু সরিয়ে রাখবেন যাতে জানালা দিয়ে ডাল না ঢোকে । পাশের বাড়ির মালি তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

৬

বেশ কয়েক দিন কেটে গেছে। কদম গাছটাও যেন সভ্য ভব্য হয়ে গেছে। গাছটা এখনও সতেজে বেড়ে চলেছে। তবে ডালপালাগুলো আর জানালার মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢোকে না। তবে এখনও কৃষ্ণধনবাবু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পাতাতে হাত বোলাতে পারেন।

আর একটা ব্যাপার। সেই লোকটা কৃষ্ণধনবাবুকে ফলো করছে না। যেন বাতাসে মিশে গেছে। কৃষ্ণধনবাবু বিভিন্ন রুটে বাড়ি ফিরে দেখেছেন কোনো লোক তাঁকে ফলো করছে না। মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেছে। প্রতি রবিবার কদম গাছের ছায়ায় বসে বাবা আর মেয়ের চা-এর আসর।

ছবি : মৌসুমী

চশমা ভূত

রুচিরা

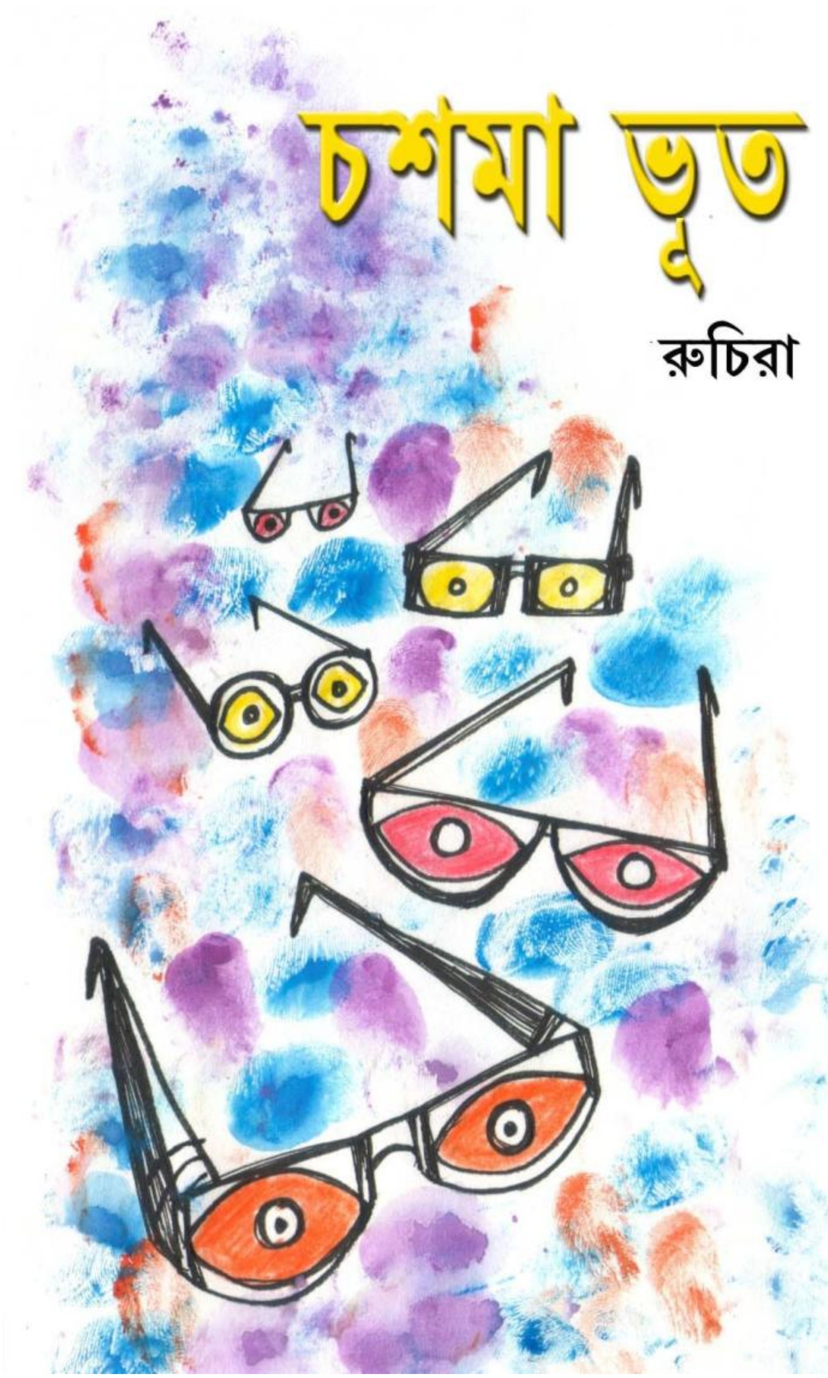

ক্লাসে ঢুকেই ইমন দেখল ক্লাসের পেছনের দিকে সবাই মিলে জটলা করছে। কিছু একটা জরুরি আলোচনা চলছে নিশ্চয়। ব্যাগটা বেঞ্চে রেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখে প্রীতমকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে। প্রীতমের চোখে নতুন চশমা। একেবারে হিরোর মতো লাগছে ওকে। ইমনের কতদিনের ইচ্ছে একটা নতুন চশমা কেনার। দাদু পরে, মা, বাবা সবাই পরে। এমনকি পাশের বাড়ির গোগোলদাও পরে। বাড়িতে কতবার বলেছে একটা চশমা কিনে দেওয়ার কথা। ওর কথায় কেউ কান দেয়না। দাদুর সঙ্গে গতবার মেলায় গিয়েও একটা রঙিন চশমা কেনার বায়না করেছিল। কিন্তু দাদু কিনে দিল না। বলল মেলায় যে চশমাগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো পরলে চোখ খারাপ হবে। আজব কথা। চোখ খারাপ হলে চশমা পরে আবার চশমা পরলে চোখ খারাপ হয়ে যায়। বড়রাও কেন যে মাঝে মাঝে ছোটদের মতো কথা বলে!

দেখতে দেখতে ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার নিজের জায়গায় বসে পড়ল। প্রীতম এসে বসল ইমনের পাশে। ইমন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ‘তোর চশমাটা আমাকে একবার পরতে দিবি?’

‘কক্ষনো না।’

‘আমি না তোর বেস্ট ফ্রেন্ড। তাও পরতে দিবি না?’

‘চশমা পরলে তোর চোখ খারাপ হয়ে যাবে।’

‘তাহলে তুই চশমা পরেছিস কেন?’

‘আমার চোখ খারাপ তাই পরেছি।’

‘এই বললি চশমা পরলে চোখ খারাপ হবে। আবার বলছিস চোখ খারাপ বলে চশমা পরেছিস। তোর মাথাটা কি গোলমাল হয়েছে?’

এ’কথা শুনে প্রীতমও একটু ঘাবড়ে গেল। মাথা চুলকে বলল, আচ্ছা টিফিনের সময় তোকে একবার লুকিয়ে-লুকিয়ে পরতে দেবো। এখন স্যার আসছেন। বলতে বলতেই অংকের স্যার ঢুকলেন ক্লাসে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা। লম্বা চওড়া চেহারা। মাথায় বড় টাক। মোটা কাঁচা-পাকা গোঁফ। কালো ফ্রেমের চশমা। ক্লাসে ঢুকেই চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে ঘসে ঘসে চশমার কাচ পরিষ্কার করে পরে নিলেন। তারপর বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে চশমার মাঝখানটা ঠেলে নাকের ওপর ঠিক জায়গায় সেট করে দিতে দিতে গম্ভীর গলায় বললেন-সবাই হোমওয়ার্ক করে এনেছ তো?

স্যারের ঐ চশমাটা নাকের উপর ঠেলে তুলে দেওয়ার স্টাইলটা দারুণ লাগে ইমনের। স্যার যখন বোর্ডে অংক করান তখন স্যারের ডানহাতে চক আর বাঁ হাতে ডাস্টার থাকে। কোন হাত ফ্রি থাকে না, তাই চশমাটা নেমে গেলে নাক কুঁচকে ফের সেট করে নেন। মাঝে মাঝে আবার হাত দিয়ে চশমা ঠিক করতে গিয়ে চকের সাদা গুঁড়ো লাগিয়ে ফেলেন মুখে। তখন খুব মজার লাগে দেখতে।

টিফিনের ঘন্টা পড়তেই টিফিন খেয়ে সব ছেলেরা দুড়দাড় করে খেলতে বেরিয়ে গেল মাঠে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রীতম একবার চারদিকটা জরিপ করে নিল। তারপর কেউ এদিকে আসছে না দেখে নিশ্চিন্তে নিজের চশমাটা খুলে ইমনের হাতে দিল।

‘দেখিস, সাবধানে পরিস। ভেঙে ফেলিস না যেন।’

চশমাটা যত্ন করে হাতে নিল ইমন। এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। হই হই রই রই করে

ছেলেরা সব হুটোপাটি করে ক্লাসে ঢুকে এল। প্রীতম আর ইমন কিছু বোঝার আগেই একজনের সাথে ধাক্কা লেগে ইমনের হাত থেকে চশমাটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। তারপর নানা জনের পায়ের চাপে দেখতে না দেখতেই সেটা গুঁড়ো হয়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল ইমন। কীভাবে ‘সরি’ বলা যায় ঠিক করে উঠতে পারল না। প্রীতম খুব বকবে ওকে। এমনকি দু ঘা মারতেও পারে। মারাই তো উচিত। কেন যে চশমটা পরতে চাইল!

কিন্তু আশ্চর্য। প্রীতম মারলও না বকলোও না। তার বদলে অদ্ভুত ঠান্ডা গলায় বলে উঠল, ‘তোকে চশমাভূতে ধরবে।’

‘যা: চশমাভূত আবার হয় নাকি?’

‘হয় হয়। একশোবার হয়। মানুষ মরে গেলে ভূত হয়। চশমা মরে কেন ভূত হবে না?’

‘মরে গেল কই? চশমাটা ভেঙে গেল।’

‘ভেঙে যাওয়া বলে নাকি এটাকে? একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। আর সারানো যাবে ভেবেছিস? এটা ফেলে দিয়ে আমাকে নতুন বানাতে হবে।’

ইমন মোটেই ভূতে বিশ্বাস করে না। মা-বাবাও বলে, ভূত বলে কিছু হয় না। তা, ভূতই যখন নেই তখন চশমা ভূত আসবে কোথা থেকে?

দেখতে দেখতে গরমের ছুটি এসে গেল। ইমন মায়ের সঙ্গে চলল মামার বাড়ি। প্রথমে বাস, তারপর ট্রেন, তারপর আবার বাস, তারপর রিকশা। সেই রিকশা এসে থামল মামার বাড়ির বিশাল লোহার গেটের সামনে। গেটের বাঁদিকে মার্বেল পাথরের ওপর লেখা আছে 'আকাশকুসুম'। গেট খুলে ঢুকলেই নজরে পড়ে বাগান ছাড়িয়ে পুরানো আমলের তিনতলা বাড়ি। খড়খড়ি দেওয়া কাঠের জানালা।

বাড়ির মাঝখানে চৌকোনা একটা উঠোন ঘিরে সার সার ঘর। অর্ধেক ঘরে কেউ থাকে না। বাগানটা খুব বড়। চারদিক ঘিরে অনেক নারকেল আর সুপুরি গাছ। ভেতরে ছড়ানো ছিটানো বড় বড় আম, জাম, কাঁঠাল আর সবেদা গাছ। গাছে ঝোলানো দুটো দোলনাও আছে। আর আছে শালুক ফুল ভর্তি একটা বিশাল পুকুর। সেই পুকুরে শান বাঁধানো সিঁড়ি। শানের ওপর ষোল ঘুঁটি খেলার ছক কাটা। বড় মামার ছেলে চিন্টু আর মিন্টু দুজনেই ইমনের থেকে ভালো ষোল ঘুঁটি খেলতে পারে। ছোট মামার মেয়ে উর্মি এখনো শিখে উঠতে পারে নি। তা ছাড়াও বাড়ির ভেতরে বাইরে কত যে খেলার জায়গা। ম ামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে সারাদিন খেলে আর গল্প করে দিব্যি আনন্দে কেটে যেতে লাগল ছুটির দিনগুলো।

একদিন দুপুর বেলা বড়রা সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু ইমন, চিন্টু, মিন্টু আর উর্মি এই চারমূর্তির চোখে ঘুম নেই। গ্রীষ্মের দুপুরে বাইরে বাগানে গিয়ে খেলতে বারণ আছে। অগত্যা বাড়ির ভেতরেই খেলছে ওরা। হঠাৎ দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ। ইমন গিয়ে দেখে খুব বয়স্ক একজন মানুষ দাদুর খোঁজ করছেন। কিন্তু দাদু তো দোতলায় ঘুমাচ্ছে। কে আবার ডাকতে যায়। খেলার সময় কেন যে বিরক্ত করে! ইমন বলে দিল, 'দাদু এখন বাড়িতে নেই।' লোকটি কিছু কথা না বাড়িয়ে চলে গেল।

আবার শুরু হল খেলা। কিন্তু এবারে এক নতুন উপদ্রব এসে জুটলো। একটা কাক এসে পাঁচিলে বসে চিল চীৎ কার জুড়ে দিল। তার আওয়াজে টেঁকা দায়। এটা ওটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওরা কাক তাড়াতে লাগল। কাক শুধু সরে সরে বসে। নয়তো উড়ে গিয়ে এক চক্কর দিয়ে আবার এসে বসে। অ বশেষে বেশ খানিকক্ষণের চেষ্টায় চিন্টুর এক অব্যর্থ টিপের আঘাতে কাক বিদায় হল।

কাকের ডাক থামতে না থামতেই সবার কানে এল আইসক্রিমওয়ালার লোভ জাগানো 'আ-ই-স-ক্রি-ম

হাঁক। মিন্টু ছুটে গিয়ে পয়সা আনলো। চারজনে চুপিচুপি দরজা খুলে বেরিয়ে আইসক্রিম কিনে খেল।

সন্ধ্যেবেলা দাদুর ঘরে ডাক পড়ল সবার। কী ব্যাপার কিছুই বুঝছ না কেউ! এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। দাদু ঠিক অংক স্যারের মত চশমাটাকে একটা আঙুল দিয়ে নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আজ কে কী দোষ করেছো বলে ফেলো তো!'

রেগে গেলে দাদু 'তুমি' করে কথা বলেন। কিন্তু কে যে কী দোষ করেছে তা কিছুতেই মনে পড়ছে না কারো। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে দাদু ফের বললেন, 'আমার জুতো পাঁচিলের বাইরে কে ছুঁড়ে ফেলেছে? কে আমার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছে? 'কে শুদ্ধবাবুকে বলেছে আমি বাড়িতে নেই?' শাস্তি না পেতে চাও তো এক্ষুনি দোষ স্বীকার করো।'

সবাই একদম চুপ। খানিক বাদে দাদু ফের বললেন, 'খুব বাড় বেড়েছে দেখছি তোমাদের। দোষ করে আবার লুকোতে শিখেছ? আমি কিছু জানিনা ভেবেছ? মিন্টুবাবু আমার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে কীসে খরচ করেছেন সেটা কি দয়া করে একটু জানাবেন?'

তুমি থেকে আপনিতে চলে গেছে কথা! মিন্টু মাথা নিচু করে হাতের আঙুল দিয়ে জামার কোনা পাকাতে পাকাতে শুধু একটা কথা বলল, 'আ-আইসক্রিম।'

'চিন্টুবাবু, আমার জুতো পাঁচিলের ওদিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে কেন সেটা বলবেন?'

'কাক তাড়ানোর জন্যে।'

'সেটা স্বীকার করতে কী অসুবিধে ছিল? যাও সবাই দশ পাতা করে হাতের লেখা করো এক্ষুনি। পাঁচ পাতা বাংলা আর পাঁচ পাতা ইংরিজি।'

'বারান্দায় সারি দিয়ে বসে ম্লান মুখে সবাই হাতের লেখা শুরু করল। খানিক বাদে দাদু নিজের চশমা আর ঘড়িটা টেবিলে খুলে রেখে বলল, 'এই যে আমার ঘড়ি আর চশমা রেখে যাচ্ছি টেবিলে। কেউ ভেবোনা আমি নেই। আমি একটু সামনের দোকান থেকে ঘুরে আসছি। এসে যেন দেখি হাতের লেখা শেষ। না হলে আমি আবার দশ পাতা হাতে লেখা করাবো। মনে রেখো আমি না থাকলেও আমার চশমা রইল। সব দেখতে পাবে, আর আমাকে রির্পোট করবে।'

দাদু চলে যেতেই দাদুর চশমার প্রতি অদম্য কৌতূহল হল ইমনের। দাদুর চশমা কি সত্যিই দেখতে পায়? না হলে রিপোর্ট করবে কী করে? চশমা আবার দেখতে পায় নাকি? ধুস। দাদু ওরকম বানিয়ে বানিয়ে বলছে।কিন্তু দাদু কেন মিথ্যা কথা বলবে? নাহ, চশমাটা পরে একবার দেখতেই হবে। হাত বাড়িয়ে দাদুর চশমাটা নিতেই চিন্টু বলল, 'খবরদার! দাদুর চশমায় হাত দিস না। দাদু জানতে পারলে কিন্তু-----'

ইমন কান দিল না। চশমাটা পরে ফেলল। আর পরতেই দেখতে পেল চিন্টু দাদুর চটিটা ছুঁড়ে দিল কাকের দিকে। কাক উড়ে পালাল আর জুতো গিয়ে পড়ল পাঁচিলের ওদিকে। এমনকি দেখতে পেল ও নিজেও সঙ্গে সঙ্গে একটা প্লাষ্টিকের মগ ছুঁড়ে দিয়েছে। সেটাও পাঁচিল টপকে ওদিকে পড়ে গেল। তারপরেই একটা স্টিলের চা খাওয়ার কাপ। সবাই যে যা হাতে পাচ্ছে সব ছুঁড়ে চলেছে। ভয় পেয়ে ইমন রেখে দিল চশমাটা। চশমাটায় কিছু একটা ম্যাজিক আছে!

খানিক বাদে চশমাটা আবার পরে দেখল ইমন। এবার দেখতে পেল ও সেই বয়স্ক ভদ্রলোককে হাত নেড়ে বলছে দাদু নেই। তারপর দেখলো মিন্টু চুপি চুপি ঘরে ঢুকে দাদুর ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে টাকা নিচ্ছে।

ও দাদুর চশমা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর সেই ফাঁকে বাকি সবার লেখা শেষ হয়ে গেল। তারা

খাতা পেন্সিল গুছিয়ে ওকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেল, 'আমরা খেলতে যাচ্ছি। চশমা রেখে তুই জলদি হাতের লেখা শেষ করে চলে আয়।'

এদিকে, ও চশমাটাকে ভুলে লেখায় মনই দিতে পারছে না। খানিক বাদে চশমাটা ফের একবার পরতেই কে একজন ফিসফিসিয়ে বলল, 'বার বার চশমা নিয়ে কী করছ? বড়দের চশমায় হাত দিতে নেই জানোনা?'

ইমন অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'আমি কঠিনীভূত।'

'কি কঠিন নাম!'

'হ্যাঁ। আমার মন খুব কঠিন। তাই আমার এমন কঠিন নাম।'

'তুমি থাকো কোথায়?'

‘কেন এই চশমায়? বিশ্বাস হল না?’

‘না না তা হবে না কেন? কিন্তু এত জায়গা থাকতে এই চশমায় থাকো কেন?’

‘এটা আমার অফিস। এখানে আমি কাজ করি।’

‘কী কাজ করো?’

‘যা সামনে থাকে সব দেখি আর যে চশমা পরে থাকে তাকে সব কিছু একটু কঠিন করে দেখাই।’

‘কঠিন করে দেখাও? তুমি খারাপ। তোমার জন্যই তাহলে দাদু এতো নিষ্ঠুর।’

‘এই শুনে কঠিনীভূত খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, তোমাদের মত দুষ্টু ছেলেমেয়েদের জন্যে এ’রকম নিষ্ঠুর দাদুই দরকার। আমি আবার যা দেখি ইচ্ছে করলে সব রেকর্ড করেও রাখতে পারি। অ বসর সময়ে সেই সব পুরানো রেকর্ড চালিয়ে চালিয়ে দেখি। তুমি এই যে আমাকে নিয়ে নাড়া-ঘাঁটা করছ তার একঝলক যদি তোমার দাদুকে দেখিয়ে দিই তাহলে তার ফল মোটেই ভালো হবে না। কাজেই এখন বরং তোমার লেখায় মন দাও।’

চশমা যথাস্থানে রেখে দিয়ে লিখতে শুরু করল ইমন। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই দাদু ফিরে এলেন। এসে চশমা চোখে দিয়েই রেগে আগুন। বললেন, ‘এবার থেকে তোমার দুপুরে খেলা বন্ধ। গোটা দুপুর মায়ের সঙ্গে শুয়ে ঘুমোতে হবে।’

পরদিন দুপুরে মা শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলেন। পাশে শুয়ে শুয়ে, খেলতে না পাওয়ার দু:খে ইমনের চোখে জল এসে গেল। দাদুর বকুনিটা হজম করা যায়। কিন্তু ছুটির দুপুরগুলো যদি ঘুমিয়েই কাটাতে হয় তাহলে মামার বাড়ি আসা কীসের জন্যে! তার থেকে বরং ঠাকুমার কাছে থাকলেই ভাল ছিল! কঠিনীভূতটাও কম দুষ্টু নয়। দাদুকে সব কিছু কঠিন করে দেখিয়ে দেখিয়ে দাদুর মনটাও কঠিন করে দিয়েছে। তাই না দাদু এতো রেগে গেল! আর একবার নাগালে পেলে খুব বকুনি দিতে হবে। আর, পরের বছর গরমের ছুটি পড়লে কিছুতেই মার সঙ্গে এ বাড়িতে আসতে রাজি হবে না ইমন।

শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবছে, তখন মা হঠাৎ বললেন, ‘এখনও ঘুমাস নি? কী নিয়ে এত ভাবছিস?’

‘কই কিছু না তো।’’

‘দুপুরের খেলা বন্ধ, তাই দু:খ হয়েছে? কী আর করবি। নে এখন ঘুমো,’ এই বলে মা আবার পড়তে লাগলেন।

মা কি করে যেন ঠিক বুঝে যান সবকিছু। ইশকুলের টিফিন লুকিয়ে ফেলে দিলে কিংবা রাস্তার কুকুরদের খাইয়ে দিলে, বাড়ি ফিরতেই বলবেন, ‘আজও তুই সব টিফিনটা খাস নি।’ কী করে হয়? ম ায়ের চশমাতেও কি তাহলে ভূত আছে? সে-ও কি সব রেকর্ড করে রাখে আর মাকে রিপোর্ট করে?

ঘাপটি মেরে শুয়ে রইল ইমন। খানিক বাদে মা চশমাটা টেবিলে রেখে ঘুমিয়ে পড়তেই ও চুপি চুপি উঠে চশমাটা পরে নিল। আর, পরতেই দেখতে পেল অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা। একদিন বিকেলে ও মাঠ থেকে খেলে বাড়ি ফিরেছে। মা ওকে দেখেই বলল- পায়ে কী হয়েছে?

‘কিছু হয়নি তো মা।’

‘ফুটবল খেলে চোট লাগিয়েছিস?’

মা কি করে বুঝতে পারল ভেবে খুব অবাক হয়েছিলাম সেদিন। মা যাতে না বুঝতে পারে তাই কত কষ্ট করে স্বাভাবিক হাঁটার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে ও বেশ খোঁড়াতে

খোঁড়াতেই ঢুকেছিল। মায়ের চশমার ভূতটাই তার মানে দৃশ্যটাকে এ'রকম ভাবে পালটে দিয়ে দেখিয়েছিল। সব চশমাভূতরাই কি একইরকম নিষ্ঠুর!

চশমাটা চোখে রেখেই ইমন ফিসফিস করে বলল, 'এই যে চশমাভূত। তুমি খুব পাজি তো।'

'আমি পাজি কেন? পাজি তো তুমিই।'

'তুমি আমার পায়ে চোট লাগাটা মাকে দেখিয়েছিলে কেন?'

'তুমি মায়ের কাছে লুকিয়েছিলে কেন? জানোনা মাকে কিছু লুকোতে নেই?'

'জানি। কিন্তু মা জানলে আমাকে বকতো। তোমার সেটা ভালো লাগত বুঝি?'

'তোমার কোথাও ব্যথা লাগলে তো মায়েরও কষ্ট হয়। তাই মা একটু বকে। কিন্তু মা তোমাকে ভালবাসে।'

'হ্যাঁ, বাসে। কিন্তু তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না। তুমি আমার বন্ধু নও, শুধু মায়ের বন্ধু।

'মা তো তোমারও বন্ধু। তাই আমিও তোমার বন্ধু।'

'এমন বন্ধু আমি চাই না। আমি কোন দোষ করলে তুমি যদি মাকে না দেখাও তাহলে আমি তোমার বন্ধু হব।'

'মাকে দেখাবো না এরকম তো হতে পারে না। আমার কাজই তো তাই।'

'কী কাজ শুনি তোমার?'

'দেখা আর দেখানো। আমার নাম অনুভূত। আমার অনুভূতি বেশি। আমি দেখানোর সময় দৃশ্যে একটু অনুভূতি মিশিয়ে দিই। তাই তুমি কিছু না বললেও তোমার মা তোমাকে দেখলেই সব অনুভর করতে পারে।'

'কিন্তু তুমি কাজের মাঝে মাঝে একটু ফাঁকিও তো দিতে পারো?'

'কাজে ফাঁকি দিলে সর্দার আমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে অন্য কোন ভূতকে কাজে লাগাবে। তখন হয়তো দেখবে তোমার মা অভ্রর মায়ের মতো সারাদিন তোমায় বকাবকি করছে। সেটা কি ভালো লাগবে?'

'উঁহু, লাগবে না। কিন্তু যদি চশমাটাই না থাকে তখন তুমি কোথায় থাকবে?'

'মানে?'

হঠাৎ একটা দারুণ আইডিয়া খেলে যায় ইমনের মাথায়। চশমা রেখে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে দাদুর ঘরে ঢুকল সে। দাদু দেয়ালের দিকে মুখ করে ঘুমোচ্ছেন। মাথার পাশে রাখা চশমা। আস্তে আস্তে চশমাটা নিয়ে বেরিয়ে এল ইমন। চোখে পরতেই দেখতে পেল দাদু বাইরে আম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চিন্টুকে কান ধরে উঠবোস করাচ্ছেন।

'এই কঠিনীভূত, দাদু কেন চিন্টুকে শাস্তি দিচ্ছিল রে?'

'চিন্টু একটা কুকুরের গায়ে ঢিল ছুঁড়েছিল। আর সেই ঢিল কুকুরের গায়ে না লেগে রাস্তায় একটা
লোকের গায়ে লেগেছিল।'

'তাই বলে ও'রকম শাস্তি দিতে হবে? চিন্টুকে বুঝিয়ে বললেই তো হতো। চিন্টু কি ইচ্ছে করে লোকটাকে মেরেছিল নাকি?'

'চিন্টু যা দুষ্টু! বুঝিয়ে বললে কিছু শোনে না। একই দুষ্টুমি বারবার করে যায়।'

'চিন্টু মোটেই দুষ্টু নয়। তুমিই খুব দুষ্টু। তোমার মন বড্ড কঠিন। দাঁড়াও তোমার ব্যবস্থা করছি আমি।'

এই বলে চশমাটা হাতে নিয়ে ছুট দিলো ইমন। বাড়ির পেছনের দরজা খুলে বাগানে এসে একটা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল চশমাটা।

কঠিনীভূত অনেক কাকুতিমিনতি করছিল, 'এ'রকম কোরো না। এই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রাখলে আমি সারাদিন একই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যাব।'

'তবে তুমি পালিয়ে যাও চশমা ছেড়ে।'

'পালাবো কী করে? তুমি কি তোমার বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারো?'

'পারি। এইতো মামারবাড়ি এসেছি।'

'সে তো মাত্র ক'দিনের জন্যে এসেছ।'

এইবারে ভীষণ রেগে গিয়ে চিন্টু বলল, 'দাঁড়াও, তোমার বাড়ি ছাড়ার ব্যবস্থা করছি।'

বলতে বলতে চশমাটা তুলে নিয়ে গাছের গুঁড়িতে ছুঁড়ে একদম ভেঙেই ফেলল ইমন।

সঙ্গে সঙ্গে দেখে, কোত্থেকে অনেকগুলো ভুত এসে ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

ইমন ছটফট করতে করতে বলে, 'আরে। ছাড়ো ছাড়ো। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

‘আমাদের সর্দার কেন্দ্রীভূত তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে অর্ডার করেছে।’

খানিক বাদে কেন্দ্রীভূতের অফিসে এসে তাকে নামিয়ে দিল ভূতেরা। চকচকে ঝকঝকে হাইটেক অফিস। চারদিকে সারি সারি কমপিউটার। ঘর জোড়া বড় বড় স্ক্রিন। সব স্ক্রিনে অসংখ্য চশমা ভূতেদের দেখা যাচ্ছে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না ইমন।

‘বাবা: কি বিশাল অফিস তোমাদের! এত কমপুউটার দিয়ে কী করো তোমরা?’ ইমন জিজ্ঞেস করল।

‘আমরা এখানে চশমাভূতদের নিয়ে রির্সাচ করি,’ ভূতেদের সর্দার উত্তর দিল।

‘রিসার্চ। কী রকম?’

সে সব তুমি বেশি বুঝবে না, তবু একটু বলি--কোন্ মানুষের চশমায় কোন্ ধরনের ভূত ইন্সটল করলে সেই চশমাধারীর ব্যক্তিত্বের ওপর কী ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হবে সেটা নিয়েই গবেষণা হচ্ছে আমাদের।

‘ভূতেরাও এতো সব উন্নতি করে ফেলেছে!’

‘কেন, মানুষদের থেকে ভূতেরা তো চিরকালই সব ব্যাপারে এগিয়ে আছে। এ তো প্রমানিত সত্য!’

‘কিন্তু আমাকে এখন আমাকে কিডন্যাপ করে আনার কারণটা কি জানতে পারি?’

‘নিশ্চয়। তুমি এই নিয়ে দু দুটো চশমা ভাঙলে। দুটো ভূত তোমার কারণে বেকার হল। এর একটা বিচার করতে হবে না?’

‘দেখো, প্রতীমের চশমাটা ভাঙায় আমার কোন হাত ছিল না। কিন্তু দাদুর চশমা নিয়ে কঠিনীভূত কিন্ত ভালো কাজ করছিল না। ওর জন্যই দাদু সবসময় ছোটদের ওপর রেগে থাকছিলেন। আচ্ছা তুমিই বলো তো, রেগে থাকা ভালো না খারাপ?

‘খারাপ।’

‘তাহলেই বল দাদুর রেগে থাকা কমানোর জন্যে এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল?’

‘উপায় একটা ছিল। তোমার দাদুর একটা পুরোনো চশমা আছে। সেটা দাদু আর পরেন না।সেটায় অভিভূত নামের এক ভূত থাকে। আগে জানতে পারলে আমরা ভূত দুটোকে পাল্টাপাল্টি করে দিতে পারতাম।

‘তাই নাকি? তাহলে বলছ সেই চশমাটা পরলে দাদু এতো রেগে যাবেন না?’

‘না। কারণ অভিভূত যা দেখে তাতেই অভিভূত হয়ে যায়।ছোটখাটো কাজেও সে খুব খুশি থাকে। ফ্রেমটা দেখতে ভালো নয় বলে তোমার দাদু সেই চশমাটা আর ব্যবহার করেন না। বাক্সবন্দী থাকতে থাকতে বেচারা অভিভূত, একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছে। এই তো সেদিন চ্যাট করে কতো কান্নাকাটি করলো আমার কাছে।’

‘ঠিক আছে। ওকে বাক্স থেকে উদ্ধার করার ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। কিন্তু দুটো ভূতকে বেকার করবার শাস্তি কিন্তু তোমাকে পেতেই হবে।’

‘আহা, প্রীতমের চশমাটা তো সবে ভেঙেছে! দুটো দিন অপেক্ষা করো। নতুন চশমা ও শিগগীরই বানাবে। তাতে ঐ একই ভূতকে কাজে লাগিয়ে দিয়ো।’

‘আর কঠিনীভূতের কী হবে?’

‘সে আমি কী জানি?’

কেন্দ্রিভূত খানিকক্ষণ ইমনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আরে, তোমার চোখে দেখছি একটু পাওয়ার আছে। তোমায় তো শিগগিরই চশমা বানাতে হবে----'

ইমন শুনে খুব খুশি। বলে, 'আমার চশমা হবে? কী মজা!'

'হ্যাঁ হবে। আর সেই চশমাতেই কঠিনীভূতকে কাজ দেওয়া যেতে পারে।'

'অ্যাঁ? খবরদার ঐ বাজে ভূতটাকে আমার চশমায় দেবে না।'

'তা হলে কোন ভূতটা দেবো?

'কই তোমার কাছে কী কী ভূত আছে দেখি?'

এইবারে কেন্দ্রীভূত ওকে নিয়ে গেল একটা বিশাল ভূত লাইব্রেরিতে। সেখানে ছোট ছোট অনেক আলমারিতে বাক্স ভরা সব ভূত, অ্যালফাবেটিক্যালি সাজানো। অঙ্গীভূত, পরাভূত, বহির্ভূত, বশীভূত, ঘনীভূত, মন্দীভূত আরো কত কি। সব বাক্সের গায়ে ভূতেদের নাম আর চরিত্র লেখা আছে। দেখে দেখে একটা ভূত পছন্দ করল ইমন। ডাক নাম 'কিম্ভূত'। ভালো নাম 'কি মজা ভূত'। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'যে কোন সাধারণ দৃশ্যেও মজা খুঁজে পায়।' একেবারে ইমনের মনের মত। পছন্দ শেষ হতেই সর্দার কেন্দ্রীভূত বলল 'তথাস্তু'। সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা আবার ওকে ঝুলিয়ে এনে বাগানে রেখে গেল। সেখানে তখন সাংঘাতিক কান্ড বেধেছে। দাদু খুব রাগারাগি করছেন চশমা নেই বলে। চিন্টু, মিন্টু, উর্মি আর বাড়ির সব বড়রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকুনি খাচ্ছে। ওকে দেখেই দাদু আরো রেগে গেল, 'তুই-ই নিশ্চয় আমার চশমা লুকিয়ে রেখেছিস। এক্ষুনি বার কর। আমার সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে ক্যারাম খেলার প্রতিযোগিতা আছে। চশমা না পেলে খেলব কী করে?'

'ওই চশমাটা হারিয়ে গেছে তো কী হয়েছে? তোমার আর একটা পুরোনো বাতিল চশমা আছে না? সেটা বার করো।'

'তুই আবার সেটার কথা জানলি কোত্থেকে?' এই বলে উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই দাদু চললেন চশমা আনতে।

দাদু সেদিন খেলায় জিতে ফিরেছিলেন। আর কি আশ্চর্য ব্যাপার, তারপর থেকে দাদুর মেজাজই বদলে গেছে। সব সময় হই চই করছে, আনন্দ করছে, আর কাউকে বকছে না। সবাই ভাবছে বোধহয় প্রতিযোগিতায়

জেতার জন্যেই হয়েছে এটা। আসলে তো শুধু ইমন জানে সব ঐ অভিভূতের কারসাজি।

পরদিন দুপুরে দাদু নিজেও ঘুমালেন না আর চিন্টু, মিন্টু, ঊর্মি, ইমন কাউকেই ঘুমোতে দিলেন না। বাগানে গিয়ে সবার সঙ্গে ক্রিকেট খেললেন। কেউ ব্যাটে বল ঠেকালে পারলে দাদু খুব খুশি হয়ে যাচ্ছিলেন। ইমন একবার এমন মারল যে বল গিয়ে লাগল আম গাছে আর টপ করে একটা আম নিচে পড়ে গেল।দাদু খুব খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন।, 'ব্রাভো ব্রাভো। এই না হলে আমার নাতি! গাছে অনেক আম পেকেছে। চল, আমরা নতুন একটা খেলা খেলি। সবাই ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়ব। খেলার একটাই নিয়ম। ঢিল ছুঁড়ে শুধু পাকা আম পাড়তে হবে। কাঁচা আম পাড়লেই আউট। আধ ঘণ্টায় যে সব থেকে বেশি আম পাড়তে পারবে সে একটা গল্পের বই প্রাইজ পাবে।'

মহানন্দে সবাই মিলে ছোড়, বড়, মাঝারি অনেক ঢিল জোগাড় করে জড়ো করতে শুরু করল। তারপর শুরু হল কমপিটিশান। মিন্টু দুটো পাকা আমের পর একটা কাঁচা আম পেড়ে আউট হয়ে গেল। চিন্টু সব থেকে বেশি মোট দশটা আম পাড়লো। কিন্তু ইমন আধ ঘন্টাতে একটাও আম পাড়তে পারল না। লজজায় তার মুখ ভার। এমনকি ছোট্ট ঊর্মি পর্যন্ত চারটে আম পেড়েছে। দাদু ওকে

আগাগোড়া লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, ‘মন খারাপ করিস না। তোর চোখটা বোধহয় ঠিক নেই। চল আমার সঙ্গে। ডাক্তার দেখিয়ে আনি। ’

ডাক্তারকাকু চোখ পরীক্ষা করেই বললেন, ‘চশমা নিতে হবে।’

কেন্দ্রীভূত তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল! কদিন পরে ইমনের নতুন চশমা এলো। চশমা পরেই ইমন বলল, ‘আরে কিম্ভূত, চশমাটা কী দারুণ রে। আমি সব কিছু কত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন। দারুন মজা লাগছে।’

ইমনের মুখে নিজের নাম শুনে ভূতটা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, ‘তুমি আমার নাম জানলে কি করে?’

ইমন স্টাইল করে হাতের একটা আঙুল দিয়ে চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে সেট করে নিয়ে বলল, ‘সেটা টপ সিক্রেট। ক্রমশ প্রকাশ্য।’

ছবি : মৌসুমী

অনুবাদ গল্প

লুকোচুরি

অমিত দেবনাথ

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল রোপারের। বিছানায় উঠে বসল সে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করছে মনের গভীরে। এ বাড়িতে সে একা নেই। আর কেউ রয়েছে।

অথচ বাড়িতে সে একা।

রাত গভীর। আকাশে চাঁদ নেই। চতুর্দিকের পুঞ্জীভূত অন্ধকার সঙ্গ দিচ্ছে তাকে। স্নায়ু টানটান হয়ে গেছে উত্তেজনায়, ঘাড়ের পেছনে অনুভব করছে একটা শিরশিরানি। আর অসহ্য গরম। সারা শরীর সপসপ করছে ঘামে। ভাল করে ঘুম চোখ কচ্‌লে পরিষ্কার করে রোপার তাকালো খোলা জানালার দিকে, যতক্ষণ না চোখ সইয়ে সেটার অবয়ব হালকা ভাবে ফুটে ওঠে। জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল গ্রীষ্মের গরম হাওয়ার হলকা। কান খাড়া করল সে। কোথাও কোন আওয়াজ নেই। সারা বাড়িটা থমথম করছে গোরস্থানের মত। এমনকি রাত্রের যে নিজস্ব কিছু শব্দ থাকে, তাও শোনা যাচ্ছে না।

তাহলে তার ঘুমটা ভাঙল কেন? আচমকা কোন আওয়াজ শুনে? কোন বিপদের আশঙ্কায়?

সে কি কোনও দু:স্বপ্ন দেখেছে, যেটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না? নাকি শুধুই কোন উদ্ভট কল্পনার প্রভাব?

না:, অনুভূতিটা ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। এ বাড়িতে নির্ঘাত আর কেউ রয়েছে। নাকি, অন্য কোন কিছু?

রোপারের মনে পড়ে গেল, বাড়িটার সমপর্কে এর এজেন্ট তাকে কিছু কথা বলেছিল। এই ম াঝরাত্তিরে সেগুলো একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে। এই বাড়িটা নাকি তৈরি হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। স্থানীয় কোনও এক পরিবারই নাকি তৈরি করেছিল বাড়িটা। সেই পরিবারের শেষ সদস্য যখন মারা যায়, তার বেশ কিছুদিন পরে এ বাড়িটা কেনে ল্যাভোল নামে এক ভদ্রলোক। বছর পাঁচেক আগে ল্যাভোল মারা যায়। মৃত্যু হয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই। স্থানীয় লোকজন জানতে পেরেছিল যে ল্যাভোল শয়তানের উপাসক ছিল এবং নানারকম অশুভ জিনিসের চর্চা করত। এজেন্ট তাকে এরকমই বলেছিল।এই গল্পটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে বেশি দেরি হয়নি এবং বহুলোক বিশ্বাস করতে শুরু করে যে বাড়িটা একটা হানাবাড়ি অথবা অভিশপ্ত বা ঐ রকম কিছু। এ কারণে এবং বাড়িটা যেহেতু পরিত্যক্ত এবং মেরামতির অভাবে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিল, তাই বাড়িটা বেশ কয়েক বছর ফাঁকাই পড়েছিল। তারপর পারবার নামের এক শখের প্যারাসাইকোলজিস্ট বাড়িটা ভাড়া নেয়। দিন দশেক বাদে হোয়াইটহলের একজন দোকানদার এ বাড়িতে মুদিবাজার পৌঁছে দিতে এসে আবিষ্কার করে পারবার মরে পড়ে আছে। খুন। তবে কিভাবে সে খুন হল সে ব্যাপারে সেই এজেন্ট বা অন্য কেউ কিছুই বলতে পারেনি।

কারো কারো ধারণা কোন প্রেতাত্মার হাতেই মৃত্যু হয়েছে পারবারের, আবার কারো কারো মতে সেই পাগলা খুনিই মেরেছে পারবারকে, যে নিউ ইংল্যান্ডের এই অঞ্চলে এর আগে অন্তত: ছটা খুন করেছে গত কয়েক বছরে। রোপার অবশ্য ভূত-পেত্নী- দত্যি- দানো কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না।ওসব গ্রাম্য কুসংস্কার তার নেই। ও'সবের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য সেই পাগলা খুনির অস্তিত্ব, যদিও সে সেই খুনিকেও সে ভয় পায় না । বাস্তবিক পক্ষে, সে কোন কিছুকেই ভয় পায়না। সমস্ত বিপদকে একটি ফুৎ কারে উড়িয়ে দিতে তার বন্দুকটাই যথেষ্ট, যেটা সবসময় তার সঙ্গেই থাকে। সপ্তাহ দুয়েক আগে তার বস্টন ব্যাংকের চাকরিটা চলে গেছে। নতুন করে চাকরি জোটানোর আগে সে এমন একটা নির্জন বাড়িই খুঁজছিল, যেখানে কয়েকমাস থাকলে অন্তত: মানসিক শান্তিটা বজায় থাকবে।

আজ আট দিন হল সে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। অবশ্য অন্য নামে, এবং সবাই জানে সে একজন লেখক, নির্জনে লেখালেখি করার জন্য এমন একটা ফাঁকা, নিরিবিলি পরিবেশই তার দরকার। এই আটদিনে কোন কিছু ঘটেনি। কেউ আসেনি। ভূত না, অপদেবতা না, কোন অদ্ভূত আলো দেখা যায়নি, হাঁড় কাপানো অট্টহাসি শোনা যায়নি, করুণ গলায় কেউ কেঁদে ওঠেনি, শোনা যায়নি কোন শেকলের ঝনঝনানি এবং কোনও পাগলও আসেনি, কোন চোরডাকাত আসেনি, এমনকি কেউ দেখা করতে ও আসেনি। কেউ না।

এত রাতে যেই এসে থাকুক না কেন, ঢোকার মজাটা টের পেতে ওর বেশিক্ষণ লাগবে না। বিছানা থেকে নেমে রোপার পাশের ড্রয়ারটা খুলে বার করে আনল তার পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলবার আর টর্চটা। পা টিপে টিপে দরজার সামনে গিয়ে দরজাটা খুলে একচুল ফাঁকা করে কান পাতল।

বাইরে সেইরকম সীমাহীন স্তব্ধতা।

রোপার দরজাটা খুলে ফেলল হাট করে। টর্চ জ্বালতেই বাইরের করিডর ভেসে গেল আলোর বন্যায়। কেউ নেই। বাইরে বেরিয়ে এল সে, মেপে মেপে পা ফেলে। করিডরে চারটে দরজা। দুটো বেডরুম, একটা বাথরুম আর একটা দিয়ে দোতলার বসার ঘরে যাওয়া যায়। সে প্রত্যেকটা ঘরের দরজা খুলল একে একে, টর্চ জ্বেলে দেখল প্রথমে, তারপর ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল।

ঘরগুলো ফাঁকা, হা হা করছে।

সে সিঁড়ির কাছে এল। সিঁড়িতে ঘন অন্ধকার। ল্যান্ডিং থেকে সিঁড়িতে আলো ফেলল সে। টর্চের আলো পড়তে লাগল মেহেগনি কাঠের দেয়ালে, ফার্নিচারে, ওপরের পার্লারের আর লাইব্রেরির আনাচে কানাচে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা ঘোর অন্ধকারের ওপর, ফালাফালা করে দিতে লাগল তাদের শরীর। কিন্তু কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। আর কোথাও কোন শব্দও নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সে, আলোটা চারিদিকে দোলাতে দোলাতে। নিচে নেমে সে মাঝের ঘরটার সামনে দাঁড়াল। ঝলসে উঠল টর্চ।ফাঁকা, আবার ওপরের পার্লারে গেল সে। আসবাবপত্র বোঝাই ঘর, দেয়ালের একপ্রান্তে ফায়ারপ্লেস, ঘরের জানলার কাচ টর্চের আলো লেগে চকচকে করে উঠল। চকিতে একবার পেছনে তাকাল সে। লাইব্রেরির ভেতর অন্তহীন অন্ধকার। কিন্তু কোন শব্দ নেই, কারো সাড়াও নেই। বন্দুক ধরা হাতেই সে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

পুরোন আমলের ঝাড়বাতির মধ্যে ইলেকট্রিক বাল্বটা জ্বলে উঠল বটে, কিন্তু দেখা গেল এ ঘরটাও ফাঁকা। কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে বসে নেই।

এবার লাইব্রেরিতে ঢুকল রোপার। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে দেখতে লাগল সবকিছু। ফাঁকা বুকশেলফ্, ফাঁকা আসবাব। ঝাড়বাতির আলোটা জ্বালাল সে। ফাঁকা ঘর।

সিঁড়ির পাশ দিয়ে সে একঝলক আলো ফেলল মাঝখানের হলঘরে, পরক্ষণেই আলোটা নিভিয়ে উঠে এল সিঁড়িতে। এর নিচে একটা ঘর মত আছে। ঘরটা খুলে দেখল। কিন্তু সেটা স্রেফ একটা ফাঁকা ঘরই, ধুলোয় বোঝাই।

তার মাথাটা আবার টিপটিপ করছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন তার সঙ্গে লুকোচুরি করছে। ছোটবেলার মতন। তার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই কথাগুলো। যে লুকিয়ে আছে, সে যেন বলছে; 'টু-কি, আমায় ধরতে পারে না, আমি এখানে!

হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল তার। রিভলবারটা উঁচিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে সে ঘরটার সামনে গিয়ে
দাঁড়াল। তারপর টর্চ ধরা হাতেই হাতলটা ঘুরিয়ে একঝটকায় খুলে ফেলল ঘরের দরজা। টর্চ এবং বন্দুক এখন দুটোই সটান তাক করা ঘরের দিকে।

কিচ্ছু নেই।

হুস্ করে একটা শ্বাস ফেলল রোপার। পিছিয়ে এল সেখানে, যেখান থেকে চারদিকটা আগের ম ত নজর করা যায়।সারা বাড়িতে এখনও গোরস্হানের নিস্তব্ধতা, এমনকি রাত্তিরে বাড়ির বিভিন্ন কাঠের জয়েন্টে যে সব অদ্ভুত শব্দ হয়, সে সব শব্দও এখন স্তব্ধ। সারা বাড়িটাই যেন এক অদ্ভূত, চরম নৈ:শব্দের সঙ্গীত উপভোগ করছে। এর মানে যদি হয় এখানে কোন অলৌকিক শক্তির বিরাজ করা, তাহলে-

''যত্তসব!'' হুংকার ছাড়ল রোপার নিজের মনেই। অলৌকিক বলে কিছু হয় না। ভূত বলেও নয়। অপদেবতা? ছো:!

কিন্তু এই বাড়িতে একটা কিছু আছে ঠিকই, কারণ প্রতি মূর্হুতেই সেই অনুভূতিটা আরও জোরালো হয়ে উঠছে তার কাছে- কিন্তু সেটা কোন মানুষের উপস্হিতি। সে চোর ডাকাত জোচ্চোর ছ্যাঁচোর গুন্ডা বদমাশ যাই হোক না কেন। এমনকি-সেই পাগলা খুনিটাও হতে পারে। তবে অবশ্যই ম ানুষ।

হলঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল সে। এবার একবার বসার ঘরটা দেখা দরকার। জোরালো টর্চের আলো, তারপর ইলেকট্রিক আলো জানিয়ে দিল ঘরটা একদম ফাঁকা। তারপর ডাইনিং রুম ফাঁকা, রান্নাঘর ফাঁকা। বাড়ির সামনের বারান্দা----ফাঁকা!!

ফাঁকা। সব ফাঁকা। সারা বাড়িতে ধূ ধূ করছে এক শূন্যতা।

তাহলে , হতচ্ছাড়াটা, সে যেই হোক না কেন, গেল কোথায়? কোথায় লুকিয়ে আছে সে?

সেলারে নয়তো? রোপার ভাবল।

কিন্তু সেলারে কি কেউ শুধু শুধু যায়? সেলার হল একটা বিশাল ঘর, পাথরের তৈরি, বেশির বাড়িতে মাটির নিচে থাকে। সেখানে এখন আছে শুধু মাকড়শার জাল। সেটাই একমাত্র জায়গা যেটা এখনও পর্যন্ত খুঁজে দেখা হয়নি।

রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে রোপার সেলারের দরজার কাছে গেল। হাতলটা খুব সহজেই ঘোরানো গেল, শব্দ হল না এতটুকুও। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সে নিচের দিকে তাকাল। ভেতরে অপরিসীম অন্ধকার ও সেই সীমাহীন নৈ:শব্দ।

সে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালানোর জন্য সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই মনে পড়ে গেল যে এখানে কোন আলো নেই। মানে আলো লাগানোই হয়নি। সে এর আগে যখনই সেলারে এসেছে, টর্চ নিয়েই এসেছে। আলাদা আলোর প্রয়োজন হয়নি। দরজাটা পুরো খুলে দিল সে। টর্চের আলোটা ফেলতে লাগল ডাইনে থেকে বাঁয়ে, ওপরের পাথুরে ছাদ থেকে নিচের মেঝে পর্যন্ত। টর্চের আলোয় অদ্ভূত আলোছায়ার নাচানাচি শুরু হয়েছে সেখানে। ফার্নেস, জিনিসপত্র রাখার শেলফ্, পানীয় রাখার কাঠের র‍্যাক, ঘরের দূর প্রান্তে কীসব যেন কালচে ছোপছোপ, ওপরের সিলিং থেকে ঝুলছে মাকড়শার জালের সারি।

রোপার একটু থমকে গেল। বোঝাই যাচ্ছে, এখানে কেউ নেই। তার মানে গোটা বাড়িতেই অন্য কেউ নেই। তাহলে সে বাড়িতে একা নেই এই যে অনুভূতিটা সারাক্ষণ মনের মধ্যে খচ্খচ্ করছে, সেটা স্রেফ কল্পনা। হুম্। ব্যাপারটা যেন একটু একটু বোঝা যাচ্ছে। একটু একটু নয় পুরোটাই। পুরোটাই, যে ভূত প্রেত রাক্ষস খোক্ষস শয়তানের পুজো, পারবারের খুন হওয়া, পাগলা খুনি সব মিলে মিশে তার মনের মধ্যে অ্যাদ্দিন ধরে তালগোল পাকিয়েছে। সারা সপ্তাহ ধরে সেগুলো কাজ করেছে তার অবচেতন মনে। আর আজ রাত্তিরে সেগুলোরই
বহি:প্রকাশ ঘটেছে। ঠিক এটাই হয়েছে। শিওর। এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু তা হলেও নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। এখানকার এই উঁচু জায়গাটা থেকে পুরো সেলারটা দেখা যাচ্ছে না। তাকে নিচে নেমে পুরো জায়গাটা ভাগ করে খুঁজে দেখতে হবে যে সত্যিই এখানে কেউ নেই, সে একা। তা না হলে আর রাত্তিরে আর ঘুম আসবে না।

টর্চ জ্বেলে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে সে নিচে নামতে লাগল। আলোর রশ্মিতে কেউ ধরা পড়ছে না। সিঁড়িতে পা ফেলার মৃদু আওয়াজ আর তার অতি ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে যেন ঘরটার নৈ:শব্দ আরও গাঢ় হল, ক্ষয়ে যাওয়া কাঠ, ধুলো আর ভ্যাপসা গন্ধ প্রবেশ করল তার নাসারন্ধ্রে। অস্বস্তিটা -----

আরও বেশি ঠান্ডা লাগছে। সে ডানদিকে ঘুরল, তারপর আস্তে আস্তে টর্চের আলোটা সমেত সে নিজেও উল্টোদিকে ঘুরে ঠিক সিঁড়ির মুখোমুখি দাঁড়াল।

কিস্যু নেই, কিচ্ছু দেখারও নেই, কিছু শোনারও নেই।

কিন্তু আলোতে শুধু সিঁড়িটাই দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির নিচের ধুলোয় ঢাকা অংশটায় আলো পড়ছে না- সেখানে ঘন অন্ধকার। সিঁড়ির পাশের দেওয়ালটায় বাধা পেয়ে আলো পৌঁছচ্ছে না সেখানে। ওখানটায় একবার দেখা দরকার।

আরেকবার তার মনে পড়ে গেল ছোটবেলার সেই লুকোচুরি খেলার কথাটা:'টুকি ! আমায় ধরতে পারে না! আমি এখানে, সিঁড়ির নিচে!'

দুহাতে শক্ত করে টর্চ আর বন্দুকটা ধরে আস্তে আস্তে ডানদিকে সরতে লাগল রোপার। অন্ধকার কেটে কেটে ধীরে ধীরে টর্চের আলো সিঁড়ির নিচটা দেখাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে ধূসর পাথরের ওপর আরো ধূসর ধুলোর আস্তরণ, মাকড়শার জাল। ধীরে ধীরে আরো কাছে গেল রোপার, মাথা নিচু করে টর্চের আলোটা ফেলল দেয়ালের দূরতম প্রান্তে।

ফাঁকা!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রোপার। এই প্রথম বারের জন্য ও! উদ্ভট কল্পনা যে কতরকম ভয়ের জন্ম দেয়! কেউ এখানে এই সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে নেই। ভূত-প্রেত-রাক্ষস খোক্কস। চোর ডাকাত, পাগলা খুনি - কেউ না। কে- উ না। এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। এখন সিঁড়ির তলায় যে লুকিয়ে আছে, সে তো সে নিজেই-

ঠিক তখন, কে যেন তার পেছনের অন্ধকার থেকে বলে উঠল, 'টুকি'।

বিল প্রনজিনির 'পিকাবু' অবলম্বনে।

ছবি: দীপংকর সেনগুপ্ত

চারদিন ধরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। কখনও মুষলধারে, কখনও বা থেমে থেমে, বুঝি বা দম নিয়ে নিচ্ছে। আরো জোরে সব শক্তি নিয়ে একসাথে মাটিতে আছড়ে পরার জন্য। দমদমের এই অঞ্চলটায় একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়, আর বেরোনো যায় না বাড়ির বাইরে। এমনিতে বৃষ্টি হলে ভালোই লাগে। ভেজা যায়, কিন্তু চারদিন স্কুল বন্ধ। গাড়ি আসবে না, অগত্যা। বাড়ি বসে থাকতে কি কারো ভালো লাগে? পড়াটা না হয় বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে কিন্তু এই কদিন তো কারোর সাথেই দেখা হল না!

আর গাড়ির বন্ধুরা! শ্রেয়া, বিদিশা, অনুষ্কা, স্বর্ণাভদাদা, প্রেরণা এদের কারোর সাথেই দেখা হচ্ছে না। বিলডারভিয়ার ডট কম-এ কারোর নতুন বন্ধু হল কি না, হানা মনটানার কালকের ড্রেস, বারবি ডট কম, নতুন সিনেমা, কোনো কিছু নিয়েই আলোচনা আড্ডা হচ্ছে না এফ এম চ্যানেলের গান, তার সাথে ওইটুকু মারুতি ভ্যানে নাচের কমপিটিশন সবই তো বন্ধ।

সবমিলিয়ে বর্ষার মন খারাপ। প্রথম একটা দিন না হয় বৃষ্টিতে ভেজা গেছে, ছাদের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে ও আর ওর বোন মেঘ খুব ভিজেছে। একটু ঠাণ্ডাও লেগেছে। কিন্তু তাতে কী হল? মা বলেছেন বৃষ্টিতে ভিজলে ঘামাচি মরে যায়, তাই তো ওরা ভিজেছে। তারপর ওরা ছাদের পাইপের মুখটা বন্ধ করে দিয়ে জল জমা করেছে, আর নৌকো বানিয়ে তাতে ভাসিয়েছে। কিন্তু ওইটুকুই, এতে কি আর ভালো লাগে? বাড়িতে থাকা মানেই মা খালি বকেন, টি ভি দেখবে না, ইন্টারনেট বেশি খুলবে না, শুধু পড়া আর পড়া। ভাল্লাগে না বাবা! এর থেকে স্কুলই ভালো।

বর্ষা তাই ভালো নেই। ওর মনখারাপ। আর মন খারাপ হলে ওর ইচ্ছে করে মেঘের পাশে শুয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে গল্প শুনতে। কিন্তু মা কি এখন গল্প বলবেন? মার যে এখনো অনেক কাজ বাকি! রান্না কি হয়ে গেছে? হয়ে গেলে স্নানে যাবেন, পুজো করবেন, তারপর আবার ওদের নিয়ে পড়বেন। 'খেয়ে নিবি আয়, একটা বেজে গেছে', 'দাদান খেতে বসে গেছেন','কেউ কথা বলবে না খেতে বসে'। দুর, খাওয়ার সময় কি চুপ করে থাকা যায়? কিন্তু মার ওই এক কথা-- দাদান পছন্দ করেন না। অথচ দাদান আমাদের ছাড়া খাবেনও না।

বর্ষা তাই ভালো নেই, সব মিলিয়ে ভালো নেই। আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না! মেঘ যদি এখন মাকে গিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে আসে? গল্প বলতে বলে? মেঘের কথা মা ঠিক শুনবে। না শুনলে তো মেঘ এমন কান্নাকাটি জুড়ে দেবে যে মা দাদানের বকুনি খাবার আগেই গল্প শোনাতে বসে যাবে। ভাবতে ভাবতে বর্ষা মেঘকে ডাকলো। মেঘ তখন জানলায় বসে হাসিকে স্নান করাচ্ছিল।

''বোন গল্প শুনবি?''

''দাঁড়াও দিদি হাসিকে মুছিয়ে দিই, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।''

''তাহলে গল্প শুনবি না?''

মেঘ তাড়াতাড়ি জানলা থেকে নেমে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে একটা হাসি দিয়ে বলল,

''কীসের গল্প বলবে? সিন্ডেরেলা নাকি স্নো হোয়াইট?''

''এগুলো তো অনেকবার শুনেছিস, আজ একটা নতুন গল্প বলব।''

''কীসের?' এই বলে একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল,''ক্ষীরের পুতুল?''

''না রে, একটা অন্য গল্প।''

''এত কথা ভালো লাগছে না, বললে বল নাহলে আমার কাজ আছে।''

''কেন? তোর আবার কীসের কাজ?''

''বা রে? হাসিকে খাওয়াতে হবে না? ওর বুঝি খিদে পায় না?''

বলার ধরণ দেখে বর্ষা হেসে উঠল। মেঘটা এত পাকা! ওই তো একটা প্লাস্টিকের হাঁস, তার আবার খিদে!

''তুই বুঝি তোর দিদিকে ভালোবাসিস না?''

''বাসি তো। বল' মেঘের আবার তাড়া।''

''বলছি। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? রোজই তো আমি বলি, আজ যদি মা গল্প বলে?''

''মা? খানিকটা ভেবে মেঘ বলল, কিন্তু মাকে বললেই তো মা বলবে এখন নয়।''

''না রে তুই বললে বলবে না।''

''ঠিক বলছো?''

''হ্যাঁ।''

ঝিল তখন রান্নাঘরে খাবার গোছাচ্ছিল। এক্ষুনি বাবা পুজো করে ঠাকুরঘর থেকে নামবেন। তারা আগেই সব রেডি করে ফেলতে হবে। মেঘ বর্ষাকেও খাওয়াতে হবে। ঠিক এই সময়েই মেঘ এসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

''কী রে, খিদে পেয়েছে?''

''না। আমার সোনা মা একটা গল্প বলবে?''

''এখন? দেখছিস না খাবার রেডি করছি।''

''বলো না মা, বলেই মেঘ দিদির দেওয়া মর্ফার পাওয়ার উইন্ডোটা ঝিলের দিকে চার্জ করল, ''বলো, নইলে--''

ঝিল ভয় পাওয়ার ভান করে বলল, ''আচ্ছা বলব, আগে খাওয়া হোক।''

''না এখনই চলো, নইলে কাট্টি।''

''আবার কাট্টি? বললাম তো দুপুরে বলব।''

''তখন তো বলবে ঘুমিয়ে পড়ো।''

''পারি না বাবা! আচ্ছা, ঘুমোতে বলব না। ঠিক গল্প বলব, দেখিস!। এখন খেতে আয়। আর দিদিকে ডাক,'' বলে ঝিল আবার ব্যস্ত হয়ে গেল।

সব কাজ শেষ করে ঝিল দুপুরে শুতে এল। মেঘ জড়িয়ে ধরে বলল, ''মা গল্পটা বল।''

''কীসের গল্প শুনবি?''

''ক্ষীরের পুতুল। মা চাঁদটা কি সত্যিই ক্ষীর দিয়ে তৈরি?''

ঝিল হেসে বলল, ''তোকে কে বলল?''

''দিদি বলেছে চাঁদের বড়ো বড়ো ইঁদুরগুলো সেই ক্ষীর খেয়ে নেয় বলে চাঁদের গায়ে অত গর্ত।''

''তাই? দিদি তো বেশ সুন্দর গল্প বলেছে! বলে বর্ষার দিকে তাকিয়ে বলল, বইটা পড়েছিস?''

''না।''

''শুনবি?''

''না।''

''তাহলে কীসের গল্প শুনবি?''

''তোমার গল্প।''

''আমার? আমার আবার কিসের গল্প?''

''তোমার ছোটোবেলার। আচ্ছা মা বৃষ্টি হলে তুমি স্কুলে যেতে?''

''হ্যাঁ।''

''কী করে যেতে?''

''হেটে হেঁটে।''

''জল জমলে?''

''জল মাড়িয়ে। সে এক দারুণ মজা। এখানে তো জানিস কত জল জমে! আমরা ওই জল সপাৎ সপাৎ করে মাড়িয়ে জুতো মোজা খুলে হাতে নিয়ে স্কুলে যেতাম আসতাম।''

''ঘেন্না করত না? কী নোংরা জল।''

''না রে তখন করত না। বরং মজা লাগত। তবে বাড়ি ফিরে ভালো করে স্নান করে নিতাম।''

''আর কী করতে?''

''আর, আর------ রাত্রে বৃষ্টি হলে ঠাম্মার বুকে মুখ রেখে গল্প শুনতাম। ঠাম্মা খুব ভালো গল্প বলতো।''

''বলো না মা, মেঘ অধৈর্য।''

''চুপ কর না বোন। মা বলো তো।''

''কী বলবো?''

''তোমারা ঠাম্মার কথা।''

‘‘তোমার ঠাম্মা আমাদের কে হয় গো মা? মেঘের অবাক প্রশ্ন।’

‘‘গ্র্যান্ড দিদা, তাই না মা? বর্ষা বলল।’’

‘‘হ্যাঁ। বড়ো দিদা।’’

‘‘গ্র্যান্ড দিদা কীসের গল্প বলত? তোমাদের কাছেই থাকত বুঝি মা?’’

‘‘কে? ঠাম্মা?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘না। গ্রামেই বেশি থাকতেন। মাঝে মাঝে আসতেন।’’

‘‘আজিমগঞ্জ?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘তোমরাও যেতে?’’

‘‘হ্যাঁ। গরমের আর পুজোর ছুটি, টানা একমাস করে।’’

‘স্কুল এতদিন বন্ধ থাকত?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘পড়তে না?’’

‘‘বই নিয়ে যেতাম, কিন্তু পড়া সে’রকম হোত না। তাছাড়া সন্ধ্যার পর তো পড়া যেত না।’’

‘‘কেন?’’

‘‘লাইট ছিল না তো, হ্যারিকেনের আলোয় ঠাম্মা পড়তে দিত না।’’

‘‘তাহলে কী করতে?’’

‘‘ঠাম্মা গল্প বলত।’’

‘‘আর দিদান?’’

‘‘রান্না করত।’’

‘‘কী গল্প বলত ঠাম্মা?’’

:‘‘সেসব গল্প কি তোদের ভালো লাগবে?’’

‘‘বলো না কীসের?’’

‘‘জাদু, সাদা পাখি, দৈত্য, পরী। তোরা এখন কার্টুন দেখিস। ’’

‘‘বলে তো দেখো মা।’’

ঝিল চোখ বুজলো। টাইম মেশিনটা খুব জোরে পৌঁছে গেল বছর কুড়ি আগে। সেই আধো অন্ধকার গ্রামের উঠোন, হ্যারিকেন জ্বলছে আর বাগানে চাঁদ তারারা সার বেঁধে নেমেছে, তাদের আলো গায়ে মেখে আলো-আঁধারি গাছগুলো স্নান করছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, কোথাও বা শেয়ালের ডাক, বেড়ালগুলো এদিক ওদিক দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে। আর ওরা তিন বোন সেই গভীর সন্ধ্যায় ঠাম্মার গা ঘেঁষে বসে। ঠাম্মার গা দিয়ে কী সুন্দর গন্ধ বেরোতো। চন্দনের কি? ঝিল বুঝে উঠতে পারেনি কোনোদিন, গন্ধটা কীসের ছিল? কিন্তু নাকে এখোনো গন্ধটা রয়ে গেছে।

ঠাম্মা গল্প বলত।

‘‘কোনো এক দেশে অনেকদিন আগে এক গরীব চাষি আর তার বউ ছিল। ওদের একটুকরো জমি ছিল। সেই জমি চাষ করে কোনোরকমে দিন চলত। একদিন খুব সকালে ওরা দুজনে--------’’

‘‘চাষি আর তার বউয়ের বুঝি কোনো নাম নেই ঠাম্মা?’’ ঝুম প্রশ্ন করল।

‘‘আছে তো। রামু আর শ্যামা। তারা তো একদিন জমিতে গিয়ে সারাদিন ধরে রোদে পুড়ে ম াটি কোপালো। জমি কুপিয়ে ওরা সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরল। পরদিন সকালে জমি দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া। দেখে কি, জমি কোপানোর আগে যেমন ছিল ফের তেমননই হয়ে গেছে। ওরা সেদিন আবার কোপালো। পরদিন এসে দেখে আবার একই কাণ্ড। এইভাবে দিন পাঁচেক চলার পর রামু শ্যামাকে বলল, আজ আর আমি বাড়ি যাবো না, রাতে এখানেই থাকব। দেখি কী করে এটা হচ্ছে?’’

শ্যামা চলে গেলো। আর রামু হাতে একটা ছুরি নিয়ে বসে রইল ঝোপের আড়ালে মাদার গাছের তলায়। বসে থাকতে থাকতে ওর ঘুম পেয়ে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ও ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে কীসের যেন শব্দ পেয়ে রামুর ঘুম ভাঙল। চাঁদ তখন মাথার ওপর। রামু চেয়ে দেখে সেই চাঁদের আলোয় আকাশ থেকে সাদা রং -এর একটা বিশাল পাখি তার জমির ওপরে নেমে এসে বসলো আর টুং টাং সুরে গান গাইতে লাগল। যেই গান গাওয়া শেষ হল অমনি জমিটা আবার আগের মতো হয়ে গেলো। তখন পাখিটা নাচতে লাগল ঘুরে ঘুরে।রামু তখন এক নিমেষে ঝোপ থেকে বেড়িয়ে এসে পাখিটাকে বলল, ‘তাহলে তুই-ই সেই বদমাশ যে আমার পরিশ্রম নষ্ট করে দিস। আজ আর তোকে আস্ত রাখব না, তোকে কেটেই ফেলব।’ তখন পাখিটা বলল, ‘আমায় মেরো না, আমি জাদু জানি। তোমায় অনেক দুধ দেবো।’

ঝুম বললো, ‘পাখি কখনো দুধ দেয়? ও তো ডিম পাড়ে ঠাম্মা !’

‘‘শোনো না বাপু, এত কথা বললে কি গল্প বলা যায়?’’

ঝিল তাড়াতাড়ি ঝুমকে চুপ করালো, ‘‘বলো ঠাম্মা।’’

‘‘রামুও পখিটাকে তাই বলল, ‘‘মিথ্যে কথা বলছিস, তোর কখনো দুধ হয়? তোর তো ডিম হয়।

‘‘না গো। বিশ্বাস করো। আমি পারি।’’

‘‘ঠিক আছে বিশ্বাস করবো যদি তুই আমার জমিকে আমি যেমন করেছিলাম তেমনি করে দিস।’’

পাখি আবার গান ধরলো। দেখতে দেখতে জমি কোপানো হয়ে গেল।

রামু অবাক। এ-ও হয় নাকি? এবার ও পাখিকে বলল, ‘‘দুধ এনে দে। তুই কথা দিয়েছিস।’’

পাখি তখন রামুর হাতের ওপর দুধ এনে দিল।আশ্চর্য সে দুধ, ক্রিমের মতো জমাট, শাদা আর কি মিষ্টি!

‘‘তারপর?’’

‘‘তারপর রামু পাখিটাকে বাড়ি নিয়ে এলো। পাখি আবার দুধ দিল। রামু আর শ্যামা সেই দুধ খেলো, শ্যামা রামুকে বলল, ‘পাখিটাকে বাড়িতে রেখে দাও। তাহলে আমাদের খাবারের অভাব হবে না।’

‘সেই থেকে পাখিটা ওদের বাড়িতেই থেকে গেল। আর রোজ দুধ খেতে খেতে রামু আর শ্যামা মোটা সোটা সুন্দর হয়ে গেল আর গ্রামের লোকেরা তাই দেখে অবাক হয়ে গেল-------’’

ঝিল, রুম, ঝুমও সেই মায়াবী চাঁদের এক চিলতে আলোয় অবাক হয়ে ভাবতে বসলো। কাঁঠাল গাছের চারপাশে অজস্র জোনাকির ভিড়। মনে হচ্ছে আকাশের ছায়াপথের একটুকরো খসে পড়েছে ওই গাছের তলায়। ঠাম্মার গা বেয়ে রাত নামলো। আবছা আলোয় চারদিক রহস্যময় হয়ে উঠলো। আর

ওরা তিনবোন সেই নির্জন রাতে ঠাম্মার গায়ের ওম নিতে নিতে খোলা বারান্দার ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লো।

''মা গল্পটা কি শেষ হয়ে গেলো? বর্ষার প্রশ্নে ঝিলের ঘুম ভাঙলো। মেঘ তখন ঘুমে কাদা।''

''গল্প ? হ্যাঁ ঠাম্মা তো ওখানেই শেষ করেছিল।''

''এরপরেও গল্পটা ছিল, ঠাম্মা বলেননি।''

''তুই কী করে জানলি?''

''গল্পের বইতে-এ আছে। আফ্রিকার রূপকথায়। তবে নামগুলো এক নয়।''

'হবে হয়তো। ঠাম্মা তো অনেক বই পড়তো। শোনার সময় বললি না তো?''

বর্ষা হেসে বলল, ''তোমার কাছে শুনতে ভালো লাগছিল। আচ্ছা মা তোমরা যে গ্রামে গিয়ে থাকতে, কষ্ট হোত না?''

'না রে, তখন কষ্টা কী বুঝতামই না।''

''অন্ধকার? গরম? তোমাদের ভয় করতো না?''

''না। আমি তো ভীষণ দুষ্টু ছিলাম। ভয় বলে কোনো কিছুই আমার ছিল না।''

''দিদান বলে, তুমি নাকি গাছে উঠতে, কুয়ো একলাফে পাড় হতে?''

ঝিল হাসলো।

''বলো না মা !''

''একবার গরমের ছুটিতে ছোটকা এসে আমায় নিয়ে গেলো। সেবার আমি একাই গেছিলাম। দুপুরবেলা ঠাম্মা ঠাকুরদা ঘুমিয়ে পড়লে আমি এবাড়ি ওবাড়ি, গাছে ওঠা, বাগান-গঙ্গাঘাট-শ্মশান এসব করে বেড়াতাম। একদিন দুপুরে উঠোনে বসে আছি, ভাবছি কী করা যায়, দেখি একটা বাঁদর কুয়োর ওপরে। কুয়ো দেখেছিস?''

''না, দেখিনি, তবে ছবি দেখেছি। রাজস্থানের মেয়েরা জল পাওয়ার জন্য অনেক দূর হেঁটে কুয়ো থেকে জল তুলে আনে।''

''হ্যাঁ। দড়ি দিয়ে বালতি বেঁধে নীচে নামিয়ে জল টেনে তুলতে হয়। আর ওপরে একটা রডের সাথে আরেকটা বালতি বাঁধা থাকে। এই বালতি নীচে নামে আর অন্যটা উপরে ওঠে। যা হোক, দেখলাম বাঁদরটা কুয়োর এপারে একবার ওপারে একবার লাফ দিচ্ছে। আমি ভাবলাম, বাঁদর যদি পারে আমি কেন পারবো না? ব্যস লাফ
দিয়ে কুয়োর ওপর। তারপর একবার এদিক একবার ওদিক।

''তোমার ভয় করেনি?''

''এখন ভাবলেই ভয় করে। দেখ কাঁটা দিচ্ছে। অথচ তখন মনে হোত এর থেকে সহজ আর কিছু নেই।''

''তুমি খুব সাহসী ছিলে তাই না?''

''হুঁ উ--। পাঁচ-ছ'দিন তো ওরকম হল, ঠাম্মা জানতেও পারলো না। তারপর বাঁদরটা একদিন ডুবে গেল। ঠাম্মাকে পাশের বাড়ির কাকিমা বলে দিল আমি রোজ কুয়োটা লাফিয়ে এদিক ওদিক করি। ঠাম্মা প্রচণ্ড বকলেন। পরদিন সক্কালবেলায় অমলকাকু কলকাতায় আসছিল, আমিও পেছন পেছন ট্রেনে উঠে পড়লাম।''

''তোমায় কেউ দেখেনি?''

‘‘উঁহু। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর ভয় হল, তখন কাকুর সামনে গেলাম। কান্না জুড়ে দিলাম। মা বাবার জন্য মন খারাপ করছে, বাড়ি যাব। তখন তো আর মোবাইল ফোন ছিল না। কাউকে খবর দিতে পারল না কাকু।’’

‘‘তারপর?’’

‘‘আমি তো চলে এলাম। ওইদিকে তখন হুলুস্থুলু। ঝিলকে পাওয়া যাচ্ছে না। সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি। কুয়োয় লোক নামানো। গঙ্গার ঘাটে মাঝিরা, এবাড়ি-ওবাড়ি, শেষ পর্যন্ত স্টেশনের এক চা-ওয়ালা কাকুকে বলল, আপনার ভাইঝিকে দেখলাম ট্রেনে উঠতে। ব্যস ছোটকা তখন বাবাকে ফোন করল। বাড়িতেও কান্নাকাটি। এমন সময় অমলকাকুর সাথে আমি ঢুকলাম।’’

‘বকা খাওনি?’’

::হ্যাঁ ভীষণ। বাবা তো বলেই দিলেন আর কোথাও কোনোদিন যেতে দেবেন না। তারপর মাস পাঁচেক গেলাম না, পুজোর সময় মা বাবার সাথে গেলাম।’’

‘‘আচ্ছা মা, কুয়োটা এখনও আছে?’’

‘‘কে জানে? আছে হয়তো। কতদিন যাইনি।’’

‘‘আর কী করতে ওখানে গিয়ে?’’

‘‘ঘুমোতে দিবি না? খালি বলে যেতে হবে?’’

‘‘হ্যাঁ।’ বর্ষার গলায় আবদার।

‘‘খুব ভোরে উঠে ঠাকুরদাদার সাথে মন্দির মসজিদ পীরবাবার কবর শ্মশান এসব ঘুরে বেড়াতাম। তারপর ফিরে এসে এবাড়ি সেবাড়ি। মাঝে মাঝে ভাবি জানিস সেই মানুষগুলো কেমন আছে? কোথায় আছে? কী করছে? কত বছর ওদের দেখিনি, খবরও পাইনি, তখন মন খারাপ করে।’’

ঝিল আবারও ভাবনার গহন গভীরে ডুবে গেল। দাদু-দিদা যেন ফের ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। দাদুর গলা শুনতে পেল ঝিল, ‘‘দেখছ না নাতনি কাঁদছে, তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে এসো। গান গাইতে হবে।’’

‘‘চানই তো হয়নি।’’ বাথরুম থেকে দিদার চিৎকার।

‘‘না হোক, যেভাবে আছো সেভাবেই এসো।’’

দিদা বেড়িয়ে এলো। গান ধরলো। দাদু আমুলের কৌটো ঢোলের মতো করে বাজাতে থাকল। ঝিল নাচে। সোহাগ চাঁদ বদনী----- ঝিল নেচে যায়-----------

দাদু দিদা ওরা কোথায় হারিয়ে যায়, কোথায় ওরা ঝিল জানে না। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সময় কি সত্য নিষ্ঠুর! সব ভুলিয়ে দেয়। এই দুপুরবেলা মেয়েদের পাশে শুয়ে ঝিলের ভীষণ কান্না পায়। অথচ সে কান্না মোছাতে ওরা কোথায়?

‘‘মা তুমি কাঁদছ?’’

‘‘না, ভাবছিলাম।’’

‘‘তোমার মন খারাপ করছে, না মা?’’

‘‘না:। এখন মন খারাপ করে না। মনে পড়ে----’’

‘‘মা,’’ বর্ষা ঝিলকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘‘আমায় একবার আজিমগঞ্জ নিয়ে যাবে?’’

‘‘তুই যাবি?’’

বর্ষা ঝিলের দিকে তাকালো। সেই দৃষ্টিতে ঝিল আবার হারিয়ে গেল। ঝিল ছুটছে গঙ্গার ধারে। আলপথ ভেঙে। ওই তো বাসুরিতলার মন্দির। ওই তো জীবনমাঝি। নৌকা। কু ঝিক ঝিক রেলগাড়ি। পীরবাবা। ঠাকুরদা উঁচু করে ধুতি পরে পিছনে হাত দিয়ে হাঁটছে খড়ম পায়ে। পোস্ত রাঁধছে ঠাম্মা উঠোনে। ন-দাদু দোনলা বন্দুকটা পরিষ্কার করছে।

''আমায় একবার দাও না দাদু।''

''না ভাই ট্রিগারে হাত পড়লে গুলি চলে যাবে।''

''এটা দিয়ে কী হয়?''

''ডাকাত পড়ে তাই।'

''ভাই ঝিল এতদিন বাদে এলে।''

''আলুসেদ্ধ মেখেছি।'' '

''এই নাও, দুটো তিলের নাড়ু।''

ছোটোঠাম্মার পান মুখে লাল ঠোঁট, লাল টিপ, লাল পাড় শাড়ি। এগাছ ও গাছ বাগান ঝিল দৌড়ে বেড়াচ্ছে। চু কিত কিত ডুব ডুব ডুব সাঁতার ঝিল দৌড়চ্ছে। বৃষ্টি মাখা দুপুরে দৌড়তে দৌড়তে ঝিল বর্ষা হয়ে যাচ্ছে আর বর্ষা মার পাশে শুয়ে অজানা অদেখা সেই গ্রামের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছবি : মৌসুমী

তিতলি আর গাবলু

আইভি চ্যাটার্জি

নভেম্বরের শুরু থেকেই এবারে খুব ঠান্ডা পড়েছে। তিতলির মর্নিং স্কুলের সময়টাও এক ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে। এখন সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরোলেই হয়। তবু মা ছ'টা বাজলেই উঠিয়ে দেবে। 'ওঠ তিতলি', 'এবার উঠে পড় তিতলি', 'এবার কিন্তু ভ্যান চলে যাবে'-- বারবার এসে বলতেই থাকে। তিতলি তখন আরো জোরে লেপ জড়িয়ে কানে চাপা দেয়।

এই নিয়ে রোজ সকাল সকাল মায়ের সঙ্গে হট্টগোল। সকালে লেপ ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না। লেপের মধ্যের ঘুমটা যে কি আরামের, মা একেবারে বুঝতে চায় না । তারপর বাবা এসে কোলে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুম তাড়িয়ে দেয়।

এই বাবার কোলে চেপে সারা বাড়িটা ঘোরাটা যে কি আরামের আর মজার! দেয়ালের টিকটিকিটা কত কাছে চলে আসে , আলমারির মাথায় হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফেলা যায়, দরজার ওপরের ঘন্টাগুলো নাড়িয়ে নাড়িয়ে টুংটাং বাজনা শোনা যায়।

তারপর ব্যালকনির রোদ্দুরে। সূর্যের আলোয় চারিদিকটা ঝকঝক করে।ব্যালকনি বাগানের গাছগুলো তিতলিকে দেখলে মাথা নাড়ে, আর তিতলি তখন গাছেদের 'গুডমর্নিং' বলে।

তখন বাবা দেখায়, ''দেখেছিস তো তিতলি, গাছেরা সেই ভোরবেলা উঠে পড়েছে। ঐ ছোট ছোট পাখিগুলো সেই ভোর থেকে কত কাজ করছে।''

সেই দেখে তিতলির ঘুম একছুটে পালিয়ে যায়। স্কুলে যাবার কাজটা মনে পড়ে যায়। দৌড়ে দৌড়ে সব কাজ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। স্কুলে যাবার আগে রোজ দুধ খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে একটু ঝামেলা হয়, কিন্তু তাছাড়া সব কাজ ঠিকঠাক করে নেয় তিতলি।তারপর ভ্যানে বসে প্রিয়া, ঋজুরা যখন ঘুমোয়, তিতলি তখন জানলা দিয়ে আকাশ দেখে, সবুজ মাঠ দেখে। কি ভালো যে লাগে!

শীতের সকালটা ভারি সুন্দর। কদমা-সোনারি লিঙ্করোডের মাঝ-বরাবর সারি দিয়ে সবুজ সবুজ লম্বা লম্বা গাছ। তার মাঝখান দিয়ে জগার্স লেন। মর্নিং ওয়াকে আসা লোকজনরা সেখানে হাঁটে, দৌড়োয়। তিতলি ভ্যান থেকে হাত নেড়ে দেয়। অচেনা লোকজন হাসিমুখে হাত নাড়ে। সকালবেলাটায় সব্বার মন ভালো থাকে যে! আর সেই ফাঁকে রোজই দুটো গাছের ভেতর একটা কাঠবেড়ালির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। গাছগুলোর নাম সোনাঝুরি, বাবা বলেছে। পাশাপাশি দুটো সোনাঝুরি গাছ, মাঝখান থেকে রোজ মুখ বের করে হাসে কাঠবেড়ালিটা। একদিন ঋজুও দেখেছে।

আর একটু এগোলেই লেক। তিনদিন ধরে দেখছে তিতলি, লেক-এ দুটো নতুন পাখি এসেছে। একদিন বাবাকে নিয়ে এসে দেখাতে হবে। এই শীতের সময় রোজ সকালে লেকের জলে পাখির মেলা। কি মজা পাখিদের! সারাদিন আকাশ, হাওয়া আর পালক দুলিয়ে নাচ। লেকের সবুজ জলে সারাদিন খেলে বেড়ানো। বাবার কাছে কত পাখির নাম জেনেছে তিতলি। টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া, চড়াই, মুনিয়া, পায়রা, বুলবুল, বাবুই। ঠাম্মাবাড়ি গেলে সব পাখি দেখা যায়।

এখানে শীতের সময় নতুন নতুন পাখি আসে। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার--সেইসঙ্গে লাল নীল বদ্রি পাখি, সাদা কাকাতুয়া, পেলিক্যানের সঙ্গে সঙ্গে বুনোহাঁস --- সেই সঙ্গে কত ছাতারে, বউ কথা কও, চড়াই, পায়রা। সারাদিন পাখির মেলা। লেকের ধারে গাছগুলো, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, জাকারান্ডা, পলাশ, শিমূল---এই সময়টায় ফুল-পাতা ঝরিয়ে ন্যাড়া হয়ে আছে। তাদের গায়ে এখন লাল নীল সবুজ মেরুন সাদা কালো পালকের ভিড়। কি যে সুন্দর!

ক'দিন হল ড্রাইভার আঙ্কেল আসছে না। ছুটি নিয়ে গাঁও গেছে। বাবার সঙ্গে স্কুল যাচ্ছে তিতলি। বাবার সঙ্গে যাওয়াটা দারুণ মজার। রোজ লেকের ধারে এসে বাবা তিতলিকে নিয়ে নেমে পড়ে। দুজন মিলে পাখি দেখে। বাবা একদিন দুধরাজ পাখি দেখাল। স্যাফরন রঙের গা। কি সুন্দর!

লেকের জায়গাটা পার হয়ে চকচকে কালো রাস্তা। আর সবুজ নেই। সকালের এই সময়টায় গাড়ির মেলা। সাদা, কালো, লাল, নীল গাড়ি। গাড়ির জানলায় জানলায় তিতলির মতই আরো সবাই।

বাবা বলে, পাখিদের খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে নেই। পাখি হল খোলা আকাশের জন্যে। স্কুলভ্যানের বাচ্চাদের দেখলে বাবার নাকি খাঁচার পাখির কথা মনে পড়ে। বাবা যে কী কী বলে, তিতলি সব বুঝতে পারে না।

বড় রাস্তায় এসে আর পাখি নেই। শুধুই গাড়ি, স্কুলভ্যান, স্কুলবাস, স্কুটার, মোটারবাইক, সাইকেল। ভালো লাগে না। তখন আকাশ দেখে তিতলি।

এইসময় আকাশে কেমন একটা সবুজ সবুজ আলো। দুপুরে ফেরার সময় সবুজ আলোটা দেখা যায় না। এক একদিন ঐ সময় আকাশে লাল লাল একটা আলো দেখেছে তিতলি।আজও আকাশ দেখছিল, এমন সময় বাবা ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল।

রাস্তার ধার ঘেঁষে যত কুকুর। খুব হল্লা করছে, আর এত ভিড় করেছে যে প্রায় রাস্তার আধখানা ভরে গেছে। সামনে গাড়ির লাইন, পেছন থেকে গাড়ির হর্ন। জোরে হর্ন বাজিয়ে, কুকুরের ভিড়টার পাশ কাটিয়ে সারি দিয়ে গাড়ি চলতে লাগল। কুকুরগুলো তখন আরো জোরে জোরে চিৎ কার করছে। আর এইসব নানান আওয়াজে সকালবেলার আকাশটা চমকে চমকে উঠতে লাগল।

বাবা বলল, ''দাঁড়া, দেখে আসি। কি নিয়ে এত হল্লা করছে কুকুরগুলো।''

বাবা এগিয়ে যেতেই কুকুরগুলো চিৎকার থামিয়ে চুপ করে গেল, কেমন সরে রাস্তা করে দিল। বাবা কী যেন দেখল ঝুঁকে পড়ে, তারপর আবার ফিরে এসে বলল, ''চট্ করে একটা বড় কাগজ দে তো।''

''কী আছে ওখানে বাবা?'' তিতলিরও নেমে পড়তে ইচ্ছে করছে।

''তুই নামিস না। আমি আসছি।''

বড় কাগজটা নিয়ে চলে গেল বাবা। আর কী একটা যেন মাটি থেকে তুলে নিয়ে আসতে লাগল। কুকুরগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। বাবাকে দেখে আরো দু'তিনটে গাড়ি থেমেছে, কেউ কেউ নেমেও পড়েছে, ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখছে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল বাবা।

''এইটা ধরে বসতে পারবি তো?''

''কী এটা, বাবা? কি একটা নড়ছে।''

''ওটা কচ্ছপ। বাচ্চা একেবারে।''

''কচ্ছপ? টরটয়েজ?'' তিতলি তো অবাক।

''হ্যাঁ রে। কোথা থেকে এল কে জানে। রাত্তিরবেলা শেয়ালে এনে ফেলেছে বোধ হয়। আর একটু এগোলেই তো পাহাড়।''

''বাবা, প্লিজ বাবা, আমি আজ স্কুলে যাব না। একে নিয়ে তুমি কী করবে, আমি দেখবো। প্লিজ বাবা।''

''না সোনা। ও'রকম মিছিমিছি স্কুল কামাই করতে নেই। এই তো দুপুরবেলা বাড়ি চলে আসবে তুমি। ততক্ষণে ও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠুক।''

বাবা 'তুমি' করে কথা বলেছে মানেই আর জোর করা যাবে না। স্কুলও এসে পড়েছে। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে নামতেই হল।

''উঁহু, মন খারাপ নয় একদম। এর মধ্যে তুই বরং ওর একটা নাম ভেবে রাখ তিতলি। ও বোধহয় ভয় পেয়েছে। কেমন চুপ করে গুটিয়ে রয়েছে দেখছিস না? লেগেছেও বোধ হয়। একা একা তো আর এতদূর আসেনি। নিশ্চয় শিয়াল টিয়াল কিছু মুখে করে এনেছে। তারপর কুকুরগুলো এসে পড়ায় আর খেতে পারেনি।''

ইস্‌স্‌। ঐটুকু বেচারা কচ্ছপ। ওকে যদি খেয়ে নিত শিয়াল!

''ভাগ্যিস কুকুরগুলো ওকে পাহারা দিল। না বাবা?''

''সেই তো। কুকুরগুলো কিন্তু ওকে খেয়ে নেয়নি। আহত একটা প্রাণীকে ওরা মারতে পারেনি। মানুষ যদি এই শিক্ষাটা নিত!'' বলতে বলতে বাবা একটা কাপড় পেতে ছোট্ট কচ্ছপকে রাখল সাবধানে।

তিতলিও আলতো করে খোলে হাত বুলিয়ে দিল। আহা রে, কত লেগেছে কে জানে।

স্কুলে গিয়ে সারাদিন পড়ায় মনই বসল না। শ্রাবণীকে বলল। শিল্পা আর প্রিয়াঙ্কাকেও। শিল্পার বাড়িতে একটা পুড্‌ল্‌ আছে। সাদা। অস্কার নাম। কিন্তু শ্রাবণী আর প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে নিয়ম, কোন জন্তুজানোয়ার পোষা চলবে না। তিতলির বাড়ির হরেক রকম পুষ্যির গল্প শুনে ওরা একটু একটু হিংসেও করে।

ভ্যান আসছে না, বাবা-ই নিতে এল সেদিন।

''কেমন আছে ও?'' প্রথমেই জিজ্ঞেস করল তিতলি।

''ভালো আছে। নড়াচড়া করছে। কিন্তু কিছু খায় নি। কী খাবে বুঝতে পারছি না। এমনিতে তো কচ্ছপ হার্বিভোর। শাকাহারী জন্তু। ফুল,পাতা, ছোট ফল সব খায়। কিন্তু এ এত ছোট, বোধহয় খেতেই শেখেনি। এরা কিন্তু রেপটাইল, জানিস তো তিতলি?'

রেপটাইল, সরীসৃপজাতীয় প্রাণী। জানে তিতলি। জেনারেল নলেজে পড়েছে।

আরো অনেক কথা বলল বাবা। ''ঐ যে মোটা খোল, কাঠের মত শক্ত, ওটাকে ক্যারাপেস বলে। ওর গায়ের ওপরের ঘোরানো লাইন বা রিং দেখে ওদের বয়স বলা যায়। নানা ধরণের কচ্ছপ আছে। ফ্রেশ ওয়াটার আর সমুদ্রের নোনা জল, দু'জায়গায়তেই থাকে এরা। আবার ছোট ছোট গর্ত করে মাটির নিচেও থাকে। এমনকি মরুভূমির মধ্যেও থাকতে পারে। ফুল পাতা ছাড়াও ছোট ছোট পোকাও খায়।''

ফেরার সময় সারা রাস্তাটা এই নিয়েই কেটে গেল। আজ লেকের ধারেও নামেনি। পাখিগুলোকে দূর থেকে হাত নেড়ে দিল।বাড়ি এসে দেখল, মা ওকে অ্যাকোয়ারিয়ামে ছেড়ে দিয়েছে। সোনা আর রূপা, গোল্ডফিশ দুজন আজ চুপচাপ। জিনি আর রিনি, ব্ল্যাকফিশ দুটো কিন্তু বেশ ভাব করে নিয়েছে গাবলুর সঙ্গে। সাঁতার কেটে কেটে বেড়াচ্ছে গাবলু। হ্যাঁ, ওর নাম গাবলুই থাক। যা গাবলু, আর মিষ্টি!
''তোমাদের গাবলু কিছু খায়নি কিন্তু ,'' মা বলে দিল।

মায়ের এই অভ্যেস। খালি খাওয়া আর খাওয়া। একটা নতুন জায়গায় এসেছে,আগে তো সবাইকে চেনাজানা করবে!

''আমি খাওয়াবো।একটু পরে,'' তিতলি বলে দিল।

বাবা তিতলিকে নামিয়ে দিয়েই অফিস চলে গেছে। খানিক বাদে তিতলি বাবাকেই ফোন করল।
''ওকে মুড়ি দিই, বাবা?''

''ভালো ভেবেছিস তো। দে, দিয়ে দ্যাখ। যদি খায়।''

ক'দিনের মধ্যে মুড়ি খেতে শিখে গেল গাবলু। মায়ের রান্নাঘর থেকে শাকপাতা এনে খাওয়াতে গিয়ে তিতলি দেখল, গাবলুর লেটুসপাতা খুব পছন্দ। স্কুলে যাবার আগে গাবলুকে লেটুস খাওয়ানো তিতলির কাজ
এখন। আর সকালে ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে বাড়িতে হট্টগোল নেই।

এক বছর হল। গাবলু এখন বেশ বড় হয়েছে। আর অ্যাকোয়ারিয়ামে আঁটে না। ব্যালকনি বাগানের মধ্যে একটা বড় প্ল্যাস্টিকের গামলায় থাকে। মাঝে মাঝেই টুকটাক করে সারা বাড়ি হেঁটে বেড়ায়। এর মধ্যে একদিন এক কান্ড। সদর দরজা খোলা ছিল। কোন ফাঁকে গাবলু বেরিয়ে সিঁড়ি

দিয়ে উঠে ছাদের কাছে চলে গেছে। ভাগ্যিস টুসুমাসি ছাদে কাপড় মেলতে গেছিল। নইলে ছাদের ওপর গেলে আর রক্ষে ছিল না। দুটো হুলোবেড়াল আছে। আকাশের চিল আছে।

সেদিন ফিরিয়ে আনবার পর, কোলে বসিয়ে গাবলুকে এই সব বুঝিয়ে দিয়েছিল তিতলি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। আর একদিন ওইরকম একা একা ব্যালকনির রেলিঙে চড়তে গিয়ে তিনতলা থেকে একেবারে নিচে পড়ে গেল। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ক্যারাপেস-এর মধ্যে ঢুকে গেছিল। তিতলি একছুটে নিচে গিয়ে তুলে নিয়ে এল।

দেখেশুনে মা বলল, ''এরকম চললে গাবলু কিন্তু একদিনে বিপদে পড়বে। আহা রে, ওর কি আর এমন বন্ধ বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে! ও তো বেরোবেই। ও তো জানে না, বাইরে কত বিপদ।''

বাবা বলল, ''ওকে ওর জায়গায় দিয়ে আসাই ভালো। প্রাণটা তো বাঁচবে। কী বলিস তিতলি?''

তিতলি তো কেঁদেকেটে একশা। গাবলুকে ছেড়ে থাকবে কী করে। আজকাল কত বাধ্য হয়েছে গাবলু। সারা সন্ধ্যে হোমওয়ার্কের সময় চুপটি করে বসে থাকে। 'ক্রেজি কিয়া রে' গানটা বাজলেই মাথা দুলিয়ে দোল দেয়। তিতলির সঙ্গে খেলা করে। মাছের কাঁটা বেছে দিলে খেয়ে নেয়। চায়ে ভিজিয়ে দিলে বিস্কুটও খেয়ে নেয় সোনামুখ করে। ও কি আর জঙ্গলে গিয়ে খেতে পারবে? ওর তো কেউ চেনা নেই ওখানে। গাবলুই কি তিতলিকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

কোলে বসিয়ে আবার তাকে সব বুঝিয়ে দিল তিতলি। দু'দিন পরে আর এক কাণ্ড। ব্যালকনি বাগানের গাছগুলোর টবের মাটিতে মাঝে মাঝে উঠে বসে থাকত গাবলু। বলা নেই, কওয়া নেই, আকাশ থেকে একটা চিল এসে তাকে তুলে নিতে গেছে। কি ভাগ্যি, মা বাড়িতে ছিল। তাই গাবলুর প্রাণ বাঁচল। কী যে করে তিতলি!

আর একদিন আর এক কান্ড। অর্ণবকাকুরা এসেছিল। বাবা-মায়ের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে গল্প করছিল।

নিজের ঘরে স্কুলের প্রোজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিল তিতলি। কোন্ ফাঁকে গাবলু গুটিগুটি পায়ে বাইরের ঘরে চলে গেছে কে জানে। গিয়ে সোফার পায়ার কাছে গুটিশুটি মেরে বসে বাবাদের গল্প শুনছে। খানিক বাদে অর্ণবকাকু উঠে দাঁড়িয়েছেন, আর তাঁর জুতোর নিচে গাবলু। ভাগ্যিস, সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছিলেন কাকু। বাবা তবু গাবলুর গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল।

তিতলিও বুঝতে পারছে, গাবলুকে নিরাপদে রাখার জন্যেই ওকে জঙ্গলের ধারে নদীতে ছেড়ে আসতে হবে। কিন্তু ভাবতে গেলেই কান্না পায়। কী করে থাকবে গাবলু? একা একা? কে দেখবে ওকে? কে খাইয়ে দেবে? সেই ছোট্টবেলায় এসেছে, ওর তো জঙ্গলের কথা মনেই নেই।

বাবা বলল, ''এক কাজ করি চল্। ওকে নদীর ধারে নিয়ে যাই। ওর যদি যেতে ইচ্ছে না হয়, ও যদি না যায়, তাহলে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। সেক্ষেত্রে একটা বড় খাঁচার বন্দোবস্ত করতে হবে।''

মা বলল, ''ওকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে এসো বরং। ওখানে ও ভালো থাকবে। ওরা ঠিকঠাক খেতে দেবে। যত্ন করবে। আমরাও ওকে দেখে আসতে পারব মাঝে মাঝে।''

মায়ের আইডিয়াটাই পছন্দ হল তিতলির।

সেইমতো একদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে গিয়ে চিড়িয়াখানায় দিয়ে এল গাবলুকে।

অনেক আদর করে বুঝিয়ে নিয়ে গেছিল, তবু ভাবনা ছিলই, কে জানে গাবলুর কষ্ট হবে কিনা। গাবলু যদি ভাবে, তিতলি ওকে দূরে রেখে দিল কেন? গাবলু যে তিতলির বন্ধু।

ওমা, কিছুই না। গুটগুট করে জলে নেমে গেল গাবলু। আবার জল থেকে উঠে এসে জালের ধার দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসেও গেল। মানে, এই জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে। খোলা আকাশ, চারদিকে সবুজ, মাঝখানে জল। তাতে আরো দুটো বড় কচ্ছপ। চিড়িয়াখানার ভদ্রলোক বললেন, আরও তিনটে কচ্ছপ আছে নাকি। ভেতরের বাঁধানো বেদীটার তলায় ঘুমোচ্ছে।

সেই থেকে গাবলু চিড়িয়াখানায় আছে। ভালোই আছে।ওখানে ওর 'গাবলু' নামটাই রাখা আছে। মাঝে মাঝেই তিতলি ওর সঙ্গে দেখা করে আসে। এখন বেশ বড় হয়েছে গাবলু। তিতলিও।

স্কুল শেষ করে তিতলি এখন ব্যাঙ্গালোরে পড়তে গেছে। ছুটিতে বাড়ি এসেও গাবলুর সঙ্গে দেখা করে আসে। বিশাল পিঠ নিয়ে টুকটুক করে এসে জালের ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তিতলির হাত থেকে লেটুস পাতা খায়। হাতের পাতা চেটে দেয়। তিতলিও ওর গায়ে আলতো হাত বোলায়, সেই প্রথমদিনের মতো।

দূরে থাকলেও বন্ধুত্বটা থেকেই গেছে।

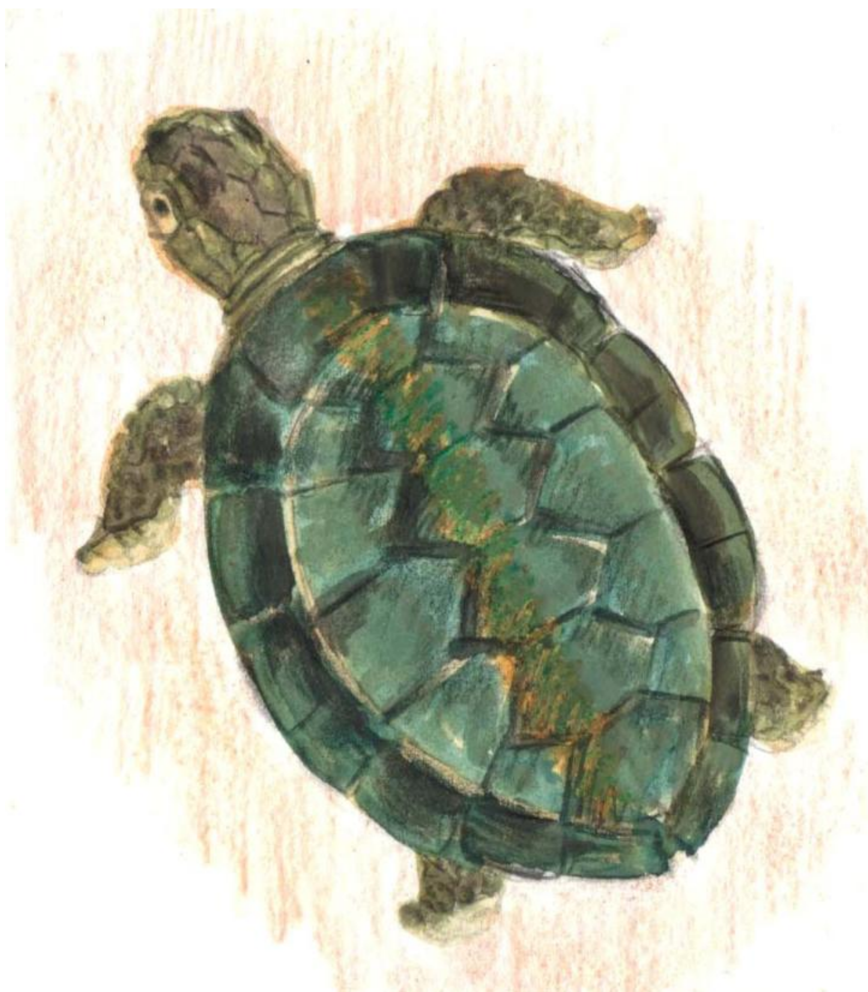

ছবি : মৌসুমী

উইলিয়াম মিডোজ টেইলরের অমর কাহিনী কনফেশনস্‌ অব আ ঠাগ অবলম্বনে

আমাদের টাইম মেশিন গিয়ে নেমেছে ঊনিশ শতকের মধ্যভারতে ঠগীদের পাড়ায়। ঠগীসম্রাট আমীর খানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলেছি কেমন করে সে ঠগী হয়ে উঠলো তাই দেখতে দেখতে। সে যখন খুব ছোট তখন তার বাবা মাকে মেরে ইসমাইল নামের এক ঠগী তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মানুষ করল। ইসমাইলের বউ মিরিয়ামকে মা বলে জানল আমীর। মিরিয়ামের মৃত্যুর পর তারা চলে এল অন্য শহরে। সেখানে আমীর দেখত বাইরের জগতে কাপড় ব্যবসায়ী বলে পরিচিত ইসমাইলের কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে রহস্যময় লোকেরা আসে। একদিন তারা যখন এলো তখন আমীর গিয়ে লুকিয়ে রইল তাদের কাছাকাছি। তারপর-----

সবাই মিলে একত্র হয়ে খাওয়াদাওয়া হল প্রথমে। তারপর সবাই একসঙ্গে গোল হয়ে বসে কি একটা ভাষায় কথা বলতে শুরু করল, তার অর্ধেক শব্দের মানে আমি বুঝতে পারছিলাম না। ব্যাপারটা অদ্ভুত। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে ততদিনে আমি সে এলাকার বুলি ভালোই শিখে নিয়েছি, কিন্তু এই ভাষাটা ঠিক সেই স্থানীয় বুলিও নয়! খানিক বাদে, ঠিক যেখানটাতে আমি লুকিয়ে ছিলাম তার একেবারে পাশে এসে একটা আলমারির পাল্লা খুলে ইসমাইল তার থেকে একটা ভারী বাক্স বের করে নিয়ে সবার মাঝখানে রাখল। তারপর তার ডালাটা খুলতেই একেবারে চোখ ঝলসে গেল আমার। ভেতরে সোনাদানা, মণিমাণিক্য একেবারে বোঝাই। ইসমাইল এবারে নিজের জন্য একটা বড় অংশ সরিয়ে রেখে বাকি ধনরত্নগুলো সবার মধ্যে সমান করে ভাগ করে দিলো।

ভাগবাঁটোয়ারা শেষ হতে সবাই ফের স্বাভাবিক হিন্দিতে কথা বলতে শুরু করল। বয়স্ক চেহারার একজন মানুষ ইসমাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আমীরকে নিয়ে কী করবে ভাবছ? বড় তো হল। এবারে কাজেকর্মে লাগানো শুরু করো! দলে তাড়াতাড়ি না ভেড়ালে পরে কখন কি টের পেয়ে বাড়ি ছেড়ে ভাগবে, তখন মুশকিল হবে দেখো।'

ইসমাইল হেসে বলল, ''সে নিয়ে ভেবোনা। ছেলেটা আমায় ভালোবাসে খুব। তাছাড়া দুনিয়ায় আমি বাদে ওর আর আছেটা কে যে তার কাছে পালিয়ে যাবে! ওর বাবা ছিল-----'' এই অবধি বলেই ইসমাইল আবার সেই দুর্বোধ্য বুলিতে কথা বলতে শুরু করে দিল।

খানিক বাদে মুখ খুলল হুসেন নামের একজন লোক। তাকে আমি বেশ ভালোই চিনতাম। সে ছিলো ইসমাইলের কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। সে সাধারণ হিন্দিতে বলছিল, ''----ওতে কোন অসুবিধে হবে না। কথাটা হল যত তাড়াতাড়ি গুড় খাবে, তত বেশি তার মজা পাবে। আমি নিজেও তো এ'রকম একটা ছেলেকে পুষেছিলাম। সে যখন কাজে হাত দিল তখন এক্কেবারে বাঘ। বাঘা বাঘা ওস্তাদরাও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না।''

ইসমাইল এবারে মুখ খুলল। বলে, '' কথাটা ঠিকই বলেছো। এ ছেলের ভবিষ্যতও উজজ্বল। বয়েসের তুলনায় সাহস আর শক্তি দুটোই বেশি। আমি নিজের হাতে ওকে কুস্তি শিখিয়েছি। এই বয়েসেই কুস্তিতে ওর সঙ্গে এ মহল্লার বেশি লোক পাল্লা দিতে পারে না। তবে কথাটা কি জানো, ছেলেটার এত দয়ার শরীর আর এত শান্তশিষ্ট যে ওর কাছে কথাটা ভাঙব কীভাবে সেটাই বুঝতে পারছি না।''

কথাটার জবাব দিলেন যিনি তিনি আমার একেবারেই অচেনা। বলেন, ''দুর দুর, ছাড়ো তো ইসমাইল। ওইসব লক্ষ্মী ছেলেগুলোই বেশি বশ মানে, আর কাজেরও হয়। ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে বুঝিয়ে বলো, ব্যবসাটা যে কী সম্মানের সেটা বোঝাও! পেশায় মা ভবানীর সেবা আর ধর্মে মুসলমান হওয়ায় মরার পরে, হিন্দুর স্বর্গ আর মুসলমানের জন্নত এই দু-ই যে আমাদের বাঁধা সে কথাও ভালো করে শোনাও।''

শুনে ইসমাইল বলল, ''এই একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছো। ছেলেটা ফাঁক পেলেই তো মৌলবি সাহেবের কাছে গিয়ে বসে থাকে দেখি। সে বুড়ো নিশ্চয় মাথাটা এতদিনে বেহস্তের হুরিপরীদের গল্প দিয়ে বোঝাই করে দিয়েছে! এই স্বর্গটর্গের লোভ দেখিয়ে কাজ হবে বোধ হচ্ছে।''

হুসেন হাসতে হাসতে বলে, ''তাহলে তাড়াতাড়ি করুন কর্তা। শিক্ষানবিশদের প্রথম চেষ্টাটা দেখতে বড় মজা পাই আমি। হাতে প্রথম রুমাল ধরে এমন বাচ্চাদের মত হাবভাব করে যে--''

ওমনি সেই বুড়ো মানুষটি তাকে ধমকে উঠে বলে''চুপ! ছেলেটা যদি এই মুহূর্তে আমাদের কথাগুলো শোনে আর তারপর কেউ কিছু বোঝবার আগেই পালায়--''

'' আরে না, না। সে'সব ভয় একেবারেই নেই। তা রাত তো অনেক হল। কাল আবার লম্বা সফর রয়েছে। তোমরা তবে এবারে---'' বলতে বলতে ইসমাইল উঠে দাঁড়ালো। সভা শেষ হয়েছে।

আমার তো তখন কৌতুহল আর বাগ মানছে না। এই ইসমাইল আর তার বন্ধুরা আসলে কারা? কোন গুপ্তবিদ্যা আমায় শেখাবে তারা? কে আমার আসল বাবা মা?

কিন্তু সেই সময়ে হাজার চেষ্টা করেও মিরিয়ামের মুখটা ছাড়া তার চেয়ে পুরোন কোন কিছু আমার মনে পড়ত না। সেইসব কথা আমার মনে পড়েছিল অনেক পরে।

ইসমাইল ঠিকই বলেছিল। মৌলবিসাহেবের কাছে গল্প শুনে শুনে আমার তখন বেহেস্তের হুরিপরীদের কথা মুখস্ত। রোজ তাদের স্বপ্ন দেখি। সেদিন সন্ধেয় যখন বুঝলাম, ইসমাইল আর তার দলবলও যে কাজ করে তার পুরস্কার সাক্ষাত সেই বেহেস্ত, তখন তাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্য আমার আর তর সইছিল না। সাধারণ কাপড়ের ব্যবসায়ী সে নয়। ও কাজে অত স্বর্গ টর্গ জোটে না।

সে রাতে আমার চোখে ঘুম এল না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ইসমাইল বাড়িতে নেই। আমিও বাড়ি থেকে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মৌলবিসাহেবের ওখানে গিয়ে উঠলাম। আমায় দেখে তিনি বলেন, ''কী রে? শরীর খারাপ?''

বললাম, 'না।' তারপর পড়াশোনা সারা হলে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, বলো তো, বড় হয়ে আমি কী হলে সবচেয়ে ভালো হয়?''

'' মৌলবি হয়ো বাবা। অনেক পড়াশোনা করতে হবে তার জন্য। কিন্তু ভগবানের চোখে ওর থেকে ভালো পেশা আর কিছু হয় না এটা জানবে। আমি তোমায় একটুআধটু আরবি শিখিয়ে দেবো, তারপর তোমার বাবাকে বোলো, তিনি তোমায় দিল্লি পাঠিয়ে দেবেন বাকি পড়াশোনাটার জন্য।''

আমি মাথা নাড়লাম। কিন্তু ওঁর কথাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। ভগবানের প্রিয় পাত্রই যদি হবেন তাহলে মৌলবি সাহেব এত গরিব কেন? ইসমাইলের কত টাকা। সে তো মৌলবি নয়! আমি ইসমাইলের মতই হব বড় হয়ে। অতএব পরদিন থেকে আমি মৌলবিসাহেবের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। কপালের লিখন সাহেব। নইলে মৌলবি হলে আজ আমার এই দশা হতো?

যাক সে কথা। গল্পটা বলি বরং। মাসখানেক পরে ইসমাইল ফিরে এলো। সঙ্গে হুসেন। নানা দ্বিধায় দুলে দুলে তখন আমার দশা বেশ খারাপ। এর মধ্যে কয়েকবার ভেবেছি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। দু একটা জামাকাপড় আর সামান্য টাকাপয়সা নিয়ে তৈরিও হয়ে পড়েছি। কিন্তু তারপর বেরোবার সময় হলে আর ক্ষমতায় কুলোয় নি।

আবার কখনো ভেবেছি বাবার সঙ্গে--হ্যাঁ, এর পর থেকে ইসমাইলকে আমি ওই নামেই ডাকবো--- কাজ করবো, তাঁর দেখানো পথে। কিন্তু কোনটা যে করা ঠিক হবে সে কথা ভেবে ভেবে কুল পাচ্ছিলাম না আমি।

এবারে বাবা ফেরবার পর আমি তাঁকে চোখে চোখে রাখতে শুরু করলাম। দু একবার ভাবলাম গিয়ে আমার সব কৌতুহলগুলো খোলাখুলি জানিয়ে দিই, কিন্তু সাহসে কুলোল না।

এমনিভাবে বেশ কয়েক দিন কাটবার পরে একদিন সন্ধেবেলা বাবা আমায় তার শোবার ঘরে ডেকে পাঠালো। সে ঘরে আমার ঢোকবার অনুমতি ছিল না আগে। বুকে একটা কাঁপুনি নিয়ে আমি বাবার ঘরে গেলাম।

গিয়ে দেখি বাবাও একটু অস্থির হয়ে আছে। আমায় ইশারায় বসতে বলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ঘরের ভেতর শুধু একটা ছোট্ট প্রদীপ জ্বলছিল। ভয় ভয় লাগছিল আমার। খানিক বাদে আমার কী যে হয়ে গেল, বাবার কাছে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। অমনি বাবা ব্যস্ত হয়ে বলে, ''কী হল? কাঁদছিস কেন রে? এই দ্যাখো কি মুশকিল। তোর মা-ও নেই-- আমি কী যে করি?''

আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে সেই সেদিনের সন্ধেবেলার সব কথা বাবাকে বলে দিয়ে বললাম, ''লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের কথা শুনে আমি অন্যায় করেছি বাবা। তারপর থেকে আমার কী যে হয়েছে জানি না। আমি আর ছোট নেই বাবা। তোমার যে কাজে আমায় উপযুক্ত মনে হয় সেই কাজে আমায় লাগাও। একবার শুধু দেখ পরীক্ষা করে, আমি ঠিক পারবো।''

খানিক চুপ করে থেকে বাবা বললো, ''আমি তোমায় যতটা জানাবো বলে ভেবে রেখেছিলাম, তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে ফেলেছো। আমার সামনে তাহলে আর কোন রাস্তা খোলা রইল না বাবা আমীর। এবারে তোমাকে---

ক্রমশ

ছবি : মৌসুমী

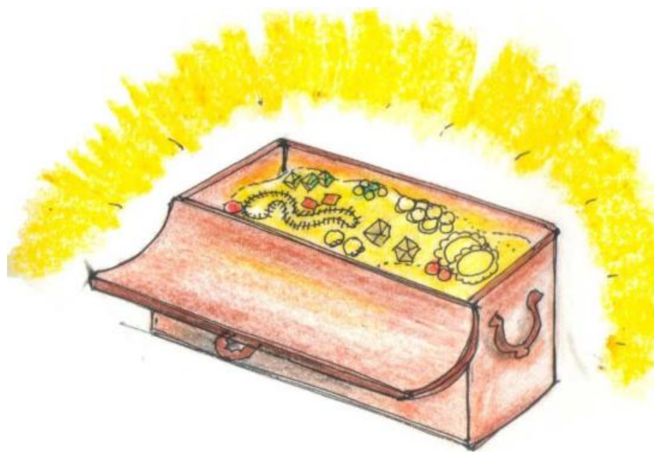

কিপ্টে যাদব

আমাদের পাড়ার যাদববাবুর কিপ্টে হিসেবে বেশ নাম ছিল। সমপ্রতি তিনি স্বর্গে গেছেন। তাই আজ জয়ঢাকের পাতায় আমরা তাঁর স্মৃতিচারণ করব।

শুরু করি তাঁর মৃত্যুদিনের কথা বলে। মে মাসের দুপুরবেলা। যাদববাবুর শ্বাস উঠেছে। বাড়িতে কান্নাকাটি চলছে। শোয়ার ঘরে তাঁর বিছানা ঘিরে বাড়ির সবাই বসে আছেন। হঠাৎ চোখে খুলে যাদববাবু এদিক ওদিকে ঘুরে দেখলেন, তারপর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ''ওগো, আমার সব ছেলেমেয়েরা, বৌমা, জামাইরা, নাতিনাতনীরা এই ঘরে আছে তো?''

চোখের জলে ভেসে স্ত্রী বললেন, ''কিছু ভেবো না। সবাই তোমায় ঘিরে আছে।''

''তাহলে ও ঘরে ফ্যানটা চলছে কেন? এইভাবে কারেন্ট খরচ করলে কত পয়সা----'' এই অবধি বলে যাদববাবু ঢলে পড়লেন।

তবে এতে আমরা বিশেষ আশ্চর্য হইনি। যাদববাবুর এমন বহু কীর্তিকলাপ আমরা দেখেছি কিনা! পরদিন সকালে বাজারে গিয়ে রাধেশ্যামের ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। তা রাধেশ্যাম আর একটা ঘটনার কথা বলল। মাসখানেক আগে যাদববাবু নাকি একবার তার দোকানে এসে বলেন, ''কলা কত করে রে রাধেশ্যাম?''

''আজ্ঞে চব্বিশ টাকা ডজন।''

''বারোটাকায় দিবি?''

রাধেশ্যাম রেগে উঠে বলল, ''বারো টাকায় এক ডজন খোসা হবে জ্যাঠা।''

উনি সঙ্গে সঙ্গে বারোটা টাকা বের করে দিয়ে বলেন, ''বারো টাকার খোসা তুই রাখ, খোসা ছাড়ানো কলাগুলো আমায় দে।'' তারপর নাকি চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে খোসা ছাড়ানো কলা একটা প্লাস্টিকের ঝোলায় করে হাসতে হাসতে বাড়ি গিয়েছিলেন যাদববাবু।

আর একবার হয়েছে কি, যাদববাবু বাথরুমে আছাড় খেয়েছেন। তখন সন্ধেবেলা। আছাড় খেয়েই বুঝেছেন, ভালো চোট লেগেছে। হাসপাতালে যেতে হবে। অতএব রাত্রে বাড়িতে খাওয়া হবে না। যাদববাবুর স্ত্রী রান্নাঘরে তখন রুটি বেলছিলেন। শব্দ শুনে দৌড়ে এসে বলেন,''ওগো কী হল?''

যাদববাবু কাতরাতে কাতরাতে বলেন, ''যে আটা মেখেছো তার থেকে চারটে গুলির পরিমাণ আটা আগে ফ্রিজে তুলে রাখো। তারপর এসো , বলছি কী হয়েছে।''

তবে যাদববাবু একবার কিন্তু তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছিলেন। আমাদের পাড়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী রতনবাবুর একবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো। হাসপাতালে গিয়ে জানা গেল এক্ষুণি দু বোতল রক্ত না দিলে উনি বাঁচবেন না। রতনবাবুর ব্লাড গ্রুপ এবি নেগেটিভ। দুর্লভ রক্ত। শেষে কেমন করে

যেন জানা গেল যাদববাবুরও ওই গ্রুপ। অতএব তাঁকে ধরে বেঁধে এনে প্রায় জোর করেই রক্ত নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

রতনবাবু সেরে উঠে যাদববাবুকে প্রাণ বাঁচাবার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটা দামী গাড়ি উপহার দিলেন।যাদববাবু খুব খুশি। খোঁজ করে আগেই দেখেছেন ব্লাড ব্যাংকে দু বোতল রক্তের দাম মাত্র সাড়ে পাঁচশো টাকা। ওইটুকু টাকা ইনভেস্ট করে এতোটা লাভ করার কথা উনি কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নি।

এর কিছুকাল পরে আবার একদিন রতনবাবু রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে দাখিল

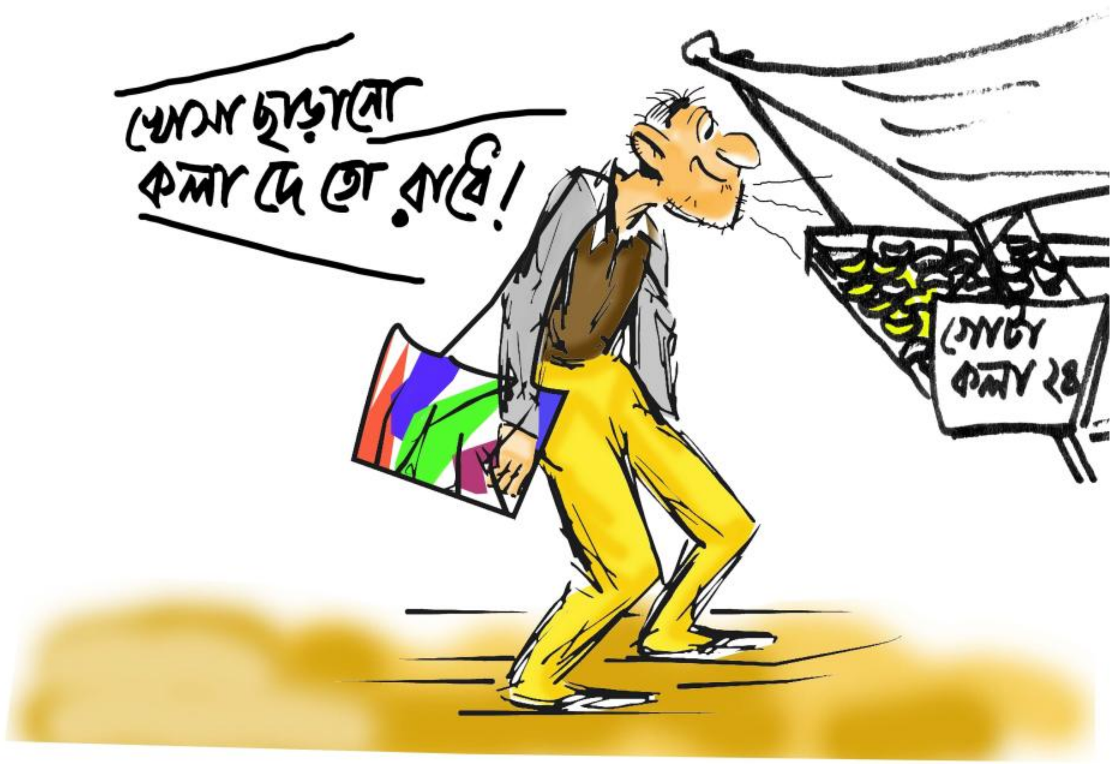

হলেন। আবার রক্ত চাই। এবারে আর ধরেবেঁধে আনতে হল না। খবর পেয়ে যাদববাবু নিজেই সেই গাড়িটায় চেপে ছুটে গেলেন হাসপাতালে। তারপর যথারীতি রক্ত দিয়ে রতনবাবুর প্রাণ বাঁচালেন। এবার সেরে উঠে রতনবাবু এক কৌটো নারকেলের নাড়ু নিয়ে যাদববাবুর বাড়িতে হাজির। কৌটোটা খুলে দেখে যাদববাবু রেগে উঠে রতনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার মশায়! আগেরবার দামী গাড়ি, আর এবার শুধু এক কৌটো নারকেলের নাড়ু? আর আমি কিনা এই নিয়ে দু-দু-বার আপনার প্রাণ বাঁচালাম!''

রতনবাবু তখন মিটি মিটি হেসে বললেন, ''আজ্ঞে কিছুদিন হল আমার শরীরে আপনার রক্ত বইছে তো, তাই-----হেঁ হেঁ----''

যাদববাবুর কিপটেমির আরেকটা পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম তাঁর ছেলের বিয়ের আগে। যাদববাবু তখন ছেলের জন্য প্রাণপণে পাত্রী খুঁজছেন এমন সময় তাঁর কাকা পটল তুললেন। কর্তব্য স্বরূপ যাদববাবু খবরের কাগজ অফিসে বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য ফোন করলেন। সেখানকার লোক বলল, ''দাদা, পঞ্চাশ টাকা পার শব্দ।''

যাদববাবু তখন বেশ হতাশ হয়েই বললেন, ''আচ্ছা লেখ, কাকার আত্মার শান্তি হোক।'' খবরের কাগজের লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, ''কিন্তু ছ'টা শব্দের কমে তো বিজ্ঞাপন ছাপা যাবে না।'' যাদববাবু তার উত্তরে ভেবেচিন্তে বলল, ''আচ্ছা লেখ, কাকার আত্মার শান্তিকামনায়, চাকুরিরতা পাত্রী চাই।''

আমাদের ক্লাবে একটা চলতি গল্প আছে যাদববাবু সম্বন্ধে। গল্পটা কতটা আক্ষরিক সত্যি তাতে সন্দেহ থাকলেও সত্যি সত্যি কখনো যদি সে'রকম কিছু ঘটে তাহলে আমরা কেউ আশ্চর্য হব না। গল্পটা এই--একবার যাদববাবুর ঘাড়ে ভূত চাপল। ওঝাকে পয়সা দেবার ভয়ে যাদববাবু ভূতের কিল হজম করে বাড়িতেই বসে রইলেন। কয়েকদিন পরে এক ওঝার বাড়িতে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হল ভূতসমেত যাদববাবু। ওঝার বাড়ি পৌঁছেই ভূত যাদববাবুর ভেতর থেকে চিৎকার করে বলল, ''ওঝাভাই! মন্ত্রটন্ত্র বলে এর ভেতর থেকে আমায় বের করো!তোমার ফিজটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। নাহলে আমি এর শরীরের ভেতর না খেতে পেয়েই মরে যাবো!''

যাদববাবুর বিষয়আশয় অনেক ছিল। সেই বিষয়আশয় কোথা থেকে এসেছিল তার একটা গল্প যাদববাবু সব জায়গায় বলে বেড়াতেন। গল্পটা এইরকম। যাদববাবু যখন কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা, তখন তাঁর হাতে এক ফোঁটাও পয়সা ছিল না। থাকার মধ্যে ছিলেন এক অন্ধ বুড়ি মা। অতএব যাদববাবু ধ্যান করতে শুরু করলেন। দিন, সপ্তাহ, মাস কাটতে কাটতে এক বছর যখন কেটে গেল তখন ভগবান তৃপ্ত হয়ে তাঁর সামনে দেখা দিয়ে বললেন, ''বৎস, তোমায় একটা বর দেব আমি। কিন্তু সেই একটাই বর পাবে। তার বেশি একটুও কিছু চাইতে পারবে না কিন্তু।'' যাদববাবু কিন্তু ভগবানের সামনেও ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন না। একটু চিন্তা ভাবনা করে বললেন, ''হে ভগবান, আপনার কাছে আমি বর চাইছি যাতে আমার মা আমাদের নতুন প্রাসাদে বসে নিজের চোখে আমার বৌকে তার ছেলেমেয়েদের হাতে সোনা ও হিরের বালা পরাতে দেখতে পারে।'' ভগবান তথাস্তু বলে বরটা দিতে দিতে গজ গজ করে বলল ''এই লোকটাকে একটু বেশিই বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছি। কাজটা দেখছি উচিৎ হয়নি।'' কিন্তু তখন সে কথা বলে তো কোন লাভ নেই। অতএব আমাদের যাদববাবুর ক্রমে অনেক টাকাপয়সা হল। কিন্তু ভগবান হাতটা দরাজ না করে তাকে বানিয়ে দিলেন হাড়কিপ্টে। কিন্তু এই কিপটেমোর কল্যানেই তো এত মজার গল্প শোনা যাচ্ছে। অতএব আমরা তাতে মোটেই অখুশি নই।

উৎস সূত্র: শ্রী সুজয় রায়

ছবি সৌভিক

খেলার রাজা পর্বতারোহণ

বাসব চট্টোপাধ্যায়

এবারে আরোহণের কথা

ব্যাকিং আপ পদ্ধতিতে চিমনী আরোহণ

ব্রিজিং করে চিমনী আরোহণ

হিউম্যান চোক্‌স্টোন চিমনীর মধ্যে বিশ্রাম

হাত ও পা জ্যাম্ করে চিমনী বা ক্র্যাক্ আরোহণ

হাত ও পা জ্যাম্ করে ভার্টিক্যাল ক্র্যাক্ আরোহণ

লে ব্যাক্ প্রথায় ক্র্যাক্ আরোহণ

ধরা যাক্, 'এ' আরোহী হল পর্বতারোহনের পরিভাষায় Lead climber দেওয়াল ধরে যে তিনজন আরোহনের পরিকল্পনা করেছেন তাদের দ্বিতীয় আরোহী 'ঐ' এবং শেষ আরোহী 'ও'।

'এ' এবং 'ঐ' এর মধ্যে যে দড়ি আছে, তা 'ও' আরোহী গোল করে গুটিয়ে নিল।এইবার 'এ (Lead Climber) রক ফেসের সামনে দাঁড়াল। এবং 'ঐ' কে বলল 'ঐ' বলল O.K.

'এ' Rock Face Hold's ধরে উঠতে লাগল। দ্বিতীয় আরোহী দড়িকে পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দুহাত দিয়ে শক্ত করে ধরে Body Beley করতে থাকবে। বেশ কিছুটা ওঠার পর যখন ধরার মত কোনো Holds পাওয়া গেল না তখন আঙুলের মত ফাটলে পিটন লাগানো শুরু হল, এবং পিটন লাগানোর আগে জানালো Belay tight পিটন লাগাবো।

আরোহী এবার জানাবে বিলে ঠিক আছে। 'এ'এবার নিরাপদ জায়গায়। অর্থাৎ যেখানে তুলনামূলক বড় ফুট হোল্ডার পাবে সেখানে পা রেখে ভারসাম্য বজায় রাখবে, ভারসাম্য রেখে কোমরের ওয়েস্ট ব্যান্ডে ঝোলানো ক্যারাবিনারের গেট খুলে পিটন এবং হ্যাঙার বার করবে। পিটনটিকে ফাটলের ম্যধে আড়াআড়ি অর্থাৎ ৪৫ degree কোণে প্রবেশ করাবে। নেড়েচেড়ে দেখে নেবে পিটন শক্তভাবে ফাটলে ঢুকছে কিনা।এবার ক্যারাবিনারে গেট খুলে পিটনের মাথার গর্ত দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে, এবং কোমরে বা দড়ির অংশ ক্যারাবিনারের গেট খুলে লাগিয়ে দেবে। এতে 'এ' আরোহীর আরোহন নিরাপদ হল। কারণ কোন কারণে খাড়াই দেওয়াল থেকে হাত ফস্কে পতনের সম্ভাবনা তৈরি হলে আরোহী খুব বেশি ঝুলে যাবে প্রায় তিন চার ফুট। কারণ পিটন ও ক্যারাবিনারের সাহায্যে 'এ' আরোহী সে বিলের ব্যবস্হা করল, যাকে পর্বতারোহনের পরিভাষায় রানিং বিলে বলে, সেই বিলে ক্যারাবিনারের ক্ষেত্রে পুলির কাজ করবে আর নীচের ঐংক্ষসত্রংষ্ট সেই মুহূর্তে কোমরে জড়ানো দড়ি শক্ত করে আটকে দেবে। এইভাবে পরের পর পিটন ক্যারাবিনার লাগিয়ে এবং তারমধ্য দিয়ে দড়ি প্রবেশ করিয়ে লক্ষ্যস্হলের দিকে এগিয়ে যাবে। দড়ি যখন শেষ হবার উপক্রম হবে তার অনেক আগে একটা বড় নিরাপদ জায়গায় পৌছে,অর্থাৎ যেখানে তিনজনেই নিরাপদে বিশ্রাম নিতে পারবে, সেই জায়গায় নিজেকে বড় কোন পাথর অথবা পিটন দিয়ে অ্যাংকারিং করে নীচের আরোহীকে উপরে ওঠবার জন্য 'এ' আরোহী বিলে করবে। এ যেতে নিচের আরোহী

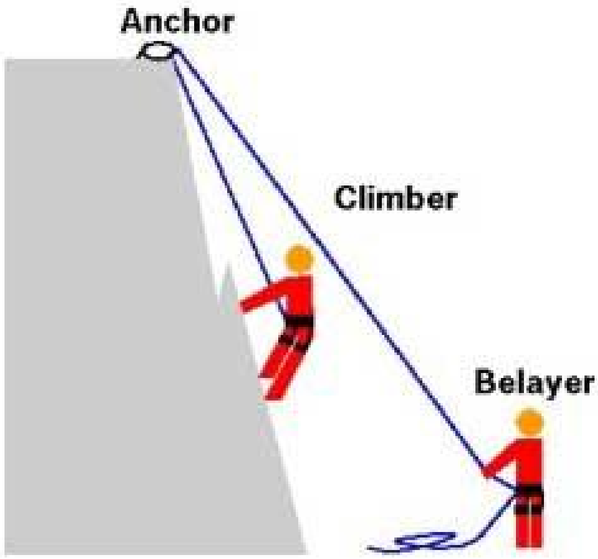

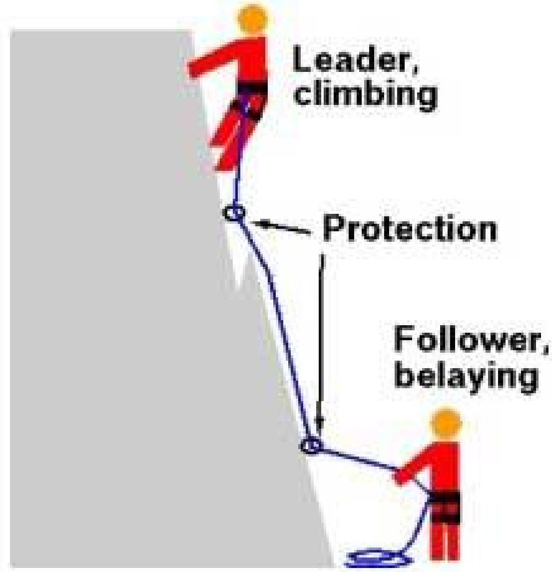

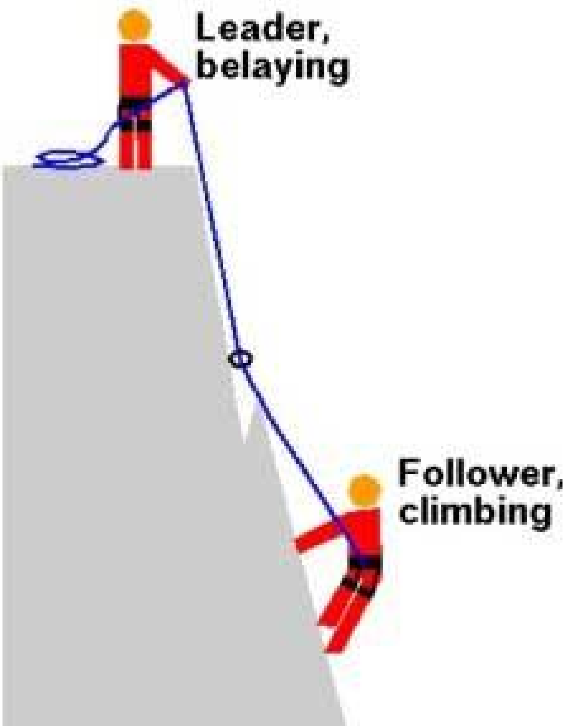

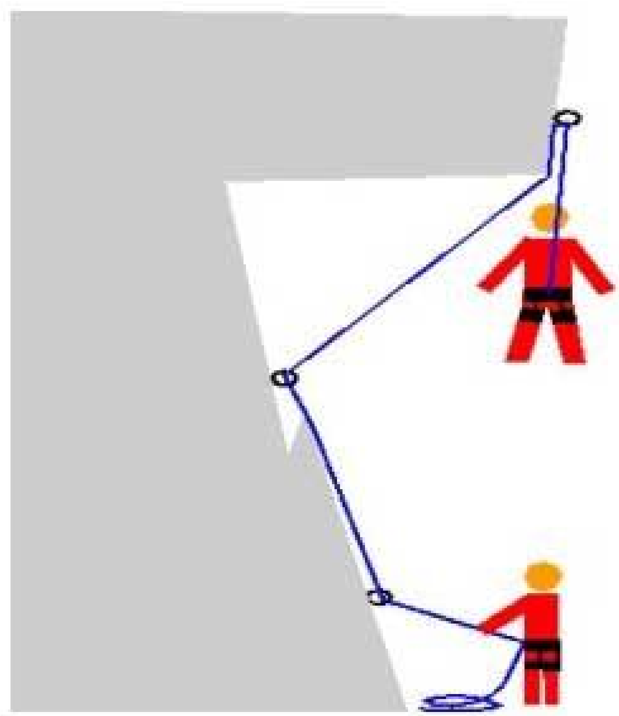

পিটন লাগাবে না, বরং লাগানো পিটন ও ক্যারাবিনার খুলতে খুলতে আসবে।

'ও' আরোহী, নিরাপদ জায়গায় অর্থাৎ 'এ' ও 'ঐ' এর কাছে পৌঁছে পুণরায় প্রথম আরোহণের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। অর্থাৎ 'এ' আরোহী আবার পিটন ও ক্যারাবিনারের সাহায্যে শৃঙ্গের দিকে এগোতে থাকবে। আর 'ও' আরোহী Belay করা শুয়ে করবে। অবশ্যই নিজেকে ভালোভাবে অ্যাংকারিং করে। কারণ যে কোনো পতন থেকে Belayer + Lead Climber কে রক্ষা করবে।

দুরূহ রকফেস আরোহণের পর 'এ', 'ঐ' এবং 'ও' প্রথম শৃঙ্গের আরোহণ করে একটি বড়সড় জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে, কিছুটা এগিয়ে হয়ত একটি খুব বড় ফাটল অর্থাৎ চিমনি রয়েছে।এই চিমনি আরোহণের বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেটি এবার জানাবো।

চিমনি হল পাহাড়ের কঠিন শিলার বিশাল ফাটল। নানা কারণে বিরাট পাথরে বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন সাইজের ফাটল তৈরি হয়। এগুলি এক ফুট থেকে শুরু করে চার পাঁচ ফুট চওড়া হয়। ফাটলের উচ্চতা দশ-বারো ফুট থেকে দেড়শ-দু শো ফূট হতে পারে। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় নীচের দিকে ফাটল চওড়া হলেও ওপরের দিকে ক্রমশ: সরু হয়ে যাচ্ছে।

এবার চিমনি আরোহণের কথায় আসি। আরোহী চিমনি আরোহণের সময় পাথরের দেওয়ালে পিঠ রেখে বাঁ পা সামনের দেওয়ালে চেপে রেখে ডান পা মুড়ে পিঠ রাখবে দেওয়ালে অর্থাৎ মোড়া পা হবে আরোহীর সাময়িক বিশ্রামের স্থান। হাত দুটোও পিছনের দেওয়ালে ভর দিয়ে আরোহী উপরে উঠতে থাকবে। দুহাত আর ডান পায়ে ভর দিয়ে শরীরটা ঠেলে দেবে উপরে। প্রথমেই প্রায় ফুট খানেক উঠে, ডান হাতে ভর খেয়ে মোড়া ডান পা সোজা করে সামনের দেওয়ালে রাখবে। বাঁ পায়ের পাশে সমান্তরাল ভাবে রাখবে। এবং এবারে বাঁ পা পিছনের দেওয়ালে মুড়ে রেখে একই ভাবে হাতের চেটোতে ভর দিয়ে আরো একফুট উঠতে হবে। এইভাবে পুরো চিমনি আরোহণ করে আরোহী নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেল।

ফাটল বা রক্ আরোহণ

পাহাড়ের রক ফেসে অনেক সময় বড় বড় ফাটল দেখা যায়। সেইসব ফাটল ধরে আরোহণ খুব শ্রমসাধ্য। অথবা পূর্বে শিখেছি খুব বড় ফাটলকে পর্বতারোহনের পরিভাষায় চিমনি বলা হয়। কিন্তু সংকীর্ণ ফাটলকে রক বলা হয়। দক্ষ শৈলারোহী ছাড়া রক আরোহণ সম্ভব নয়।

. বক আরোহণ করতে হলে ফাটলের বাইরের হোল্ডস্ ধরে অথবা হাত ও পা ফাটলের মধ্যে জ্যাম করে আরোহণ করতে হবে। ফাটলের দেওয়াল যদি খুব মসৃণ হয় এবং রক্ ফেস দেওয়ালের মত যদি খাড়া হয়, তবে হাত ও পা জ্যাম করতেই হবে। কিন্তু কোনো ফাটল যদি সূক্ষ্ম হয়, তবে হাত পা প্রবেশ করিয়ে জ্যাম করা যায় না। সে ক্ষেত্রে লে ব্যাক পদ্ধতিতে আরোহণ করতে হয়। সূক্ষ্ম রক্ ফেসের ধারালো অংশ দুহাত দিয়ে ধরে পা দুটি হাতের কাছে আনতে হবে, এবং দেহ অনেকটা বাইরের দিকে ঝুলে থাকবে। দেহের পুরো ভার হাত এবং পায়ের ওপর এসে পড়বে। মনে রাখতে হবে রক্ আরোহণে হাত এবং পা কাছাকাছি রাখতেই হবে। নচেৎ পা পিছলে আরোহীর পতন হবার সম্ভবনা থাকবে।

লে ব্যাক প্রথায় আরোহণের সময় ভালো ফুট হোল্ডস্ খুঁজে নিতে হবে। আসল কথা লে ব্যাক পদ্ধতিতে আরোহণে দক্ষ পর্বতারোহী হওয়া আবশ্যক।

এবার এই পর্যন্ত-ই। অবরোহণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো পরের সংখ্যায়।

ক্রমশ

লালকমল আর নীলকমলের গল্প

গল্প বলেছে, ঐন্দ্রিলা আচার্য
বয়স চার বছর
সেন্ট জোসেফ কো-এড কনভেন্ট স্কুল, কেজি ওয়ান

একটা লালকমল ছিল আর একটা নীলকমল ছিল। ওরা তো ঘরে ছিল। আর জানো তো, ওরা জঙ্গল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে করে যাচ্ছিল। তখন নীলকমল দেখছে কি পেছনে একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কী করেছে, কোথাও একটা জায়গা পেল। সেখানে একটা ভূত হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তখন লালকমল বলল যে, চলো আমরা ওইখানে লুকিয়ে পড়ি। নইলে ভূতটা যে আমাদের দেখতে পেয়ে যাবে! ভূতটা অ্যাত্তোবড়ো শিংওয়ালা। ব্ল্যাক কালারের শিং ছিল। তখন সেই আংকেলটা- আংকেলটাকে চেনো না? ওই যে আমাদের বাড়ির নিচে যে আংকেলটা পাহারা দেয়! আংকেলটা সেই সময় বিরাট একটা ডাণ্ডা নিয়ে ভূতটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরে, প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আংকেল ভূতের পেছনে এমন বদাম বদাম করে পিটিয়ে দিল যে ভূতটা মরেই গেল। আর লালকমল আর নীলকমলের সে কী মজা! ওরা দুজন খুব খুশি হয়ে হাসতে লাগল আর লাফাতে লাফাতে স্কুলে চলে গেল। আমার গল্প ফিনিশ হয়ে গেল।

দুটো গল্প

লেখা ও আঁকা: সোমদত্তা ব্যানার্জি
বয়স: আট বছর
ক্লাস থ্রি, সেন্ট অগাস্টিন স্কুল, বারাকপুর।

১/ গরমের ছুটিতে শীতের দেশে

প্রত্যেক বছর গরমের ছুটিতে আমরা নানা জায়গায় বেড়াতে যাই। এই বছর বাবা ঠিক করলেন সিমলা, কুলু , মানালি যাবেন। বেড়াতে যাবার কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হল। আমরা ভোর তিনটের সময় ট্রেন ধরতে বেরিয়ে পড়লাম। এখানকার ট্রেন দেরি হওয়াতে সিমলার ট্রেন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। তখন আমরা অটোয় করে কালকায় এলাম। কালকায় এসে দেখি সিমলায় যাবার টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। টয় ট্রেন দেখে আমার এত আনন্দ হল যে আমি দৌড়ে গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। ট্রেনে উঠবার পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন চলতে লাগল। চারদিক দেখতে দেখতে কখন যে সিমলা এসে গেল! তারপর নানা জায়গা ঘুরলাম বাসে করে, গাড়ি করে। নতুন একটা নদী দেখলাম ‘বিয়াস’। সব থেকে আনন্দ হল রোটাং পাস-এ গিয়ে বরফ নিয়ে খেললাম। বেড়ানো শেষ করে সবাই বাড়ি ফিরে এলাম।

২/ রথযাত্রা

বর্ষাকালে রথযাত্রা আমাদের একটা উৎসব। পুরীতে প্রধান রথযাত্রা উৎসব হয়। দেশ বিদেশ থেকে লোক এই উৎসব দেখতে আসে। এই দিন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা রথে চড়ে মাসীর বাড়ি যায়। সাত দিন পর উলটো রথে ফিরে আসে। মাসীর বাড়ি যাওয়ার দিন থেকে লোক এই উৎসব দেখতে আসে। এই দিন আমিও কাঠের রথ চালাই। আমাদের বাড়ির সামনে রথের মেলা হয়। সেখান থেকে অনেক পুতুল কিনি। আমরা মেলায় অনেক জিনিস খাই। যেমন গজা, জিলিপি, পাঁপড় ভাজা। তারপর ভেঁপু বাঁশি বাজাতে বাজাতে বাড়ি ফিরে আসি।

গ্যালারি

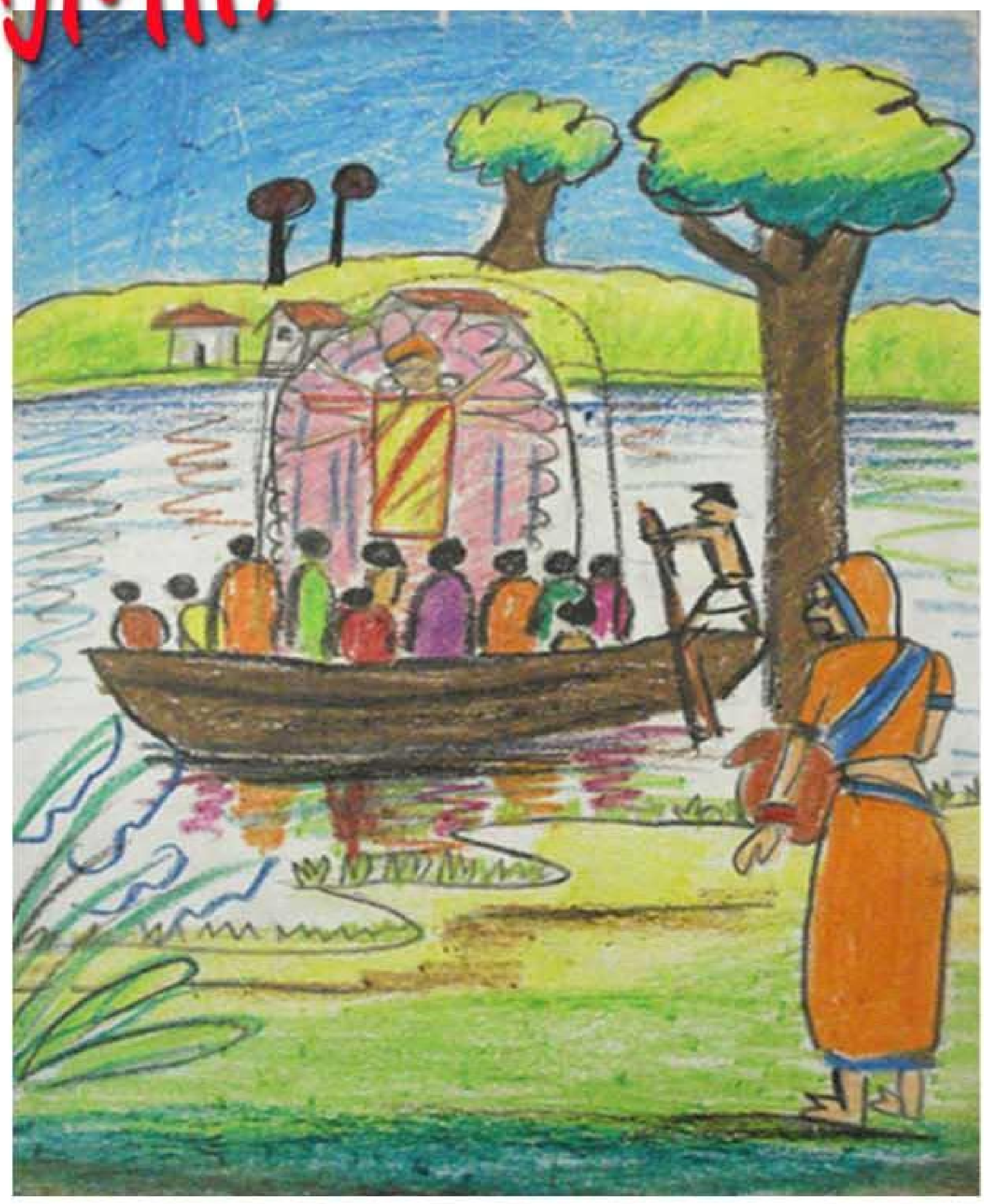

আমাদের ঋত্বিক ভারি দুষ্টু হয়েছে। পুজোর সময় কে কী করতে চাও এঁকে দেখাতে বলতে সমাদৃতা রামধনুর সবকটা রঙ মিলিয়ে কেমন এঁকে দিলো গ্রামের নদীতে ভাসান দেখতে যাবার ইচ্ছেটা, দেবপর্ণা চাইল, মন্দিরের সামনে ফুলওয়ালির থেকে ফুল কিনে পুজোবাড়িতে যাবে, আর এই দুষ্টুটা বললো, সে যাবে পুজোর ছুটিতে সমুদ্রে। ঢেউয়ে ভেসে সমুদ্রের দানবদের সঙ্গে নাকি সে ভাবসাব করবে পুজোর ছুটিতে। দেখো কাণ্ড একবার!

Ì

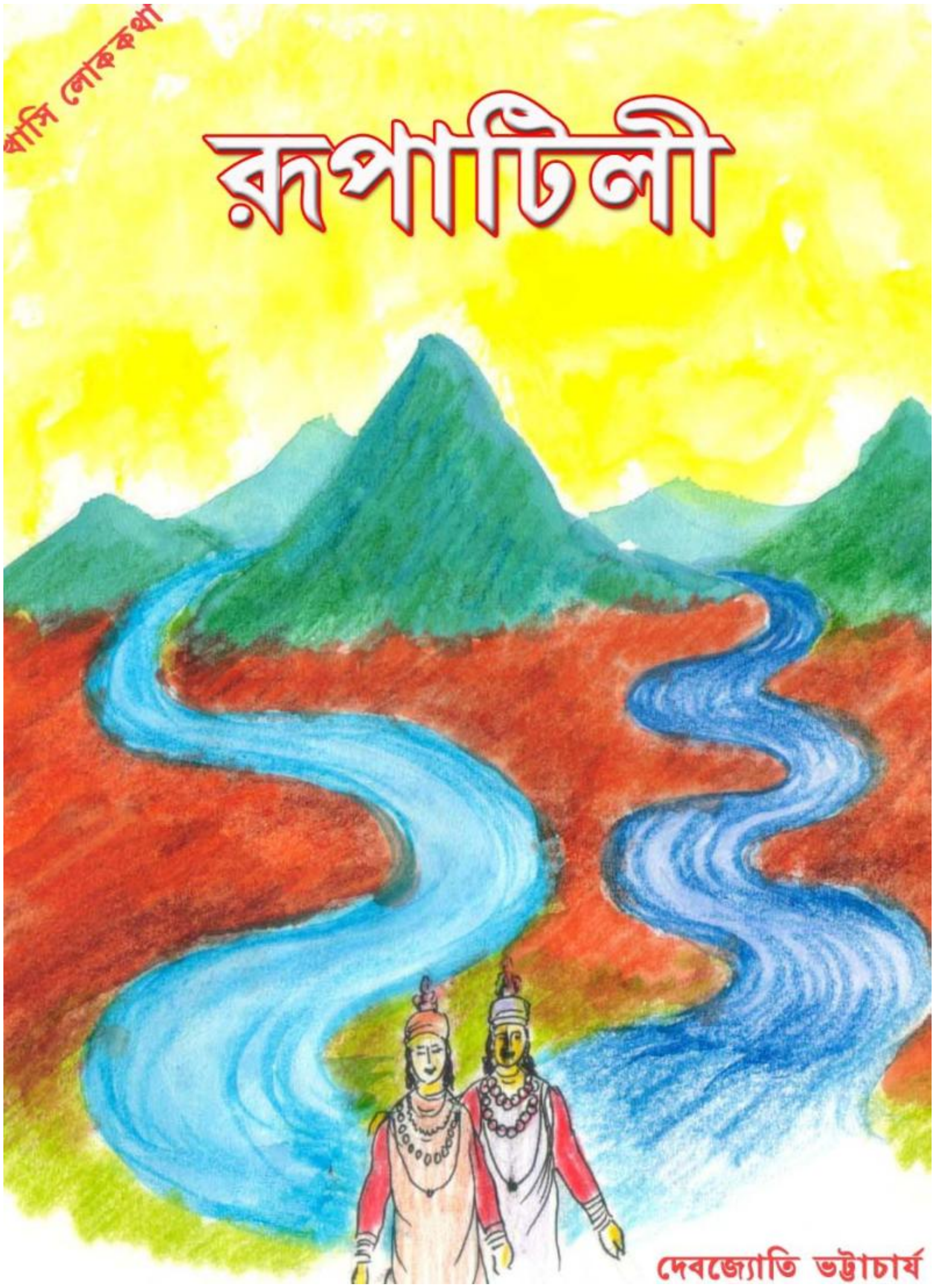

শিলঙ ঠাকুরের দুই মেয়ে। ক নট আর কা ইয়াম। বড় দিদি কা নট ভারী শান্ত মেয়ে।আর ছোট বোন কা ইয়াম হল ছটফটে। সব ব্যাপারে তার দিদির সঙ্গে পাল্লা। ওদিকে দু বোনে আবার ভারী ভাব। ঝগড়াও করে , আবার ভালোও বাসে। হাত ধরাধরি করে পাহাড়ে বনে খেলে বেড়িয়ে তাদের দিন কাটে।

এমনই এক দিনের গল্প শোন।

সেদিন ভোরবেলা শিলঙ পাহাড়ের মাথায় বসে দু বোনের হঠাৎ চোখে পড়ল, অনেক নিচে শ্রীহট্টের বন দেখা যাচ্ছে। তাই দেখতে দেখতে হঠাৎ কা ইয়াম দিদিকে ডেকে বলল, ''আয় দিদি দৌড় দৌড় খেলি। দেখি কে আগে পৌঁছুতে পারে শ্রীহট্টের বনে !''

কা নট হেসে বলল, ''পাগলী মেয়ে, শুধু শুধু দৌড়ুবি কেন?''

''তোমায় হারিয়ে জিতব বলে।''

''যা । এমনিই হার মেনে নিলাম । হল ত ? ''

''উঁহু। তা হবে না। সত্যি সত্যি দৌড়ে দেখতে হবে।''

''বেশ। চল তবে।''

দুই বোন দুই, নদীর রূপ ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে লাফিয়ে পড়ল নীচের দিকে। নদী হয়ে গিয়ে তাদের নাম হল উম নট আর উম ইয়াম।

উম নট খুব শান্ত নদী। কাউকে ব্যথা না দিয়ে, একটাও গাছকে না উপড়ে, হাজারো পাথরকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল সে।

সিলেটে পৌঁছে উম নট তো অবাক। ভেবেছিল তার ছটফটে বোন উম ইয়াম অনেকক্ষণ আগেই এসে পৌঁছে গিয়ে থাকবে। কিন্তু কোথায় সে? উম ইয়ামের কোনও দেখাই নেই যে! অন্য পথে আরও আগে এগিয়ে যায়নি তো ?

বোনকে খুঁজতে খুঁজতে উম নট এবারে এগিয়ে গেল ছাতকের দিকে। না: সেখানেও নেই। এবারে দেওয়ারার পথে-- এখানেও কোন চিহ্ন নেই বোন উম ইয়ামের।

তা হলে নিশ্চয় পাহাড়ের ভেতরে পথ হারিয়েছে ছোট বোনটা। চিন্তায় অস্থির হয়ে উম নট ফের বাঁক নিয়ে আবার পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হল। তার সেই বিশাল বাঁকে রৌদ্রের আলো পড়ে রূপোর মত ঝলমল করে উঠল বয়ে চলা জলের ধারা। অনেক ওপরে পাহাড়ের মাথা থেকে রূপো রঙের সেই বাঁককে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একগাছা রূপোর হার। মানুষেরা তাই তার নাম রাখল রূপাটিলী।

ওদিকে উচ্ছল উম ইয়াম অন্যের কথা অত ভাবেনা। দিদির মত এঁকে বেঁকে না গিয়ে সে সটান সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নীচের দিকে। কার ব্যথা লাগল না লাগল তাতে তার কী আসে যায় ?

জলের ঘায়ে পাথরের তো আর ব্যথা লাগে না, উল্টে জলেরই কষ্ট । উম ইয়ামকেও ধাক্কা মেরে মেরে পাহাড় কেটে আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছিল। শেষ অবধি পাহাড় থেকে নেমে সিলেটের বনের ধারে গিয়ে হাজির হয়ে দেখে উম নট তার অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়ে, তাকে খুঁজতে আবার পাহাড়ের দিকে ফিরে আসছে। এইভাবে হেরে গিয়ে লজজ্বায় পাঁচ টুকরো হয়ে ভেঙে গেল উম ইয়াম। তার পর সেই পাঁচ ধারায় এগিয়ে গিয়ে দিদির হাত ধরল।

দু বোন এবারে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। তাদের জলে সূর্যের আলো পড়ে রূপোর মত চিকচিক করতে লাগল।

(এইখানে বলে রাখি, খাসিয়া ভাষায় উম মানে হল নদী আর কা মানে শ্রীমতি)

খাসিয়া লোককথা

ছবি: মৌসুমী

ছাতারে

ইংরিজি নাম- Jungle Babbler

বৈজ্ঞানিক নাম- টুর্‌ডয়েডেস স্ট্রিয়াটাস

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

কোন কোন জাতের পাখি দেখা দেওয়ার আগে জানান দেয় ডাক দিয়ে। যেসব পাখির ডাক পাখি দেখায় অনভ্যস্ত কারুরও চিনতে ভুল হবে না তাদের মধ্যে যেমন আছে সুরেলা গলার কোকিল বা পাপিয়া, তেমনি আছে কোলাহল করা চড়াই বা ছাতারে।

চড়াই তো সবাই চেনে। ছাতারেও চেনা কঠিন নয়। এরা সব সময়েই দলে থাকে। ছ-সাতটি পাখি একসাথে হুড়োহুড়ি ক'রে খুব হট্টগোল করে। বন্ধুরা মিলে সদ্য শেষ হওয়া খেলা দেখে ফেরার পথে যেমন অনর্গল গল্প ক'রে, অনেকটা সেই রকম। ক্যাচর-ম্যাচর শব্দটার ঠিক মানে কি, তা ওদের ডাক শুনলেই বোঝা যায়।

এরা দলে সাধারণতঃ ছ-সাতজন থাকে বলেই বোধহয় হিন্দিতে এদের সাতভাই বলে। ইংরিজি নামটাও কাছাকাছি -সেভেন সিস্টারস্ বা সাতবোন। লোকে বলে কয়েকটি মেয়ে একজায়গায় জড়ো হলে নাকি ছেলেদের চেয়ে ঢের বেশি কথা বলে - সত্যি-মিথ্যে জানি না বাপু।

বাংলায় জাঙ্গল ব্যাবলার আর কমন ব্যাবলার দুজাতের পাখিকে এক ছাতারে নামেই ডাকা হয়। তবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে আমার কিন্তু জাঙ্গল ব্যাবলারই বেশি চোখে পড়েছে। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কমন ব্যাবলারই বেশি দেখা যায়। নামে জাঙ্গল ব্যাবলার হলেও লোকালয়ে এদের বেশ দেখা যায়। গায়ের রং মেটে ধূসর। যখন ওড়াউড়ি করে মনে হয়, পালকগুলি যেন আলগা ক'রে গায়ে বসানো - যে কোন সময় ঝ'রে পড়তে পারে। আকারে এরা মোটামুটি ময়নার মত। লেজ বেশ চওড়া হয়ে লম্বা। এরা মাঝে-মাঝে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে হয়ত, কিন্তু আসলে বিশেষত বিপদে এদের খুব একতা। দল বেঁধে প্রায়ই বিড়াল বা চিলকে তাড়িয়ে দেয়।

এরা ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে, মাটিতে পড়ে থাকা পাতার আড়াল থেকে আড়াল থেকে পোকা ধ'রে খায়। পোকার তালিকায় অন্যান্যদের সঙ্গে মাকড়শা আর আরশোলাও আছে। বট, অশ্বত্থ, জাম, ডুমুরের ফল খায়। আবার শিমুল, মাদারের মধু খেতেও ভালবাসে।

মাটি থেকে চার-পাঁচ ফুট উপরে গাছের ডালে অগোছালো বাসা বানিয়ে তিন-চারটি ডিম পাড়ে। তোমাদের আগেই বলেছি কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, তেমনি ছাতাড়ের বাসায় ডিম পাড়ে চাতক। ছাতাড়েরাও না বুঝে চাতকের ছানাদের মানুষ ক'রে তোলে।

পরের বার তোমাদের বলব আর এক জাতের ছাতারে কমন্ ব্যাবলারের কথা।

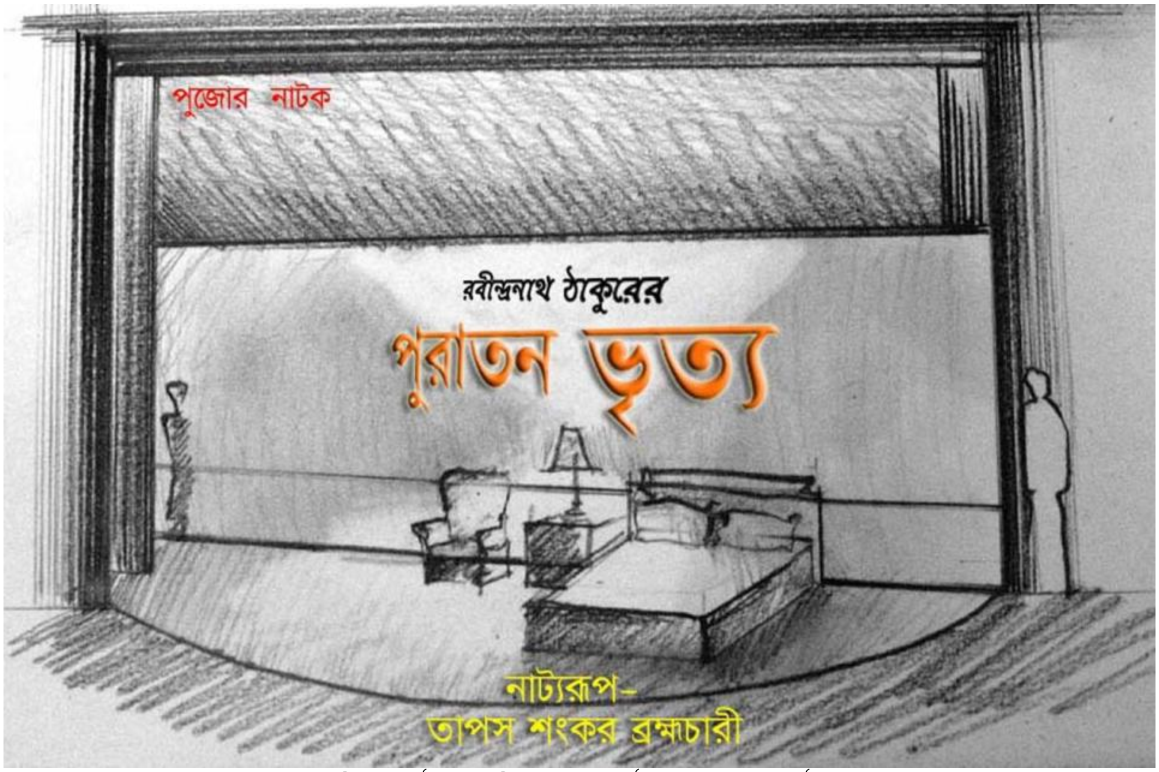

চরিত্রঃ--জনার্দন--গৃহকর্তা/ গিন্নীমা---ঐ গৃহিনী / ছেলে--ঐ পুত্র /মেয়ে--ঐ কন্যা / সুবল,হারাণ,হারাধন --জনার্দনের বন্ধুলোক / ১নং হকার,২নং হকার --ট্রেনের হকার / বাবা,মেয়ে,-----ট্রেনের যাত্রী / ১নং, ২নং,৩নংযাত্রী--জনার্দনের ট্রেনের বন্ধু / ১নং,২নং,৩নং পান্ডা--মন্দিরের পান্ডা / ডাক্তারবাবু / কেষ্ট----জনার্দনের ভৃত্য

প্রথম দৃশ্য

সাজানো গোছানো একটি ঘর। একপাশে একটা ছোট চৌকি,গোটা দুই তিন চেয়ার, একটা টেবিল। চৌকিতে বসে আছেন বাড়ীর মালিক জনার্দনবাবু। নাটক আরম্ভের সময় শোনা যাবে বিভিন্ন কন্ঠের আওয়াজ -----কেষ্টা, কেষ্টা, এই কেষ্টা ওঃ কাজের সময় যদি একবারও পাওয়া যায়-----ইত্যাদি ইত্যাদি-------। এই অবস্থায় পর্দা ওঠে। এমন সময় বাইরে থেকে কথা শোনা যায়---

নেপথ্যে--জনার্দমবাবু আছেন নাকি?

জনার্দম---কে?

নেপথ্যে---আমরা।

জনার্দন---আরে আমরা তো বুঝলাম, কিন্তু আমরাটা কে?

নেপথ্যে---(স্বগতঃ) যাঃ কলা! এ যে দেখি গলাই চিনতে পারেনা!

(উচ্চস্বরে) আরে আমরা হলুম গিয়ে সুবল সামন্ত আর হারাণ ধর।

বলতে বলতে দুজন মঞ্চে আসেন।

জনার্দন---আরে আসুন আসুন; কী সৌভাগ্য আমার। এই সময়ে আপনাদের যে দর্শন পাব এ তো আমি ভাবতেও পারিনি।

সুবল--- সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ফেরার সময় ভাবলাম,যাই, দেখা করে যাই আপনার সঙ্গে।

হারাণ---(*একটু ইংরেজি বলার অভ্যেস আছে*) ব্যাস্ চলে এলুম জয়েন্টলি।

জনার্দন--খুব ভাল করেছেন। এরকম মাঝে-সাঝে আসা-যাওয়া করলে ভাল লাগে।

হারাণ--মর্নিক ওয়াক্ তো হেল্থের পক্ষে তো খুব গুড্ মানে ভাল। তা আপনিও তো সকালে ওয়াক্ করতে পারেন জনার্দন বাবু।

জনার্দন- ভাবি বেরোব। কিন্তু আসল কথা কি জানেন,. হয়ে ওঠেনা আর কি। একটু বেলা হলেই আবার খেয়েদেয়ে বেরোতে হয় তো!

সুবল--হ্যাঁ, আপনার তো আবার দালালির ব্যাবসা।

জনার্দন-ঐ আর কি। ওতেই একটু আধটু যা আসে তাতেই সংসারটা চলে।

হারাণ--যে কোনো ব্যাবসাই ভাল মানে গুড্, জনার্দনবাবু।

জনার্দন-আরে দ্যাখো দ্যাখো কথায় কথায় আসল জিনিসই ভুল হয়ে যাচ্ছে। চা খাবেন তো?

দুজনে--না না, ওসবের কোনো দরকার নেই।

জনার্দন--ধুস্, সেকি হয় নাকি ! সকালবেলা আপনারা আমার বাড়ি এলেন আর একটু চা পর্যন্ত খাবেন না সেকি হয়! কেষ্ট, কেষ্ট, আরে ও কেষ্টা.........

সুবল--থাক্ না জনার্দনবাবু।

জনার্দন-(ওদের কথা কানেই নেন না, উচ্চগ্রামে ডাকতে থাকেন) কেষ্টা, এই কেষ্টা----

(*কেষ্ট মঞ্চে আসে, অত্যন্ত সরল সাধাসিধে বোকা মানুষ, চিৎকার,চেঁচামেচিতে সে নির্বিকার*)

কেষ্ট--কত্তা আমায় কি ডাকছেন?

জনার্দন-মানে? ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেললাম-এখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ডাকছি কিনা। হারামজাদা.....

কেষ্ট--কী করতে হবে কত্তা, ঘটি করে জল নিয়ে আসব?

জনার্দন-চোপ্। শোন, এঁরা এসেছেন, তাড়াতাড়ি করে এঁদের জন্যে দু'কাপ চা নিয়ে আয়।

কেষ্টা--এক্ষুনি নিয়ে আসছি। যাব আর আসব। (*যেতে গিয়ে ফিরে আসে*) কত্তা, কিছু বিস্কুটও নিয়ে আসি সঙ্গে করে? সক্কালবেলা এলেন....

জনার্দন-ঠিক আছে তুই যা....

কেষ্টা--আচ্ছা আপনারা চিঁড়েভাজা খান? ঝাল ঝাল ডালমুটের সাথে....

জনার্দন- তুই যাবি কিনা হতভাগা....

কেষ্টা--তাহলে যাই, (*একটু বাদে*) আচ্ছা কত্তা বলছিলাম.....

জনার্দন-কেষ্টা, আবার...

কেষ্টা--ঠিক আছে,ঠিক আছে। (*বেরিয়ে যায়*)

জনার্দন-আমার চাকর কেষ্টচরণ। জ্বালিয়ে খেলে মশাই। এক কথা দশবার বললেও মাথায় ঢোকেনা।

সুবল--দেখে তাই মনে হল অবশ্য।

হারাণ--আপনার কাজের লোকটি বেশ ভাল মানে গুড।
জনার্দন- হ্যাঁ সেটা অবশ্য ঠিক। সাত চড়ে রা কাড়েনা। অনেকদিনের পুরোনো চাকর আমার।
এমন সময় ভিতরে ঝনঝন করে কাপ পড়া ও ভাঙার শব্দ শোনা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কন্ঠের আর্তনাদ
--যাঃ গেল গেল,আমার সব কটা কাপ ভেঙে শেষ করে দিল হতভাগা , লক্ষ্মীছাড়া..
জনার্দন- আরে কী হল, এত চেঁচামেচি কীসের? কেষ্টা, এই কেষ্টা, কী ভাঙলো রে?....

উইংসের পাশ দিয়ে একগলা ঘোমটা মাথায় জনার্দনবাবুর স্ত্রীর অবয়ব দেখা যাবে, মুখ দেখা যাবেনা।

গিন্নী--কী আর হবে? চায়ের কাপ ফেলে তোমার কেষ্টচরণ ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে। ওনাদের একটু বসতে বল। আমি আবার নতুন করে চা তৈরি করে পাঠাচ্ছি। ওনারা যেন না যান।
সুবল--না, না বৌঠান কোন দরকার নেই। আপনাকে এখন আর চা করতে হবে না। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাবখন।
হারাণ--হ্যাঁ, হ্যাঁ , সেই ভাল মানে গুড হবে। চলি তাহলে জনার্দনবাবু।
জনার্দন-কী আর বলব! আবার আসবেন কিন্তু।
দুজনে-- নিশ্চই, নিশ্চই আসব। (চলে যায়।)

জনার্দন রাগে পায়চারী করতে থাকেন।

জনার্দন-অসহ্য, অসহ্য ,ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ভদ্রলোকেরা কী ভাবলেন...

জনার্দনের ছোট দুই ছেলে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে আসে। মেয়েটার হাতে একটা ভাঙা পুতুল, ছেলের হাতে ভাঙা গাড়ি।

জনার্দন- তোমাদের আবার কী হল?
মেয়ে(*কাঁদতে কাঁদতে*)--এই দ্যাখোনা কেষ্টদাদা আমার পুতুলের কী অবস্থা করেছে।
জনার্দন-কেন কী করেছে?
মেয়ে--পুতুলের মুখটা একটু নোংরা হয়েছিল বলে পরিষ্কার করে দিতে বলেছিলাম কেষ্টদাদাকে--

(*কাঁদতেই থাকে*)

জনার্দন-কী হয়েছে তাতে?
মেয়ে--কী হয়েছে ? এই দ্যাখোনা পুতুলের মুন্ডুটাই টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। আমায় এক্ষুনি পুতুল কিনে দাও, এক্ষুনি----(*জোরে জোরে কাঁদতে থাকে*)
ছেলে--আমার গাড়িটার সব চাকাগুলো খুলে দিয়েছে।
জনার্দন-কেন?
ছেলে--গাড়িটা ভাল চলছিল না বলে সারাতে বলেছিলাম। কেষ্টদাদা সব চাকাগুলো খুলে ফেলে এখন আর লাগাতে পারছেনা, দুটো চাকা তো খুঁজেও পাচ্ছেনা। আমি জানিনা; আমার গাড়ি চাই, আমাকে গাড়ি এনে দাও।
(*দুজনে তারস্বরে কাঁদতে থাকে,এমন সময় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ঘরে ঢোকেন গিন্নী*)
গিন্নী--কোথায়,কোথায় গেলে তুমি?
জনার্দন-এইতো আমি। কী-কী হলো আবার?
গিন্নী --আমি এক্ষুনি বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি।
জনার্দন-এই মরেছে, সে কি কথা গিন্নী, তোমার আবার হলো কী?

গিন্নী--হবে আবার কী? তোমার এই ঘরদোর আর তোমার ঐ আদরের কেষ্টাকে নিয়ে তুমি এখানে থাকো। আমি আর এখানে থাকতে পারছিনা।

জনার্দন-আহা হা হয়েছেটা কী?

গিন্নী-- কী হয়েছে? আবার জিজ্ঞাসা করছ কী হয়েছে? আমার একটা কথাও শোনেনা তোমার ঐ কেষ্টচরণ, বাঁদিক যেতে বললে ডানদিকে যায়, বাসনপত্র ভেঙেচুরে আমার তছনছ হয়ে যাচ্ছে, টাকাপয়সা জলের মতো খরচা হয়ে যাচ্ছে--- না না না ,এ আমি সহ্য করতে পারছিনা। তুমি আমায় বাপের বাড়ি রেখে এস।

জনার্দন- দ্যাখো গিন্নী, এ তো আর নতুন কথা নয়, ওতো একটু ওরকমই-----

গিন্নী- ও ওইরকম করে যাবে, আর আমাকে মুখ বুঁজে তাই সহ্য করতে হবে?---এইমাত্র বললাম জলের ড্রামটা রয়েছে ,ঐ দিয়ে রান্নাঘরটা একটি ধুয়ে দে। আর তাতে ও কী করল জানো?

জনার্দন- কী করল?

গিন্নী-- জলের ড্রামের বদলে কেরোসিন তেলের ড্রাম ঢেলে পুরো রান্নাঘর ভাসিয়ে দিয়েছে। আমি এখন কী করব?

জনার্দন--এই কান্ড করেছে?

গিন্নী--তবে আর বলছি কি? ওকে দিয়ে কী কাজটা পাওয়া যায় বলো দেখি? একবার বাজারে গেলে তো সারাদিন তার টিকিটি দেখা যায়না, দিনে দুপুরে যেখানে সেখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা একটা কথা বলতো ,চেশ্টা করলে কেশ্টা ছাড়া কি চাকর খুঁজে পাওয়া যায়না?

জনা--(চিৎকার করে) এই কেষ্টা, কেষ্টা, এদিকে আয় হতভাগা, আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন----

(কেষ্ট হাই তুলতে তুলতে ঘরে আসে, যেন কিছুই হয়নি)

কেষ্টা--কত্তা আমাকে ডাকছেন? ওমা কত্তামাও আছেন,ভালো।

জনা--হারামজাদা, কী করেছিস আজ?

কেষ্টা--কী করেছি বলুন তো? কই কিছু করিনি তো।

জনা--কিছু করিসনি? রান্নাঘরে কেরোসিন-----

কেষ্টা-- হ্যাঁ, হ্যাঁ রান্নাঘরে একটু কেরোসিন পড়েছে ,তাই না কত্তামা?

জনা--আমি তোর কোন কথাই শুনতে চাইনা । এক্ষুনি দূর হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। এক্ষুনি যাবি, আর যেন তোর মুখ আমি না দেখি এ বাড়িতে। বেরো, বেরো, দূর হ' বাড়ি থেকে----

(কেষ্ট ঘাড় নাড়িয়ে বেরিয়ে যায়। অন্য সবাইও ভেতরে যায়। জনার্দন গম্ভীর মুখে চৌকিতে গিয়ে বসেন। একটু বাদেই দেখা যাবে কেষ্ট প্রসন্নমুখে তামাকে ফুঁ দিতে দিতে হুঁকো হাতে ঘরে আসে।)

কেষ্ট--কত্তা, আপনার তামাক।

জনা--একি তুই ?আবার এসেছিস? (কটমট করে তাকায় ওর দিকে)

কেষ্ট--ওমা, অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? দুপুর হয়ে এল ,তামাক খাবেন না? নেন ধরেন(তামাক হাতে দেয়)
জনা--(স্নেহ মিশ্রিত স্বরে) তোকে নিয়ে কী করি বলতো হতভাগা!

(কেষ্ট হেসে ভেতরে যায়। জনার্দন সুখে তামাক খেতে থাকেন। একটু পরেই মঞ্চে আসেন হারাধন পাকড়াশী। এঁরও দালালী ব্যবসা)

হারাধন--জনার্দন ভায়া, আছ নাকি হে?
জনা--আরে কে ও? হারাধন পাকড়াশী না? কী ব্যাপার? এসো,এসো--
হারাধন-আরে ভাই ,সুখবর আছে। তাইতো দৌড়ে এলাম।
জনা--সুখবর? কী ব্যাপার গো?
হারাধন--আরে ভায়া পাটের দালালীতে কিছু উপরি টাকা পাওয়া গেছে। তা তোমার আমার ভাগে মোটামুটি ভালই হয়েছে। এই নাও ভাই তোমার ভাগের টাকা।(টাকা দেয়)
জনা --বা ভালই হল। বাড়তি টাকা পেতে ভালই লাগে।
হারাধন --ঠিক বলেছ ভায়া।তা যাও বাইরে টাইরে কোথাও ঘুরে এস।
জনা -- কথাটা মন্দ বলনি হে। গেলে হয়, একটু ঘুরে এলে হয়।
হারাধন --আচ্ছা, তবে উঠি ভাই এখন।

জনা --ঠিক আছে এস তাহলে।(হারাধন বেরিয়ে যায়)ও গিন্নী, শুনে যাও, শুনে যাও। আরে কী হল , শিগগীর এস।

(গিন্নী আসে)

গিন্নী-- কী হল কী ? এ্যাতো চেঁচাচ্ছ কেন ?
জনা-- চেঁচাচ্ছি কি আর সাধে ? পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি ।
গিন্নী-- কী পেলে গো ? নতুন চাকর পেলে বুঝি? যাক বাবা এতদিনে --
জনা-- আরে ধ্যাৎ , ওসব কিছু নয়।
গিন্নী-- তবে?
জনা-- টাকা টাকা -- বেশ কিছু টাকা পেয়ে গেছি ,দালালী থেকে হঠাৎ কিছু বাড়তি টাকা পাওয়া গেল।
গিন্নী-- ওমা তাই?
জনা--হ্যাঁগো , তাই ভাবছি একটু তীর্থ করে আসি। অনেক দিন ত' ওসব হয় না।
গিন্নী-- তা কোথায় যাবে গো? কবে যাবে?
জনা--ভাবছি, একটু শ্রীধাম দর্শন করে আসি। তুমি একটু তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে গাছিয়ে দাও দেখি ।
গিন্নী-- হ্যাঁগো, আমিও যাব তো?
জনা-- না গিন্নী সেটা এবারে হচ্ছেনা। যা টাকা পাওয়া গেছে তাতে তোমাদের নিয়ে যাওয়া যাবেনা। আর তাছাড়া এ তো বেড়াতে যাওয়া নয়, এ হল ধম্মো মনে পুণ্য করতে যাওয়া। তা আমার পুণ্যেই তো তোমার পুণ্য। পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য।
গিন্নী-- বেশ, আমাকে না হয় না নিয়ে গেলে, কিন্তু বিদেশ বিভুঁয়ে ঐ কেষ্টাকে নিয়ে গেলে তোমার কষ্টের সীমা থাকবে না ,এই বলে দিলুম।
জনা-- তুমি কি পাগল হলে গিন্নী? কেষ্টাকে নিয়ে বইরে যাব আমি?না না, কক্ষনো নয়। আমি ঠিক করে ফেলেছি , সঙ্গে নিবারণকে নিয়ে যাব। কেষ্টা কিছুতেই নয়।
(পর্দা পড়ে)

২য় দৃশ্য

(ট্রেনের অভ্যন্তর ভাগ। ট্রেন চলছে। জনার্দন বসে আছে। বিভিন্ন যাত্রীকে বাচ্চা- ছেলেমেয়েসহ আশেপাশে বসে থাকতে দেখা যাবে। একটি পরিবারের ছেলেমেয়েরা হকারের জিনিসপত্র কিনবার জন্য ব্যস্ত। তাদের বাবা তাদের আটকাতে ব্যস্ত। জনার্দনের সমবয়সী তিনচারজন লোকও দেখা যাবে)
১ম হকার-- লজঞ্চুস দেব - লজঞ্চুস - গালে রাখুন - চুষে খান, প্রচন্ড গরমে জল পিপাসা মিটবে, খেতেও সুস্বাদু-------
মেয়ে-- বাবা, লজঞ্চুস খাব , কিনে দাওনা----------
বাবা-- না, মিষ্টি খেলে পেট কামড়ায়।

১ নং হকার-- শুধু মিষ্টি নয়, সার, ঝাল ঝাল, নুন নুন, টক টক ও আছে।

মেয়ে-- ও বাবা----

বাবা--চোপ্। (১নং হকার অন্যদিকে যায়। ২নং হকার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে।)

২নং হকার-- ঝালমুড়ি--ঝালমুড়ি, ঝালমুড়ি খাবে খোকা? দু টাকায় এক ঠোঙা, পেট ভরে যাবে। দেব নাকি এক ঠোঙা?

ছেলে-- বাবা ঝালমুড়ি কিনে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে--

বাবা-- ওতে ভয়ংকর ঝাল , খেতে পারবিনা।

২ নং হকার-- না সার, লংকা ছাড়াও পাওয়া যায়।

বাবা-- এই, তুমি অন্য দিকে যাও তো, যত্তোসব-- (হকার চলে যায়।)

১ নং যাত্রী-- (জনার্দনকে) দাদা, কতদূর যাওয়া হবে?

জনা-- শ্রীধাম দর্শনে চলেছি।

২ নং যাত্রী--তাই নাকি? ভালই হল, আমিও তো ওখানেই চলেছি।

৩নং যাত্রী-- বেশ, বেশ ,চলুন, তাহলে একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

জনা-- আপনারা সবাই তাহলে একই জায়গায় চলেছেন?

১ নং যাত্রী-- তা দাদার সঙ্গে কাউকে দেখছিনা -- একলা নাকি?

জনা-- হ্যাঁ , আমি একাই চলেছি।

৩ নং যাত্রী-- আমরাও সবাই একলা একলাই যাচ্ছি।

(জনার্দনের মধ্যে একটু অস্বস্তি দেখা যায়।)

২ নং যাত্রী-- তা দাদার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? কেমন যেন বোধ হচ্ছে।

জনা-- না তেমন কিছু নয়, ঐ ব্যাপারটা হল গিয়ে আমার আবার একটু তামাক খাওয়ার বদ-অভ্যাস আছে। সকাল থেকে একবারও খাওয়া হয়নিতো, তাই---

(ইতিমধ্যে ট্রেন একটা স্টেশনে আসে। দেখা যাবে কেষ্টা হুঁকোয় ফুঁ দিতে দিতে কামরায় ঢোকে। জনার্দনের দিকে হুঁকোটি বাড়ায়।)

কেষ্ট-- কত্তা, আপনার তামাক।

জনা-- একিরে তুই? তুই কোথা থেকে এলি? নিবারণ কোথায়?

কেষ্ট-- সে আসেনি।

জনা-- তোকে না আমি বার বার করে আসতে বারণ করে এলাম?

কেষ্ট-- তা কি হয় কত্তা? আপনাকে আমি একলা ছেড়ে দিতে পারি কত্তা? তাই চলে এলাম।

জনা-- তাই চলে এলাম। হতভাগা কোথাকার , তা কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কেষ্টা-- পাশের কামরায়। হুঁকো সাজাচ্ছিলাম আপনার জন্যে।

জনা-- তোকে নিয়ে আর পারিনা আমি। তুই যে কবে আমার ঘাড় থেকে নামবি--

কেষ্টা-- (হুঁকো কত্তার হাতে দেয়) নেন কত্তা, অনেক সময় তামাক খাননি।

জনা-- (স্নেহ-মিশ্রিত স্বরে) হতভাগা , অন্য কামরায় যেতে হবেনা, এখানেই বোস।

(কেষ্টা জনার্দনের পায়ের কাছে বসে)

১ নং যাত্রী-- তা দাদার থাকা হবে কোথায়?

২ নং যাত্রী-- কোন বাড়ি-টাড়ি ঠিক করা আছে নাকি?

জনা-- না সেরকম তো কিছু ঠিক করা হয়নি। হঠাৎ করে আসা তো। কিছু ঠিক করে আসার সময় পাইনি আর কি।

৩ নং যাত্রী-- বেশ, বেশ, আমাদেরও কোন বাড়ি ঠিক করা নেই। চলুন, ওখানে গিয়ে একট কিছু ঠিক করে সবাই মিলে থাকা যাবে।

(ইতিমধ্যে গাড়ির গতি ধীর। গাড়ি স্টেশনে আসে। কিছু পান্ডাজাতীয় লোক ওদের ঘিরে ধরে)

১ নং পান্ডা-- বাবু আমি কাশীনাথ পান্ডা আছি। ঠাকুর দর্শন করাব।

২নং পান্ডা-- বাবু, আমি কৃষ্ণচন্দ্র। ঠাকুরের শতরূপ বর্ণনা করিব। সর্বধর্মস্থান দর্শন করাইব।

৩নং পান্ডা-- আমাকে চিনিলেন তো বাবু, আমি আপনার বংশের পান্ডা শ্রী মধুসূদন---

সকলে-- ধ্যেৎ, সরোতো। নামতে দাওতো আগে। ওসব পরে হবে।

(সবাই নামতে যায়, পর্দা পড়ে)

৩য় দৃশ্য

(একটা ছোটখাট ঘর। একটা চৌকিতে জনার্দন শুয়ে আছে, বসন্ত রোগে আক্রান্ত। আশেপাশে কেউ নেই। কেষ্টা একাই তাকে শুশ্রূষা করছে। কখনো পাখার হাওয়া, কখনো হল বা ওষুধ খাওয়ানো,কত্তা কেমন আছেন বার বার জিজ্ঞেস করা-- এই নিয়ে একটা বিপর্যস্ত ভাব। অন্য বন্ধুরা কেউ ঢোকে না, বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে কথা বলে।)

১ নং--হ্যাঁরে কেষ্টা, তোর বাবু এখন কেমন রে?

কেষ্টা-- ভীষণ জ্বর , সারাটা রাত কত্তা একটুও ঘুমায়নি।(কেঁদে ফ্যালে)

২ নং --মুখে কী যেন গোটা গোটা গোটা দেখছি?

কেষ্টা-- হ্যাঁগো বাবুরা, সারাটা গায়ে কত্তার আমার এই গোটায় ছেয়ে গেছে।

৩ নং-- হ্যাঁ বলিস কিরে? সারা গায়ে বেরিয়েছে?

১ নং-- ও বাবা এ ত বসন্ত রে-----

২ নং-- না না বাপু, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে শেষে বসন্তে মরব নাকি?

৩ নং-- বেশ, বেশ, বড় ভাল কথা বলেছ ভাই। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি চল।

কেষ্টা-- আপনারা চলে যাচ্ছেন বাবুরা? আমার কত্তার তাহলে কী হবে?(কান্না)

১ নং-- কোন ভয় নেই।

২ নং-- দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আশেপাশে কত লোক রয়েছে----

৩ নং-- বেশ বলেছ, কত লোক রয়েছে। আমরা চলিরে। চল, চল---

(সবাই কোনোক্রমে নিজেদের জিনিস নিয়ে পালায়)

জনা-- ওরা সব চলে গেল, নারে কেষ্টা?

কেষ্টা-- আমি তো আছি কত্তা, আপনার কোনো ভয় নেই।

জনা-- (প্রচন্ড কষ্টে) একটু জল দিবি কেষ্টা?

কেষ্টা-- (জল দেয়) বড় কষ্ট হচ্ছে, কত্তা?

জনা-- হ্যাঁরে বড় কষ্ট, বড় কষ্ট----

কেষ্টা-- একটু ঘুমোবার চেষ্টা করেন কত্তা, দেখবেন আরাম পাবেন---
জনা-- আর ঘুম। আমি আর ভাল হব না রে, কেষ্টা---
কেষ্টা-- (চোখ মোছে) না না কত্তা, ওকথা বলবেন না। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আবার দেশে ফিরবেন, কত্তামারে দেখবেন, সোনামণিদের সাথে খেলা করবেন। আপনি ঘুমান কত্তা, আমি আপনাকে বাতাস করি।(কেষ্টার গলা ধরে আসে)

(ধীরে ধীরে আলো কমে আসে। অল্প আলোয় দেখা যায় কেষ্টা ক্রমাগত কত্তার সেবা করে যাচ্ছে। ক্রমে জনার্দন সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু মনে হবে ও অসুস্থ। মঞ্চ পুরো অন্ধকার হয়ে যায়। আলো এলে দেখা যায়, কেষ্টা অচৈতন্যের মত শুয়ে আছে। সারা দেহ বসন্তে ভরা। সুস্থ জনার্দন স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আছে।)

জনা-- কেষ্টা, ও কেষ্টা, সাড়া দিচ্ছিস না কেন? ও কেষ্টা, কেষ্টা---দু দুটো দিন চলে গেল,মুখে কিছু দিলিনা, কত করে বলছি -- তুই তো আমার অবাধ্য কোন দিন হোস না। একটু কিছু খা না বাবা ---
(ডাক্তার আসে)
জনা-- ডাক্তারবাবু, ওতো কোন কথাই বলছে না।
ডাক্তার-- কালও তো দেখে গেলাম, জ্বরটা অবশ্য খুবই ছিল। (কেষ্টার দিকে তাকিয়ে) ও বাবা গুটিও তো বেরিয়েছে খুব----

জনা-- কতগুলো দিন কতগুলো রাত কেটে গেছে, একটা মুহূর্তের জন্য আমার পাশ থেকে সরেনি, না খাওয়া , না ঘুম; ওর প্রাণ ঢালা সেবাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠ্‌লাম,ডাক্তারবাবু। আমাকে সুস্থ করে আমার সমস্ত ব্যাধি সমস্ত যন্ত্রণা এখন নিজের দেহে ভোগ করছে, অজ্ঞানের মত পড়ে আছে, এত ডাকছি, আমার এত বাধ্য তবুও কেষ্টা কেন সাড়া দিচ্ছেনা ডাক্তারবাবু স্থ

(ডাক্তার এগিয়ে যায়, কেষ্টাকে পরীক্ষা করে পরে মুখ নীচু করে বলে)

ডাক্তার--- ও আর কোনোদিনই সাড়া দেবে না জনার্দনবাবু; ও আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে।
জনা-- কী বললেন? চলে গেছে? কেষ্টা আমায় ছেড়ে চলে গেছে? কতদিন ওকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছি ডাক্তারবাবু, আজ ও সত্যিসত্যিই আমায় ছেড়ে চলে গেল।
ডাক্তারবাবু-- হ্যাঁ জনার্দনবাবু, কী আর করবেন? বলি কি আপনি এবার দেশে ফিরে যান জনার্দনবাবু। আমি চলি --(ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়)

(আলো কমে আসে। মৃদু আলোয় দেখা যায় জনার্দন উঠে দাঁড়ায়, টিনের বাক্সটা হাতে নেয় ও আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে। শোনা যাবে-----)

বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

পর্দা পড়ে।

ছবি: মৌসুমী

বিগত দিনের প্রথিতযশা কল্পবিজ্ঞান লেখক দিলীপ রায়চৌধুরীর কথা আজ তোমরা অনেকেই হয়তো জানো না। ভারি অল্পবয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁর লেখা এই দীর্ঘ গল্পটি দিয়ে জয়ঢাক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। গল্পটা আমাদের প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছেন তোমাদের যশোধরাদিদি।

পঞ্জিকার পাতা খুলে এখানে ঋতু নির্ণয় করতে হয় না। বরফে ঢাকা শীতের সাম্রাজ্যে যখন পরদেশী মন একটুকরো সবুজের জন্য ছটফট করছে, হঠাৎ একদিন বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে জানালার ফাঁকে চোখ পড়ে রোগা, ক্ষীণ, খ্যাংরা গাছের ডালে নরম এক স্পন্দমান সবুজ কলি - যেন পরম বিস্ময় ও কৌতূহলভরে মাথা তুলে তকিয়ে রয়েছে ঘুম ভাঙা শিশুর মতো।

যখন নতুন এসেছিলাম এদেশে গ্রাজুয়েট ছাত্র হিসবে, বসন্তকালের যে প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী বুঝতে পারতাম না। দেশে থাকতে শীত শেষ হয়ে কখন বসন্ত কোথা দিয়ে চলে গেল বোঝাই যেত না। কলকাতায় এত তাড়াতাড়ি গরম পড়ে যায় যে, বসন্ত ভয়েই পালায়। কিন্তু এই উত্তর মার্কিন মুলুকে প্রখর শীতের শেষ বসন্ত এক বিরাট উৎসবের সময়। বসন্ত এখানে বিস্ফোরিত হয়। অঘোষিত তবু পরম প্রার্থিত আগন্তুকের মতো মাঠের সবুজে, দিগন্তের নীল, রৌদ্রজজ্বল সকালের হলুদে, এ এক বিস্ময়কর যাদুকরের ছোঁয়া।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎ জোড়া নাম। কত কষ্ট করে যে আমাকে এখানে স্থান পেতে হয়েছে, তা ভাবলে বসন্তোৎ সব প্রমোদরঙ্গে যোগ দেওয়ার উৎসাহ থাকে না। ল্যাবরেটরি আর অ্যাপার্টমেন্ট এই নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছে। ভোরবেলা উঠে বেরোই। কোনোরকমে প্রাতরাশ সেরেই কাজ শুরু করতে হয়। ল্যাবরেটরিতে সুপ গরম করে খেয়ে নিই। খালি সন্ধের খাবারটা খেতে বাইরে যাই।

ক্বচিৎ কখনো দিনের বেলায় পথে বেরোলে দেখি টেনিস কোর্টে অগুন্তি ছেলেমেয়ের ভিড়, দূরে গল্ফ কোর্সের সামনে অসংখ্য গাড়ির সারি, সাপ্তাহিক নাচের আসর, অর্কেস্ট্রা, জলকেলি, এসবের শেষই নেই। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক গোরমানের কাছে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব সান্ধ্য অনুষ্ঠানের রসোপভোগের সময় কোথায় পাব?

সেদিন সকালবেলায় কতকগুলো কমপাউন্ড ফিল্টার করছিলাম। এখুনি সেগুলির বন্দোবস্ত না করলেই নয়। টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল ঝনঝন করে।

'হেলো! ও, হেলো মিস্টার বার্নস্টিন! কী ব্যাপার!'

'সঞ্জয়, তোমাকে আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে। তুমি তো জানো, ফরেন স্টুডেন্টস অ্যাডভাইজার হিসেবে প্রত্যেকটি আগন্তুক অতিথিকে স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে যাই। আজ খবর পেলাম কলকাতা থেকে প্রফেসর রায় আসছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য এক বিশেষ কাজে। এদিকে আমি একটা জরুরি ব্যাপারে আটকা পড়েছি। আমার অ্যাসিস্ট্যন্ট ট্রাভিসকে তো তুমি চেনোই। ওর সঙ্গে তুমি যদি এয়ারপোর্টে যেতে পারো তো খুব ভালো হয়।'

মহা সমস্যায় পড়লাম। একটা কাজ আরম্ভ করেছি, সে কাজটা ফেলে যাই কী করে! ফেলে রেখে গেলে কমপাউন্ডটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ইতস্তত করছি দেখে মি: বার্নস্টিন বললেন, 'শোনো আমি প্রফেসার গোরমানকে বলে দিচ্ছি তোমাকে ঘণ্টা দুই ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আরে, এয়ারপোর্টের হাওয়া খেলে তুমি বিকেলে আরও বেশি খাটতে পারবে। ক্রীতদাসের মালিকদের তো এটা বোঝা উচিৎ - হা! হা,' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে আরম্ভ করলেন।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বিরক্ত হয়ে কমপাউন্ডটা যতদূর সম্ভব শুকিয়ে ডেসিকেটারে ভরে রাখলাম। কী আর করা যায়!

ঠিক সাড়ে দশটায় ট্রাভিস এলো। শহর থেকে বেড়িয়ে এয়ারপোর্টে যেতে হিমশিম অবস্থা। সপ্তাহের শুরু - বিরামহীন মোটরগাড়ির স্রোত পথে। একটা লালবাতি পেরোতে পুরো দশ মিনিট। কোনোরকমে শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে উর্ধশ্বাসে গাড়ি ছুটল।

যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম কে এই প্রফেসার রায়। তাড়াহুড়োয় ভালো করে পুরো নামটাও জানা গেল না। কী বিষয়ের অধ্যাপক কে জানে! এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি হাতে তখনও কয়েক মিনিট সময় আছে। রেস্তোরাঁয় এক পেয়ালা কফিতে গলাটা ভিজিয়ে নিতেই দেখি মাইক্রোফোনে ঘোষণা হচ্ছে, 'প্যান আমেরিকান ফ্লাইট টু - ও - সিক্স এইমাত্র এসে পৌঁছালো।'

পাসপোর্ট ও কাস্টমসে আরও কিছু সময় গেল। আমরা উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখি কাস্টমসের বেড়ার ওপার থেকে একজন বাঙালি ভদ্রলোক আমার দিকে হাত নাড়ছেন। আরে, এ যে অধ্যাপক সুশোভনবাবু! আমাদের সেন্ট জেমস কলেজে অ্যাস্ট্রোনমি ও বায়োলজি পড়াতেন। ও হরি, ইনিই তাহলে বার্নস্টিনের প্রফেসার রায়, আমাদের কলেজের রুটিনের এস আর।

ট্রাভিস আমাকে জিজ্ঞেস করলে - 'তুমি কি ওকে আগে চিনতে?'

'আরে চিনতাম মানে! আমি ওঁর কাছে পড়েছি কলেজের পুরো চার বছর।'

সুশোভনবাবু কিন্তু একটুও বদলাননি। সেই উস্কোখুস্কো চুল। পোশাক পরিচ্ছদ ও হাবভাবের ম ধ্যে যেন বড়ো করে লেখা রয়েছে - অধ্যাপক। সঙ্গে একটা সস্তা সুটকেস, তাও পোর্টারদের টানা হ্যাঁচড়ায় হাতলটা ছিঁড়ে গেছে। হুট করে এসে পড়েছেন বছরের মাঝখানে, থাকার জায়গা ঠিক নেই।

বললাম, 'আপাতত আমার অ্যাপার্টমেন্টেই চলুন। তারপর চানটান করে সুস্থ হয়ে বার্নস্টিনের সঙ্গে দেখা করবেন।'

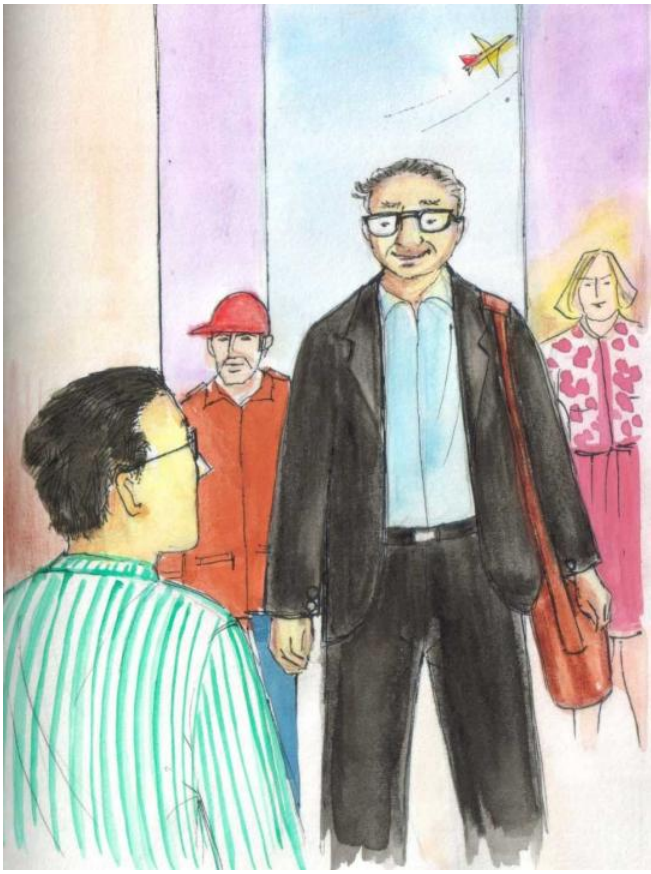

'জানো সঞ্জয়, তোমাকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলুম। আমার এদেশে আসার মোটেও ইচ্ছা ছিল না। ভালোই হল, তুমি বলছ। নিজেই রান্না করে খাওয়া যাক রাত্তিরে। অন্তত আজ রাত্তিরটা আর ওইসব বিদেশি ছাইভস্ম গিলতে হবে না।'

'কিন্তু আমেরিকানরা আপনাকে কলকাতা থেকে শিকড়শুদ্ধু নড়তে পারল কী করে?'

'আর বলো কেন ভাই। কী কুক্ষণেই যে বছর পাঁচেক আগে বিলেতের নেচার পত্রিকায় মঙ্গলগ্রহ সমপর্কে এক গাঁজাখুরি গল্প ছাপিয়েছিলাম, তার জন্যেই শেষ পর্যন্ত পাড়ি দিতে হল। ওরা আমাকে খুব বোদ্ধা ব্যক্তি ঠাউরিয়েছে। আসলে আমি দেখতে চাই উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমার থিয়োরি কতটুকু প্রমান করা যায়।'

।।।।।।।।।।।।।।।।।

গাঁজাখুরি গল্পই বটে - এক নিমেষে মনটা উড়ে গেল কলেজ জীবনের সেই সোনার খাঁচার দিনগুলিতে। আমাদের সেন্ট জেমস কলেজে অন্য কলেজের তুলনায় ফাঁকি দেবার রাস্তা খুব কম ছিল। জেসুইট ফাদাররা খালি মাইনে করা প্রফেসর নন। তাঁদের জীবনটাই উৎ সর্গীকৃত। বাঙালি অধ্যাপকদের মধ্যে সুশোভনবাবু আমাদের অ্যাস্ট্রোনমি ও বায়োলজি পড়াতেন। তিনিও চরিত্রে ও গবেষকের একাগ্রতায় প্রায় ক্যাথলিক বললেই চলে।

ইংরাজি সেটা বোধহয় ১৯৫৬ সাল হবে। ঠিক পুজোর ছুটির আগে সুশোভনবাবু আমাদের গ্রহলোকের কথা পড়িয়ে শেষ করছিলেন। এখনও কানে ভাসছে মঙ্গলগ্রহ সমপর্কে তাঁর ক্লাসের বক্তৃতা-

'প্রাচীনকালে লোকেরা একটি গ্রহকে ভীষণ ভয় করতো। তার চেহারাটা কোনও পরাক্রান্ত দেবতার টকটকে লাল চোখের মতো। যে চোখ যেন ক্রোধভরে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। রক্তবর্ণ মহাকাশচারী গ্রহটিকে চ্যালাডিয়ানরা নাম দিয়েছিল নেরগাল - যুদ্ধের ও মৃত্যুর দেবতা। পারসিয়ানরাও বোধ হয় চ্যালাডিয়ানদের কথা ভুলতে পারেনি। তাদের কাছে গ্রহটি নাম পেয়েছিল পহলবানি সিফির অর্থাৎ আকাশের যোদ্ধা। কি গ্রিক কি রোমান সকলের মনেই এই গ্রহটি ছিল ধ্বংস ও সর্বনাশের প্রতীক। রোমানদের দেওয়া মার্স নামটাই শেষ পর্যন্ত চালু হয়েছে। আমরা বলে থাকি ম ঙ্গল, যদিচ অন্য সকলের মনে এই যুদ্ধ দেবতা নেহাৎ অমঙ্গলেরই প্রতীক।'

সেন্ট জেমস কলেজ ছোটো হলে কী হবে, অ্যামেরিকা থেকে আনানো একটি ছোটো টেলিস্কোপ - নাম বোধহয় কোয়েস্টার - ওখানে অনেক খরচা করে বসানো হয়েছিল। সুশোভনবাবুর উৎ সাহের অন্ত নেই। আমাদের বলেছিলেন, 'ভেবে দ্যাখো, সূর্য ও মঙ্গলের গড় দূরত্ব বাইশ কোটি আশি লক্ষ কিলোমিটার - সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের দেড়গুণ বেশি। আগামি এক হপ্তার মধ্যে মঙ্গল ও পৃথিবীর মধ্যে এক মহা বিরোধী অবস্থা আসছে; ওদের মধ্যে দূরত্বটা তখন দাঁড়াবে মাত্র সাড়ে পাঁচ কোটি কিলোমিটার। তোমরা যারা চাও তারা অনায়াসে পুজোর ছুটির মধ্যে আমার সাথে দেখা করলে কলেজের টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহটিকে পরিষ্কার দেখার সুযোগ পাবে।'

অ্যামপ্লিফায়ারে সিনেমার গান, দশমীর তাসা আর তারপর বিজয়া সম্মিলনীর ফাংশানের মধ্যে দিয়ে পুজো যে কোথায় কেটে গেলে কে জানে। সেদিন সকালে কলেজে যাচ্ছি। দূর থেকে সেন্ট জেমস কলেজে বেড়ার ওপার থেকে দেখি কলেজের সামনে ভীষণ ভিড়। সে কী, এসময় স্ট্রাইক! কই কাগজে তো কোন বিবৃতি দেখিনি! ভিড় ঠেলে দেখি, একদল দেশি-বিদেশি লোক উত্তেজিতভাবে খাতা হাতে ক্যামেরা কাঁধে প্রিন্সিপালের সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই সুশোভনবাবু এলেন। তাঁকে ও প্রিন্সিপাল ফাদার ভ্যান লুনকে নিয়ে সেই দঙ্গল ঘরে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আমাদের নাকের সামনে।

কৌতূহলে আমাদের তখন পেট ফুলছে। খুঁজে বার করলুম অমরেশকে। সবাই জানে আমাদের ক্লাশের মধ্যে ওই ছেলেটাই সুশোভনবাবুর সবচেয়ে প্রিয়। কিছু জানলে ওই আমাদের বলতে পারবে। দেখি আমি একা নই। কমনরুমে ওকে ঘিরে পুরো থার্ড ইয়ারের ক্লাসটাই - ছোটোখাটো যেন একটা প্রেস কনফারেন্স।

কিছুতেই ভাঙতে চায় না ছেলেটা। বলে, 'আরে বাবা কাল তো সব খবরের কাগজেই বেরোবে, কী ব্যাপার জানতেই পারবে।' সাঙ্গুভেলির কবিরাজি কাটলেট, পিকিং এর মুর্গিভাজা কোন লোভই ওকে টলাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ম্যাটিনিতে গ্রেগরি পেক-এর নতুন বই দেখানোর লোভে কাৎ হোল। সেদিনের সেই কাহিনী আমরা রুদ্ধনি:শ্বাসে গিলেছিলাম -

'ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্কিয়াপারেল্লি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অনেক বছর ধরে খুঁটিয়ে মঙ্গলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল যখন মহাবিরোধী অবস্থায়, তখন আবহাওয়া ভাল থাকলে উনি রোজ দেখতেন।

'তাঁর আঁকা মঙ্গলের মানচিত্রে পৃথিবী প্রথম জেনেছিল যে, মঙ্গলের গায়ে সরু সরু খাল আছে। সমস্ত পৃথিবী হৈ চৈ করেছিল, যদি সেকথা মেনে নিতে হয়, তবে এটাও মানতে হবে যে ওখানে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। তাদের যন্ত্রসম্ভারও দারুণ বলতে হবে। বুড়ো স্কিয়াপারেল্লির নিশ্চয়ই চোখ খারাপ হয়েছে নয়ত ভীমরতি হয়েছে।

'১৯০৯ সালে আবার যখন মঙ্গল ও পৃথিবীর মহাবিরোধীতার অবস্থা এলো, তখন খালগুলো সম্বন্ধে এক চূড়ান্ত মীমাংসায় আসার চেষ্টা হল। অ্যামেরিকান বৈজ্ঞানিক লাওয়েল অ্যারিজোনা মরুভূমির মালভূমিতে এমনকি একটা বিশেষ বীক্ষণাগার বানালেন। ধোঁয়াধুলোহীন অ্যারিজোনার আকাশে মঙ্গলকে টেলিস্কোপে দেখে লাওয়েল জোর গলায় বললেন, মঙ্গলগ্রহে খাল আছে। সবসময় দেখা যায় না, বিশেষত যখন বরফে ঢাকা থাকে। বরফ গলে জলে ভরে গেলে দেখা যায়। আর খালি তাই নয় দেখা যায় বসন্তকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে জল যাচ্ছে এবং হেমন্তে দক্ষিণ থেকে উত্তরে জল বয়ে চলেছে। এ থেকে লাওয়েলপন্থীরা বলেছিলেন, মঙ্গলগ্রহে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ইঞ্জিনিয়ারদের বাস, কারণ জল

আপনা আপনি গড়িয়ে এদিক থেকে ওদিকে যায় না। জল চালাতে গেলে পামপ লাগে এবং সেই পামপ নিশ্চয়ই ওরা বানাতে জানে।'

অমরেশের এত লম্বা ভনিতা আমরা আর সইতে পারছিলাম না।কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'হতভাগা! সুশোভনবাবু কী বার করেছেন তাই বল না!'

অমরেশ কোনদিকে কান না দিয়ে বলে চললো, 'লাওয়েলের বিরোধীদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাঁরা বললেন, ওসব খাল-টাল চোখের ধাঁধা। একটা কাগজে কতগুলো ছাপ এঁকে এখানে সেখানে দুটো চারটে দাগ দিলে দূর থেকে মনে হয় সেগুলো জুড়ে গ্যাছে, তা থেকে খাল-টালের দু:স্বপ্নের কথা ম নে জাগাটা অস্বাভাবিক নয়।

'মাস্টারমশায় আর আমি আজ প্রায় তিনমাস রাত্তিরে ঘুমোনো ছেড়ে দিয়েছি। না, তোরা যা ভেবেছিস তা নয়, আমরা মঙ্গলের গায়ে সমুদ্র ও খাল আছে কি না, তা বার করার মোটেই চেষ্টা করছি না। সত্যি বলতে কি, গ্রহটির দিকে আমাদের নজর নয়, ডিমোস ও ফোবোস বলে মঙ্গলের দুটো উপগ্রহ আছে - আমাদের দৃষ্টি ওই উপগ্রহ দুটোর দিকে। কাল শেষরাত্তিরে আমরা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি, ওই দুটো উপগ্রহের মধ্যে ফোবোস একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। নি:সন্দেহে কোনও সভ্য বিজ্ঞানী-সমাজ ওটাকে ম হাকাশে পাঠিয়েছে মঙ্গলের বুক থেকে।'

কথাটা এত অবিশ্বাস্য, এত অস্বাভাবিক যে, প্রায় পুরো পাঁচ মিনিট আমরা হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। আচ্ছন্নের মত আমরা প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম তারপর : 'কী, কী প্রমাণ আছে তার?'

'ফোবোস উপগ্রহটা একটা ধাঁধার মত। আমাদের জানা সৌরজগতের একত্রিশটা স্বাভাবিক উপগ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র ওটাই, যে গ্রহের চারদিকে ঘুরছে তার চেয়ে বেশি জোরে পাক খায় - ম ঙ্গলের চারিদিকে যে সময়ে ও তিনবার ঘুরে এসেছে, সেই সময়ে মঙ্গল কেবলমাত্র একবার ঘুরেছে। তাছাড়া এক অস্বাভাবিক ব্যাপার - ফোবোস পশ্চিমে উঠে পূবে অস্ত যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ক্রমে ওর ঘোরার বেগ বাড়ছে এবং গ্রহের কাছে ওটা এগিয়ে আসছে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, ফোবোস একটি ফাঁপা উপগ্রহ - কৃত্রিম বানানো উপগ্রহ!'

গোটা বিষয়টা এত জটিল অঙ্কের ব্যাপার, তর্ক করবে কার সাধ্য! আমরা চুপ করে উঠে গেলাম সকলে।

সুশোভনবাবুর সঙ্গে এক গাড়িতে বসে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা যায় না। 'হুঁ, ওই বুঝি তোমাদের লেক মিশিগান। আচ্ছা, ওই বাঁদিকের গম্বুজওলা বাড়িটা?'

'স্যার, ওটাই হচ্ছে জগদ্বিখ্যাত অ্যাডলার প্লানেটারিয়াম।'

'তাই নাকি হে!' পারলে সুশোভনবাবু তক্ষুণি নেমে পড়েন, 'কলকাতায় একটা প্লানেটারিয়াম হয়েছে ময়দানে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। আমি সেখানে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিই।'

থাকি ইউনিভার্সিটির খুব কাছে মেরিল্যান্ড অ্যাভেনুতে। স্বচ্ছল লোকের এলাকা এটা নয়। বাড়ির ভেতরকার আসবাবে ও লোকজনের পোশাক-আসাকে, মোটরগাড়ির চেহারায় 'নিম্নবিত্ত' ছাপ ম ারা। যে ভদ্রমহিলার বাড়িতে থাকি, সেই মিসেস ভেনাস মূলত ভারতীয়। ওঁর বাবা-মা বাঙালি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ভাগ্যান্বেষণে ত্রিনিদাদে চলে আসেন। তারপর এক অ্যামেরিকান নাবিকের ঘরণী হয়ে মিসেস ভেনাস যখন মার্কিন মুল্লুকে আসেন তা'ও সে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

মিসেস ভেনাসের ভারি মিষ্টি স্বভাব। এক মিনিটে সুশোভনবাবুকে আপন করে নিলেন।

‘সঞ্জু, আজ আর তুমি রান্না চাপিওনা ভাই। পালংশাক রান্না করেছি। তোমরা দুজনে আমার ঘরেই খাও।’

আলি আকবরের সরোদ বাজছে ঘরের কোনে। মার্কিন মুল্লুকে রবিশঙ্কর ও আলি আকবর বোধহয় জাজের চেয়েও জনপ্রিয়!

‘মাস্টারমশায় তারপর বলুন কী ব্যাপার! এক বছর কী নিয়ে মাথা ঘামাবেন!’

‘সবই বলবো হে, আগে চল, খেয়েদেয়ে প্রফেসর ট্রুম্যান স্টার্কের সঙ্গে মোলাকাত করে আসি। সেকি! তুমি ট্রুম্যানকে চেনো না! ওর মতো নামকরা এক্সোবায়োলজিস্ট পশ্চিমী দুনিয়ায় কমই আছে। গ্রহান্তরের জীবন সমপর্কে ওর অসীম জ্ঞান।’

‘কিন্তু স্যার বার্নস্টিনের সঙ্গে দেখা করতে হবে যে!’

‘আরে সে দুমিনিটের ব্যাপার, ভদ্রতার সমপর্ক। কিন্তু ট্রুম্যানের সঙ্গে আমার নাড়ির টান।’

খেয়ে দেয়ে বার্নস্টিনের দরজায় বুড়ি ছুঁয়ে প্রফেসর স্টার্কের কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে আমি কেটে পড়লাম। প্রফেসর গোরম্যান এখুনি এসে সকালের কমপাউন্ডটার মেল্টিং পয়েন্ট জানতে চাইবেন। পুরোনো প্রফেসর এসেছে বলে সকালটা গেছে। তা বলে বিকেলে তো রেহাই নেই। সুশোভনবাবুর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল হাউসে। রকফেলারের পয়সায় আন্তর্জাতিক সৌহার্দ স্থাপনের এমন সুন্দর জায়গা আর আছে নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে। আর থাকার জায়গার দরকার কি ভদ্রলোকের! থাকবেন তো সেই অবজারভেটরি কি স্পেস ল্যাবরেটরিতে।

কদিন বাদেই শনিবার ইন্টারন্যাশনাল নাইট। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা মিলে লোকসঙ্গীতের একটা প্রোগ্রাম দেবো। তারই রিহার্সালে গেছি ইন্টারন্যাশনাল হাউসে। তখনও আমাদের পুরো দল এসে পৌঁছায়নি। লবিতে দেখি সুশোভনবাবু কার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

‘আরে এই যে সঞ্জয়, তুমি সেদিন যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলে। আমি সেই থেকে তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছি। তোমার টেলিফোন নাম্বারটাও জানিনে।’

‘কেন স্যার ইউনিভার্সিটির ডাইরিতে আমার ল্যাবের ও বাড়ির ফোন নাম্বার দেওয়া আছে।’

‘ওই দ্যাখো, অত শত আমি কি জানি বাপু!’

‘এখন কার জন্য অপেক্ষা করছেন? প্রফেসর স্টার্কের ?’

‘তুমি কী করে জানলে? আচ্ছা শোনো, এখন তো আমি ভীষণ ব্যস্ত। ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছি কদিনের জন্য, স্টানফোর্ডে প্রফেসর লেডারবার্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য। শনিবার ফিরছি। রবিবার বিকেলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো, গল্প করা যাবে।’

শিকাগো ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল নাইট একটা দেখার মতো জিনিস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের পোশাকে গানবাজনা ও নৃত্যাভিনয়ে রাতটাকে মাতিয়ে তোলে। ল্যাটিন ছন্দে গিটারের ঝঙ্কারের সঙ্গে বাংলার বাউল-ভাটিয়ালি মিলেমিশে গিয়ে এক অপূর্ব মাদকতাময় পরিবেশ। কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল কে জানে। রবিবার ঘুম থেকে উঠে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ইন্টারন্যাশনাল হাউসের ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। রাঁধতে ইচ্ছা করছে না। ক্যাফেটেরিয়ার অখাদ্য ল্যাম্বকারি আর শক্ত শক্ত ভাত গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না। কোনোরকমে গল:ধকরণ করার চেষ্টা করছি এমন সময় দেখি সুশোভনবাবু লাইন দিয়ে ঢুকছেন ট্রে হাতে।’

‘স্যার, এই যে এদিকে আসুন। একি ভাত নেননি?’

'আরে সঞ্জয়, না বাপু, আমার ও মাংস ভাতের পিন্ডি পোষায় না। ন্যক্কার দিয়ে ওঠে। তার চেয়ে আলুর ডালনা আর মুর্গি সেদ্ধ অনেক ভালো। সোয়াদ নেই কিন্তু বমি পায় না।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওঁর ঘরে গিয়ে বসা গেল। টেবিলে একগাদা কাগজপত্তর ছড়ানো। নানা দুর্বোধ্য অঙ্ক, ক্যলকুলাসের প্রতীকচিহ্ন ছড়নো-ছেটনো পাতায় পাতায়।

'বুঝলে সঞ্জয়, এত কোটি কোটি ডলার এরা মহাকাশ অভিযানের জন্য খরচা করছে। কিন্তু আসলে এরা যে কী চায় তা বুঝতে পারি না। তারপর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে এত দলাদলি এটা আমি আগে জানতাম না। দেখ না কেন, মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযান পাঠানোর ব্যাপারে কম সে কম ছটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত সহজ পরীক্ষার ব্যাপারগুলোও এখনও পৃথিবীতেই স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা গেল না তো গ্রহান্তরের কথা ছেড়েই দাও।'

'স্যার আমি তো যা শুনেছি আপনাকে পেয়ে ওরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। আসল ল্যাবরেটরি তো মগজে। সেটার যখন বন্দোবস্ত হচ্ছে বাইরে থেকে, কাজ এখন নিশ্চই এগোবে। আপনার কাজের প্ল্যান সমপর্কে কিছু বলুন।'

সুশোভনবাবু একটু নড়েচড়ে বসলেন। বোঝাই যাচ্ছে এরকম একজন উৎসাহী শ্রোতাই খুঁজছিলেন।

'তুমি তো জানো সঞ্জয়, আমি আগেই নানা প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছি, মঙ্গলের ডেমোস ও ফোবোস নামে দুটি উপগ্রহের মধ্যে ফোবোসটা একটা কৃত্রিম উপগ্রহ। রুশ বৈজ্ঞানিক ম্যালিনোভস্কি, পরে অ্যামেরিকার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির প্রফেসর পার্কার আমার এই কথা সমর্থন করেন। অবশ্য একশ্রেণীর অ্যামেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এ সব নিশ্চই রাশিয়ানদের বানানো গল্প। মার্কিনি মহাকাশ দপ্তর যখন ঝগড়া করে সময় কাটাচ্ছেন, তার মধ্যে রাশিয়ানরা ওদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করবার জন্য গুজব রটাচ্ছে। একথা আমি বিশ্বাস করিনা সঞ্জয়। কারণ আমিই যে এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি।

'ভেবে দেখো, মহাকাশ ভ্রমণের ব্যাপারে অ্যামেরিকানরা তখন অনেক এগিয়েছে বটে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ৪৫০ পাউন্ড ওজনের টেলিভিশন ক্যামেরা-ওয়ালা একটা মহাকাশযান মঙ্গলের চৌহদ্দিতে পাঠানোর ক্ষমতা ওদের হয়নি। অথচ ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে শুক্রগ্রহের দিকে ওরা যে ২ নং ম্যারিনারটা ছেড়েছিল, সেইরকম একটা অভিযান হলেও কিছুটা খবর পাওয়া যায়। গ্রহটার ১৫০০০ মাইলের মধ্যে যেতে পারলেই পরীক্ষায় অন্তত মঙ্গলগ্রহের বায়ুমন্ডল ও পরিবেশ সমপর্কে সঠিক কিছু জানা যায়।'

'সবচেয়ে ক্ষোভের ব্যাপার হোলো, নিজেরা তো কিছু করবেই না, আবার অন্য লোকেরা কিছু বললে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চুপ করিয়ে দেবে। কাল স্ট্যানফোর্ডে গিয়ে যখন 'মঙ্গলের কৃত্রিম উপগ্রহ' সমপর্কে বক্তৃতা করলাম, অধিকাংশ শ্রোতা প্রমাণ দিয়ে আমাকে বসাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বললে, 'ওসব সায়েন্স ফিকশন ননসেন্স।' সত্যি বলতে কি, এরা অত্যন্ত স্টুপিড।'

কথা বলতে বলতে সুশোভনবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

'স্যার, ক্যালিফোর্নিয়া আপনার লাগলো কী রকম? দেশের কথা মনে পড়ে যায় না?'

'সত্যি, ঠিকই বলেছো, কলকে, টগর সব রকম ফুল রাস্তার ধারে ফুটে আছে দেখলাম। স্ট্যানফোর্ডে টালির চালওলা ঘরগুলো দেখেও বেশ মজা লাগলো। ক্যালিফোর্নিয়ায় অবশ্য আমায় বেশ

কিছুদিন কাটাতে হবে। সেটা সানফ্রান্সিসকো কি লস অ্যাঞ্জেলসে নয় - ডেথ ভ্যালির মরুভূমিতে। কারণ ওখানেই আমাদের প্রজেক্টের কাজকর্ম হবে। দু:সহ গরমে গোবি সাহারার চেয়ে কম যায় না। যাক, অনেকক্ষণ বকবক করা গেছে, চলো একটা সিনেমা দেখে আসি।

দুজনে মিলে ট্রেনে চড়ে শহরের ভিতরে গেলাম। ভ্যান বারেন স্ট্রিটে নেমে হাঁটতে হাঁটতে 'স্টেট অ্যান্ড লেক' সিনেমা হলে গিয়ে কী যেন একটা হলিউডের ছবি দেখলাম। তারপর ওয়ারশ অ্যাভিনিউতে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ভাত আর এগ ফুয়ং খেয়ে রাত্রে ইউনিভার্সিটি এলাকায় ফিরলাম। অনেকদিন বাদে সন্ধেটা মন্দ কাটল না।

অ্যামেরিকার ছাত্রজীবন পরীক্ষায় পরীক্ষায় একেবারে কন্টকাকীর্ণ। জুন মাসের শেষ পর্যন্ত একেবারে হিমশিম খেতে হয়। কখনও আচমকা পরীক্ষা, কখনওবা নিয়মিত সাপ্তাহিক পরীক্ষা; তারপর টার্মের শেষে ফাইনাল পরীক্ষা তো আছেই।

জুনের শেষে একটু হাঁফ ছাড়ার সময় পেলাম। আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল। শনিবার বিকেলবেলায় ফুটবল খেলা দেখতে যাবো বলে বন্ধুদের সঙ্গে ল্যাবরেটরি থেকে বেরোচ্ছি, হঠাৎ প্রফেসর গোরমানের মুখোমুখি পড়ে গেলাম, ভাবলাম এই সেরেছে, এখুনি বলবেন কোর্সের পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে, এবার রিসার্চ শুরু করো। না, ঠিক তা মনে হচ্ছে না, ভদ্রলোকের ভুরুটা একটু বেশি কুঞ্চিত, 'সঞ্জয়, দু মিনিট আমার ঘরে আসবে, একটু কথা আছে।'

'ইয়েস অফ কোর্স সার।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে গোরমন সাহেব পাইপটা ধরিয়ে বললেন, 'এবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে কী করতে চাও?'

'ভাবছিলাম এখানে থেকে রিসার্চের কাজটা এগিয়ে নেবো।'

'সেটা কি সুবিধে হবে? দেখো আমি তিন মাসের জন্য ইসরায়েল যাচ্ছি। সে সময় তোমাদের গাইড করবে কে? আমি একটা এক্সাইটিং সাজেশন দিচ্ছি! একটা বিশেষ প্রজেক্টের জন্য স্পেস বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের ট্রুম্যান স্টার্ক একজন অর্গানিক কেমিস্ট চাইছেন গ্রীষ্মকালের জন্য। ভাল টাকাই দেবে, অল-ফাউন্ড ছশো ডলার। তোমার দেশে ফেরার ভাড়া হয়ে যবে। তাছাড়া কাজটাও ক্যালিফোর্নিয়ায়, ভালোই লাগবে। গো ওয়েস্ট ইয়ংম্যান গো ফর ব্রোক!'

সোমবার দিন ট্রুম্যান স্টার্কের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখি গোরমান সাহেব আমার এক বিরাট প্রশস্তি গেয়ে রেখেছেন ভদ্রলোকের কাছে। কাজের সমপর্কে ব্যাখ্যা করে বললেন, 'আমরা মঙ্গলগ্রহে একটি অনুসন্ধানকারী যান পাঠাচ্ছি ক্যালিফোর্নিয়ার মোহাডি মরুভূমি থেকে, এই সার্ভেয়ার স্পেসক্রাফটে থাকবে শারীরবৃত্ত-সংক্রান্ত নানা রাসায়নিক যন্ত্রপাতি। মঙ্গলগ্রহের পরিবেশের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া মরুভূমি অঞ্চলের অদ্ভুত মিল। প্রথমে এখানে পরীক্ষা করে দেখতে হবে বালির বুক থেকে ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করে যন্ত্রপাতি মারফৎ তাদের মেটাবলিজম ও শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাপ করা যায় কি না। কতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় সেটা মেপে দেখতে হবে । এছাড়াও নানারকম স্পেক্ট্রোস্কোপিক কাজ করতে হবে। ব্যাপারটা এই যে, স্পেক্ট্রো না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু কমপাউন্ড তৈরি করে ঠিক কী জাতির কমপাউন্ড মঙ্গল গ্রহের জীবজন্তু থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেটা মিলিয়ে দেখতে হবে। ঠিক এই কাজের জন্যই তোমাকে চাই। অর্গানিক কেমিস্ট্রি ও স্পেক্ট্রোস্কোপি দুটো জানা আছে এইরকম লোকই আমরা চেয়েছি। প্রফেসর গোরমানকে ধন্যবাদ, ঠিক লোকই তিনি আমাদের পাঠিয়ে

দিয়েছেন। ভাল কথা, আরেকটি ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক আমাদের টিমে আছেন। ফার্স্টক্লাস অ্যাস্ট্রোনমার - প্রফেসর রায়, তুমিও তাঁকে নিশ্চয়ই জানো।'

এতক্ষণে বোঝা গেল! এ নিশ্চয়ই সুশোভনবাবুর কৌশল। প্রফেসর স্টার্কের ঘর থেকে বেরিয়ে হলের অপর প্রান্তে সুশোভনবাবুর ঘরে ঢুঁ মারলুম, 'স্যর, শেষ পর্যন্ত আমাকে মরুভূমিতে টানলেন? হাড়মাস সব শুকিয়ে কাঠ হবে।'

'পেটে খেলে পিঠে সয় হে, কিন্তু এই মার্কিন মুল্লুকে এসেও তোমরা 'রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি' রয়ে যাবে নাকি? চলো, চলো, আমাদের সঙ্গে।'

আসলে বুঝতে পারছি, সঙ্গে একজন বাঙালি না থাকলে ভদ্রলোক পেট ফুলে মারা যাবেন। কাঁহাতক এই উৎ কট উচ্চারণে ইংরিজি বলে চালাবেন! বাড়ি ফিরে এসে মিসেস ভেনাসকে বললাম যে, গ্রীষ্মকালের জন্য ঘরটা আমি ছেড়ে দেবো।

'ভালই হল সঞ্জু, আমি এই সুযোগে ঘরটা সারিয়ে রং টং করে ফেলবো। কিন্তু কোথায় যাবে ভাই?'

'স স স - সেকথা বলতে মানা!'

চারখানা স্টেশন ওয়াগন মোটরগাড়িতে জুলাই-এর গোড়ায় একদিন আমাদের ছজনের একটি দল শিকাগো থেকে পশ্চিমের হাইওয়ে ধরে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে বেরিয়ে পড়লো। দলের নেতা ট্রুম্যান স্টার্ক, পদার্থবিদ রাসেল বনহাম ও ব্যাক্টেরিওলজিস্ট জেরি গুটর, রসায়নের লোক আমি আর ইনস্ট্রুমেন্ট টেকনিশিয়ান স্যাম উইনবুশ এবং ষষ্ঠ ব্যাক্তি অধ্যাপক সুশোভন রায়। চলার পথে আইওয়া ও নেব্রাস্কার মসৃণ ভুট্টার ক্ষেত দেখে দেখে যখন দৃষ্টি একেবারে ক্লান্ত এবং মনে হচ্ছে পথ আর ফুরোবে না, তখন অকস্মাৎ দিগন্তে সকালের রুপোলি কুয়াশার গায়ে চোখে পড়লো যেন পটে আঁকা ছবির মতো কলোরাডোর পর্বতমালা। আরও কিছুটা এগোতেই যেন আর চোখ ফেরাতে পারি না। সবুজ উপত্যকা, বিস্ময়কর ক্যানিয়ন, অজস্র রঙিন বুনোফুলে ঢাকা বনস্থলী-- যার নিষ্কমপ ছায়া কাকচক্ষু হ্রদের জলে।

প্রফেসর স্টার্ক অত্যন্ত দিলখোলা মজার লোক । 'জেরি, মরুভূমিতে গিয়ে পড়বার আগে কিছুটা আরাম করে নেওয়া যাক। আজ রাত্তিরে এখানেই তাঁবু গাড়ো।'

হ্রদের ধারে আমাদের তাঁবু পড়লো। মোটরবোটে করে সারা বিকেলে আমরা হ্রদটাকে তো চষে বেড়ালাম, সন্ধের পর তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বেলে পবিত্র আড্ডা। আশ্চর্য জায়গা। এখানে দেশ, কাল, সময়ের কথা বাতিল। রেডিও-টেলিভিশনের অকারণ হৈ-হট্টগোল নেই। আগুনের তাতে কফি গরম করে নিয়ে তার মৌজে পাহাড়ের গল্প চলল অনেক রাত পর্যন্ত।

রাত তখন নিশুতি। ক্রমে আশেপাশের তাঁবুতে সাড়া-শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ক্বচিৎ কখনো পাখিদের কর্কশ চিৎ কার অথবা ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা যায়। ঘুমানোর ব্যাগ থেকে চোখ মেলে বাইরে তাকিয়ে দেখি দুর্গপ্রাকারের মতো চারদিকে অন্ধকার, গাঢ় সবুজ পাহাড় এবং এখানে-সেখানে ছড়নো ঋজু পাহারাদার গাছের সারি। সন্ধ্যায় আকাশে তারা ছিল। এখন কোথা থেকে যেন খ্যাপা ঐরাবতের মতো অজস্র কালো মেঘ ছুটে এসেছে শোঁ শোঁ করে। ক্রমে মনে হল, যেন আকাশের বিচিত্র শামিয়ানা কে আলকাতরায় লেপে দিয়েছে; অন্ধকারে আমার হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে কোথা থেকে যেন একটা ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল শিঁ ই ই ই - প্রথমে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মতো, পরে জোর হতে হতে শেষে প্রায় তীব্র জেট বিমানের গর্জনের ম তো।   অকস্মাৎ আলোয় যেন চারিদিক ভরে গেল। স্পষ্ট দেখলাম একটা অদ্ভুত জ্বলন্ত গোলার মতো বস্তু সেই উপত্যকার উপরে। প্রায় সেই সঙ্গে আকাশে যেন বিদ্যুৎ চমকাল - আশ্চর্য! বজ্রের কোনও আওয়াজ নেই। কেবল কুড়ি-পঁচিশ সেকেন্ডের জন্য একটানা মেশিনগানের আওয়াজের মতো একটা অদ্ভূত শব্দ। বিদ্যুতের ঝলক যেন দক্ষিণে আমাদের কোনো একটা তাঁবু ছুঁয়ে গেল। তারপর সেই উড়ন্ত বিদ্যুতের পিন্ড যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

তারপর সব চুপ! ঘটনাটা এত আকস্মিক যে, কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো শুয়ে রইলাম। তারপর লাফিয়ে উঠে গিয়ে পাশের তাঁবুতে সুশোভনবাবু ও রাসেলকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুললাম: ‘স্যার, শিগগির উঠুন, শিগগির। রাসেল, ওয়েক আপ কুইক।’

‘কী ব্যাপার সঞ্জয়? র‍্যাটল সাপ না চোর ছ্যাঁচোর?’

‘না না না ও সব কিছুই নয়, একটা অদ্ভূত উড়ন্ত আগুনের পিন্ড।’

‘উড়ন্ত পিন্ড - স্বপ্ন দেখছিলে নিশ্চয়! যেহেতু মার্কিনি মহাকাশ সংস্থার হয়ে কাজ করছ, তুমি উড়ন্ত পিন্ড দেখবে এ আর আশ্চর্য কি!’ রাসেল আর সুশোভনবাবু পারলে আমাকে গুলি করেন।

‘আচ্ছা ঐ কোণার তাঁবুটা কার বলো তো?’

‘কেন ওটা তো প্রফেসর স্টার্কের।’

আমাদের হই চই শুনে স্যাম ও জেরি বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে, আরেক দফা ঠাট্টা ও পরিহাসের পালা চললো।

ভীষণ রাগ ধরে গেল ছেলেগুলোর উপরে। বলে কি, ‘তোমরা ভারতীয়রা সব পারো। কফি খেয়ে মাতাল হয়ে বেহুঁশ হয়ে ভুল দেখা কি আর কারো পক্ষে সম্ভব?’

চুপচাপ এসে শুয়ে পড়লাম আবার। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। অনেকদিন পর দেশের স্বপ্ন দেখলাম - সেই হাওড়ার ব্রিজ, গঙ্গার পাড়, সন্ধ্যার হাওয়া!

কে যেন ডাকে পেছন থেকে, ‘সঞ্জয়, সঞ্জয় !’ধড়মড় করে উঠলাম, রোদে চারদিক ভরে গেছে! সঙ্গীরা ডাকছে-- সময় নেই, এখুনি বেরোতে হবে। হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলাম।

কলোরাডোর সীমানা পেরোতেই পাহাড়ের রং বদলালো। মখমল সবুজের আস্তরণ সরে গিয়ে অল্প ধূসর বিবর্ণ মাটি দেখা দিয়েছে। কোথা থেকে যেন রুক্ষ পাহাড় সামনে এসে হাজির হলো।

সারাদিন পথ চলে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম সল্ট লেক সিটিতে। পথে বন্ধুরা তো ঠাট্টা করে আমাকে ভীষণ ক্ষেপিয়েছে। এসব আমাকে সহ্য করতেই হবে এখন সারা গ্রীষ্ম। এমনকি প্রফেসর স্টার্ক পর্যন্ত কফি খাবার সময় বলেছিলেন: ‘রাস, সঞ্জয়কে আর কাপ ডিশ দেওয়ার দরকার নেই। ওসব এখন উড়ে আসবে ওর কাছে।’

কথা ছিল সল্ট লেক সিটিতে আমরা ঘন্টা পাঁচেক থেকে সোজা রাত্তিরে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে বেরিয়ে যবো। সন্ধের পর আমরা এখানকার দ্রষ্টব্য জায়গা মরমনদের মন্দির দেখে ফিরে এসে শুনি, প্রফেসর স্টার্কের ভীষণ মাথা ধরেছে। উনি আর গাড়ি চালালেন না, গোটা কয়েক অ্যাসপিরিন খেয়ে উনি পেছনের সিটে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকারে তীরবেগে গাড়ি ছুটলো রাসেলের হাতে।

সকালে মনে হল যেন আমরা এসে পড়েছি অন্য কোনও গ্রহে। অবিন্যস্ত পাহাড়-গহ্বর-মরুভূমি মাইলের পর মাইল। পরিচিত পৃথিবীর চিহ্ন কেবল ক্বচিৎ কদাচিৎ এক-একটি

টেলিগ্রাফের পোলে আর পথের নিশানা দেখানো সাইনবোর্ডে। এই ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে আমাদের তিন মাস কাটাতে হবে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে বলতে পারবো আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে বেশি দূরে নয়!

একটা ছোটো বাংলোয় আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হলো। জায়গাটার নাম শোশোন। সবচেয়ে কাছের বড়ো শহর নেভাদা রাজ্যের লাস ভেগাস। মরুভূমির একটা বিচিত্র রূপ আছে। সর্বগ্রাসী বালির সমুদ্র প্রাণের শেষ চিহ্নটুকুও গ্রাস করে নিয়েছে। যে গাছপালাগুলোকে গ্রাস করতে পারেনি তারাও যেন যাদুমন্ত্রে পাথর হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কাজের এলাকা পরিদর্শন করতে। যে সব যন্ত্রপাতি মঙ্গলে পাঠানো হবে সেগুলোর প্রথমে পরীক্ষা হবে এই মরুভূমিতে। গরম শুকনো বালিতে এই সব সূক্ষ্ম মিটারগুলো বিকল হয়ে পড়ে কিনা দেখতে হবে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত দেহে আমরা বারান্দায় বসেছি। সুশোভনবাবু ছাড়া আর সকলেরই হাতে বিয়ারের বোতল। ছেলে ছোকরার দল হৈ চৈ করছে। স্যাম একটা গিটার এনেছিল। নিগ্রো লোকসঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলছে তাতে।

প্রফেসর স্টার্ক একমনে একটা বই পড়ছিলেন। হঠাৎ বইটা বন্ধ রেখে সুশোভনবাবুকে বললেন: 'প্রফেসর রায়, আমার গলাটা যেন ব্যথা করছে, গাটাও ম্যাজম্যাজ করছে। আমি শুতে চললাম। কাল রবিবার। ছেলেগুলোর কাল ছুটি। সোমবার থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করা যাবে।'

মরুভূমি হলেও শনিবারের রাত্তির। অ্যামেরিকান ছেলেগুলো জীবন উপভোগ করতে চায় যেখানেই যাক।

সে রাত্তিরে আর রান্নাবান্না হলো না। সেই দিনের বেলায় বানানো চিকেন স্যান্ডউইচ আর ঠাণ্ডা বিয়ার খেয়েই ওরা রাত কাটাবে।

বেশি হুল্লোড় আমার ভাল লাগে না। বারান্দায় এসে বসলাম। ধূ ধূ প্রান্তরে যেন ভূতুড়ে ভাব। একা বসে থাকতে থাকতে ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়তে লাগলো সেই কলোরাডোর রাত্রি - জ্বলন্ত আলোর পিন্ড, গা শিরশির করে দেওয়া অশ্রুতপূর্ব আওয়াজ, যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

রবিবার কত বেলা পর্যন্ত যে সকলে ঘুমিয়েছি কোনও ইয়ত্তা নেই। বেলা একটার সময় উঠে দেখি জেরি কমলালেবুর রস ও ডিমভাজা টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে। ভুলে গেছিলাম যে ওর আজ রান্নার পালা। কিন্তু টেবিলে পাঁচজনের জায়গা দেখে একটু বিস্মিত হলাম।

'কী ব্যাপার জেরি, কে খাবে না?'

'ও, প্রফেসর স্টার্কের জ্বর হয়েছে। উনি বিছানায়।'

'জ্বর! কতো জ্বর?'

'টেমপারেচার খুব বেশি নয়, কিন্তু গা হাত পায়ে অসম্ভব ব্যথা।'

'একী, মরুভূমিতে এশিয়ান ফ্লু?'

'কী জানি, মনে হয়, দু-একদিনে ভাল হয়ে যাবে। এমনিতে খোশ মেজাজেই আছেন।'

আমরা মাঝখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে এলাম। গলার ব্যথাটা বেড়েছে। ঘন ঘন অ্যান্টিসেপ্টিক লজেন্স খাচ্ছেন।

পরদিন সকালে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, জ্বর খুব বেশি। প্রায় একশো চার। সুশোভনবাবু ও রাসেল প্রজেক্টের কাজে লেগে গেল। আমি রইলাম প্রফেসর স্টার্কের কাছে। স্যাম ও জেরি গেল লাস ভেগাস শহরে একটা ডাক্তার ধরে আনতে।

বেলা তখন বারোটা। বসে আছি একটা বই মুখে করে। প্রফেসর স্টার্ক জ্বরে অচৈতন্য বললেই চলে। খালি মাঝে মাঝে জল খেতে চাইছেন আর গলা দেখাচ্ছেন, মনে হয় অসহ্য যন্ত্রণা।

'প্রফেসর গ্রীনবার্গ-----'

'একী, কাকে ডাকছেন প্রফেসর স্টার্ক?'

'----আপনার কি ব্যান্ড লাইফ ডিটেক্টরটার আর কোনো দরকার নেই! হা! হা! আপনি ভেবেছিলেন মঙ্গলগ্রহে ব্যাক্টেরিয়া সংগ্রহ করবেন। আপনাকে আর ৭ কোটি কিলোমিটার দৌড়ে যেতে হবে না।'

কী সর্বনাশ! জ্বরের ঘোরে ভদ্রলোক ভুল বকছেন, একটুকরো বরফও নেই যে জ্বর কমাই।'

'----কী বললেন, প্রমাণ চাই আপনার? ইউ ফুল, কাম টু কলোরাডো। ইয়েস আমি আপনাকে দেখাবো। আপনারা সারা জীবন ধরে তর্ক করুন। আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে - উঃ কী যন্ত্রণা, আর সহ্য করতে পারছি না - আঃ '

কী করি, ভদ্রলোক প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

বাইরে ঘস্ করে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ওই ওরা ডাক্তার নিয়ে এসে পড়েছে। না, সুশোভনবাবু আর রাসেল।

'সঞ্জয়, প্রফেসর স্টার্ক কেমন আছেন?'

'অবস্থা খুব ভাল বুঝছি না স্যার, ডাক্তার এসে পড়লে বাঁচি।'

'তাইতো, লাস ভেগাস তো খুব দূরেও নয়। আচ্ছা, একী। মনে হয় প্রফেসর স্টার্কের গলা অসম্ভব ফুলেছে।'

বেলা দেড়টার সময় ওরা ডাক্তার নিয়ে ফিরলো। প্রফেসর স্টার্ককে দেখে ডাক্তারের মুখ অন্ধকার গম্ভীর হয়ে এলো। প্রায় আধঘন্টা ধরে ওঁকে পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেনঃ এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে - অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।'

আমরা সবাই ডাক্তারকে ঘিরে ধরলুম।

'কেন, কেন ওঁর কী হয়েছে?'

'যতদূর সন্দেহ হচ্ছে - লিউকিমিয়া!'

ঘরের মধ্যে বাজ পড়ালেও আমরা এর চেয়ে বেশি চমকাতুম না। লিউকিমিয়া - রক্তের ক্যানসার। এ যে মারাত্মক ব্যাধি!

লাস ভেগাস বড়ো অদ্ভুত শহর। জুয়াড়ি, ফিল্মস্টার, ক্যাবারে আর্টিস্ট এবং ট্যুরিস্টদের ভিড়ে শহর সবসময় পূর্ণ। সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হাসপাতালে প্রফেসর স্টার্ককে পৌঁছে দিয়ে আমরা কতকটা উদভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ ঘুরলাম। বিকেলের আগে আর আমাদের দেখতে দেবে না। একটা কফিখানায় বসেছি সকলে কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য। জেরি উঠে গেল হাসপাতালে টেলিফোন করতে।

'স্যার এখন কী হবে?' আমরা শোশোনে ফিরে যাবো?'

সুশোভনবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'ওঁকে একটু ভালো দেখেই আমরা ফিরবো! উনি পরে আসবেন। আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।'

জেরি ফিরে এল। একেবারে ভেঙে পড়েছে ছেলেটা-- ‘ইয়েস, লিউকিমিয়ার শেষ স্টেজ। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা।’ হঠাৎ আমাদের মাথায় যেন কে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল।

মৃত্যু আমি খুব বেশি দেখিনি। কবে ছোটবেলায় ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন, তাও পরিণত বয়সে। এরকম সুস্থ একটা তাজা মানুষকে মৃত্যুর মুখোমুখি দেখে ভয়ে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি, প্রফেসর স্টার্কের হাড়ের মজজায় কর্কট কোষগুলো! কুরিয়ে কুরিয়ে লাল রক্তকণাগুলো খেয়ে ফেলছে। তিল তিল করে মানুষটাকে মেরে ফেলছে। কীসের অপরাধে? কেন এমন হয়?

সন্ধের মুখেই সব শেষ হোল। ধীরে ধীরে আমরা সবাই গিয়ে একবার দেখে এলাম। সমস্ত যন্ত্র ণার শেষে এখন এক অপূর্ব প্রশান্তি প্রফেসর স্টার্কের মুখে।

সুশোভনবাবু একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। দুটি মানুষে ভারি ভাব ছিল। প্রফেসর স্টার্কেরই এতদিনের চেষ্টায় উনি এদেশে এসেছেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নিজেরা কত প্ল্যান করেছেন কাজের - এখন যেন গ্রহচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে। হোটেলের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছেন। আমি ঘরে ঢুকে ওঁর মাথায় হাত রাখতে চোখ মেললেন: ‘ও সঞ্জয়, তুমি কঠোপনিষদ পড়েছ কখনো?’

‘হ্যাঁ স্যার, এম এস সি পড়বার সময় ঝোঁক ছিল।’

খুব মৃদুস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন সুশোভনবাবু।

‘স্যার, এ দূরন্ত ব্যাধির কারণ কী?’

--আমার মাথায় তখনও ঘুরছে প্রফেসর স্টার্কের জ্বরের ঘোরের প্রলাপ এবং সেই সঙ্গে কলোরাডোর সেই রাত্রি - আকাশের অজানা উড়ন্ত উজজ্বল নীলাভ আলোর পিন্ড।

সুশোভনবাবু কী যেন ভাবলেন দু মিনিট। তারপর বললেন: ‘ডাক্তারি’ মতে অনেক কারণ হতে পারে। এক নম্বর: মারাত্মক রশ্মির বর্ষণ। দুশো ইউনিটের বেশি রশ্মি গায়ে লাগলে হতে পারে। জাপানের হিরোশিমার
পারমাণবিক বিস্ফে ারণের পর এমন কয়েকটি কেস দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এর জন্যে দরকার এক বিরাট বিস্ফোরণ। দু-নম্বর: উত্তরাধিকার সূত্রে রক্তের মধ্যে একজাতের অস্বাভাবিক ক্রোমোসোম পাওয়া গেলেও এ ব্যাধি হতে পারে।

‘আরেকটি কারণ হতে পারে - সেটি এক বিশেষ জাতের ভাইরাসের আক্রমণ। এ সমপর্কে অ্যামেরিকায় কিছু কিছু প্রমাণ আছে। লিউকিমিয়াগ্রস্ত রোগীদের দেহ থেকে এক বিশেষ ভাইরাস সংগ্রহ করে ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিট্যুটের জন মোলোনি কিছুদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে।’

‘ঠিক কথা, নিউইয়র্কের ব্রংস হাসপাতালে এলবার্ট বার্জ এ সমপর্কে কিছু জানেন। প্রফেসর স্টার্কের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে কোনও ভাইরাস সংক্রমণ লুকিয়ে আছে কি না তার হদিশ ওই রকম একজন লোকই করতে পারবে। দাঁড়াও -’

হঠাৎ উত্তেজিতভাবে সুশোভনবাবু উঠে বসলেন - ‘অ্যালবার্ট বার্জকে নিউইয়র্কে টেলিফোন করবো - হ্যালো, লং ডিসটন্স প্লিজ, আমাকে নিউইয়র্ক সিটিতে ব্রংস হাসপাতাল দিন - কী, এক ঘন্টা দেরি হবে? না! না! অতো দেরি করলে চলবে না। এটা আর্জেন্ট।’

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন সুশোভনবাবু। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। কীসের যেন একটা হারানো সূত্র খুঁজে পেয়েছেন।

লাস ভেগাসের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হাসপাতালের ডাক্তার রবার্টসকেও ফোনে ডাকলেন, 'ডক্টর আমি প্রফেসর স্টার্কের টিমের প্রফেসর রায় বলছি। প্রফেসর স্টার্কের যে সব রক্তপরীক্ষার মাইক্রোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো যত্ন করে রেখে দেবেন। দেখা হলে কারণ বলবো।

অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন ঘরের মধ্যে।

'স্যার একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।'

চমকে উঠলেন যেন সুশোভনবাবু, 'কী কথা?'

'আমার মনে হয় প্রফেসর স্টার্ক নিজের মৃত্যুর কারণ মরবার আগে জানতে পেরেছিলেন। উনি প্রলাপের মধ্যে যা বলছিলেন------------'

ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল, এক লাফে সুশোভনবাবু রিসিভারটা তুলে নিলেন, 'হ্যালো, ডক্টর অ্যালবার্ট বার্জ আছেন? কী, ওঁকে বিরক্ত করা যবে না? প্লিজ, দিস ইজ মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট'- কয়েক মিনিট নীরবতা - 'হ্যালো, ডক্টর বার্জ, দেখুন আমি ডক্টর রয় ফ্রম ইন্ডিয়া। আমি প্রফেসর স্টার্কের বন্ধু।'

'ও আপনি ওঁর মৃত্যুসংবাদ তাহলে সান্ধ্য কাগজে দেখেছেন। ইয়েস, আমি ভাইরাস সন্দেহ করছি কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাইরাস নয়। কী বললেন, আপনি আসছেন এখানে? নেক্সট প্লেনে? খুব ভালো কথা, সোজা সেন্ট অ্যানড্রুজ হাসপাতালে আসুন, সেখানেই দেখা হবে। মেনি থ্যাংকস্।'

রিসিভার নামিয়ে সুশোভনবাবু এক বিচিত্র হাসি হাসলেন, 'ফোবোস কথার মানে জানো, সঞ্জয়? ফোবোস মানে ভয়। মনে হচ্ছে এতদিনে আমরা সত্যি সত্যি যুদ্ধদেবতা মার্সের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছি।'

হাসপাতালে সকাল ন'টায় পৌঁছে দেখি ডক্টর রবার্টস্ ডক্টর বার্জের জন্য অপেক্ষা করছেন। কত অসংখ্য রক্তকণার ছবি, চার্ট, মাইক্রোগ্রাফ থরে থরে সাজানো। রাত্তিরে সুশোভনবাবুর সঙ্গে কথা হওয়ার পর ডক্টর বার্জ ওঁকেও ফোন করেছিলেন শুনলাম।

সাড়ে নটায় ডক্টর বার্জ এসে পৌঁছোলেন। চমৎকার বুদ্ধিদৃপ্ত চেহারা, দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। পৌঁছোবামাত্র কাজে ডুবে গেলেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে দুটি ডাক্তারের আলোচনার মধ্যে আমাদের ঠাঁই মিললো না।

বাইরে রিসেপশন রুমে বসে আমি আর সুশোভনবাবু এক রাজ্যের ম্যাগাজিন উল্টেপাল্টে দেখেও আর
সময় কাটাতে পারছি না, এমন সময় দেখি একটি নার্স এসে ডাকছে আমাদের। প্রফেসর বার্জকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখলাম।

'দেখুন প্রফেসর রায়, লিউকিমিয়ার ভাইরাসের থিওরিটা খুব আধুনিক হলেও ইতিমধ্যে আমরা নানা জাতের ভাইরাস লিউকিমিয়াগ্রস্ত রোগীদের রক্ত থেকে সংগ্রহ করেছি, সাধারণত এই ভাইরাসগুলোর ছ' কোণা মাথা এবং সাপের মত দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট, আগে দেখা ভাইরাসগুলোর সঙ্গে কোনও মিল নেই। অন্তত তিনচার মাস ধরে গবেষণা না করলে এগুলোর স্বরূপ আমরা জানতে পারবো না। ইতিমধ্যে এগুলো কোথা থেকে এসেছে তাও আমাদের খুঁজতে হবে।'

সুশোভনবাবু আর কোন কথা বললেন না। ডক্টর বার্জকে সংক্ষেপে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি চলে এলেন হোটেলে। গম্ভীর মুখে আমাকে বললেন, 'ছোকরাদের সকলকে ডাকো সঞ্জয়, কথা আছে।'

ওঁর ঘরে সকলকে জড়ো করতে বেশি সময় লাগল না। 'ওয়েল বয়েজ! আমরা আজ বিকেলেই শোশোন ফিরছি, জেরি, তোমাকে খুব খাটতে হবে এবং এখন থেকে তুমি আর একজন সাধারণ ব্যাক্টিরিওলজিস্ট নয়, তোমাকে একজন পাকা ভিরোলজিস্টের মত কাজ করতে হবে।'

'প্রফেসর রায়, কিন্তু আমি জীবনে মাত্র একটুখানি হেমোফাইলাস ভাইরাস নিয়ে কাজ করেছি, সে জ্ঞান দিয়ে----'

'তাতেই চলবে, সময় আমাদের হাতে নেই, আমাদের এখুনি যেতে হবে। আর ভালো কথা, সকলকে স্টেরিলাইজেশন সমপর্কে সজাগ হতে হবে, কোনও কিছু খালি হাতে কেউ ছোঁবে না, দরজা জানালা সমপূর্ণ বন্ধ রেখে স্টেরিলাইজড বাতাস ভেতরে চলাচলের বন্দোবস্ত করতে হবে। যে স্পেসস্যুটগুলো টেস্টের জন্য আনা হয়েছে সেগুলো এবার কাজে লাগবে। একটা ভাইরাসপ্রুফ মোটরগাড়ি আমি সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হাসপাতালের মারফত সংগ্রহ করেছি। '

বন্ধ্যা পৃথিবীতে পথ চলা আবার শুরু হল। আমাদের গাড়ির ভেতরে বাইরের হাওয়া শোধিত হয়ে এত কম ঢুকছে যে তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে গাড়ি চলেছে, হাড় শুকোনো বাতাসে জলের গন্ধ পর্যন্ত নেই। বাঁকা ঘোরানো সিঁড়ির মত পথ দিয়ে ধূসর পাহাড়ের গায়ে আমরা উঠছি ওপরে। বালির ঝড়ে গাড়ি চালানোই দুষ্কর।

আচ্ছন্নের মত কতক্ষণ চলেছি জানিনা। ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার ফ্যাকাশে আলোয় পাহাড়ের গায়ে এক বিচিত্র প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের ছবি যেন দেখতে পাচ্ছি। নীচে ধূ ধূ করছে বালির উপত্যকা--ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালি বা মৃত্যুর উপত্যকা!

অকস্মাৎ দূরে কতকগুলো বিন্দু দেখতে পেলাম। প্রথমে যেন আলোর বিন্দু--তারপর জ্বলন্ত পিণ্ডের মত অদ্ভুত ভয়াবহ তাদের রূপ।

'জোরে গাড়ি চালাও স্যাম। দে আর হিয়ার।'

এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি--যেন বৈদ্যুতিক আলোর পিণ্ড--ঠিক সেই কলোরাডো পাহাড়ের রাত্রির মত। একটি নয়, বোধ করি পাঁচটি ছ'টি হবে। কিন্তু একি, ছায়াচিত্রের মত দ্রুততায় সরে যাচ্ছে ওগুলো।মরুভূমির মধ্যে আমরা প্রবেশ করবার আগেই মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল যেন।

শোশোনে আমরা যখন পৌঁছোলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমির প্রান্তরের মধ্যে এক টুকরো ওয়েসিসের মত আমাদের বাংলোটা পড়ে রয়েছে। সুশোভনবাবুর কথায় গাড়ি থেকে নামবার আগে আমরা আপাদমস্তক ঢেকে নিলাম লাস ভেগাস থেকে বয়ে আনা স্টেরিলাইজড্ পোশাকে। অমঙ্গলের ছায়ায় আমাদের প্রত্যেকের মুখ শবযাত্রীদের মত কঠিন। কাল সকাল থেকে আমাদের যেন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হবে।

বাংলোর সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে স্টেরিলাইজার এয়ারকণ্ডিশনারটা চালিয়ে দেয়া হল। তারপর আমরা পোশাক ছাড়লাম। সকালের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবার জন্য আমরা রাতের খাওয়ার পর বসলাম।

'প্রফেসর রায়, সঞ্জয়কে যে জ্বলন্ত পিণ্ডের জন্য ঠাট্টা করেছিলাম, আজ আমরাও তা দেখলাম। আচ্ছা , এমনও তো হতে পারে যে আমরা রৌদ্রে অতখানি পথ চলবার পর মরুভূমির মধ্যে মরিচীকার মত কিছু দেখেছি।'

'হতে পারে স্যাম, কাল সকালেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আমরা একটা কথা সমপূর্ণ ভুলে যাচ্ছি। আমরা যেমন মঙ্গলগ্রহের উপরে মহাকাশযান পাঠিয়ে সেখানকার খবর সংগ্রহ করতে চেষ্টা

করছি, যদি মঙ্গলগ্রহে একটি অনুরূপ শক্তিশালী সভ্য সুশিক্ষিত সমাজ থাকে তারাও পৃথিবী সমপর্কে অনুরূপ চেষ্টা করবে। অ্যামেরিকান মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের যে অল্প কয়েকজন মঙ্গলগ্রহের এই সম্ভাব্য বিষয়টি বিশ্বাস করতেন, প্রফেসর স্টার্ক ছিলেন তাদের একজন।

'আপনি কি বলছেন, ওরা আমাদের প্ল্যান জানে এবং সেইজন্য পৃথিবীর সাধারণ সংবাদ সংগ্রহ ছাড়াও ওদের আসল লক্ষ্যটা আমাদের দিকে?'

'সে প্রমাণ এখন আমার হাতে নেই। কিন্তু আজ রাত হয়ে গেছে। প্লিজ , সবাই কিছুটা ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো। কারণ কালকের দিনটা একটা দীর্ঘ শ্রমের দিন।'

উত্তেজনায় কারোরই প্রায় ঘুম এলো না। কারো বৈজ্ঞানিক মনই জ্বলন্ত পিণ্ড সত্য বলে মেনে নিতে চায় না। মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেন এত কম, সেখানে সভ্য সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করবে কোন্ মূঢ়? সারারাতই অ্যামেরিকান ছেলেগুলো নানা তর্ক-বিতর্কে কাটালো।

সকাল থেকেই কাজ শুরু হোল। ল্যাবরেটরির মত যন্ত্রপাতি সব বার করে গোছানো চলতে লাগলো। প্রথমত বেশ কয়েকটা লম্বা কাচের ভ্যাকুয়াম টিউব বালির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ করানো হবে। পরে সেই টিউবগুলোর মাথার দিকটা ভেঙে ফেললেই টিউবের মধ্যে বালির স্যামপলগুলো ঢুকে যাবে। তারপর সেই বালিগুলো কালচার করে দেখতে হবে কোন ভাইরাস ওর মধ্যে আছে কিনা। কাজটা এত সহজ মনে হলেও আসলে অত্যন্ত কঠিন, কারণ পুরো জিনিসটা স্টেরিলাইজড্ পরিবেশে করতে হবে, যাতে কিছুই আমাদের দেহের সংস্পর্শে না আসে।

স্যামপল নেওয়ার কাজ করব আমি, সুশোভনবাবু আর রাসেল। এদিকে জেরি ও স্যাম ভাইরাস ডিটেকশানের কাজ করবে স্যামপল পাওয়ার পর।

কখন সূর্য মাথার ওপর উঠলো, তারপর আস্তে আস্তে পশ্চিমে ঢলে পড়লো খেয়ালই ছিল না। সারাদিন আমরা ঘুরে ঘুরে অসংখ্য জায়গা থেকে বালির স্যামপল সংগ্রহ করলাম। নাওয়া-খাওয়ার সময় বা ইচ্ছা, কারোই নেই। কি যেন একটা অসহ্য উত্তেজনা সকলের মনে।

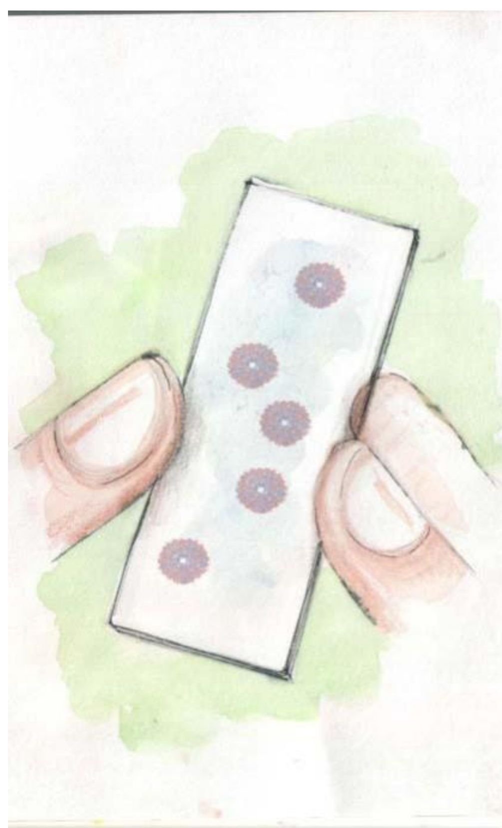

ভাইরাস খোঁজার কাজে জেরি খুব পাকা না হলেও আস্তে আস্তে অনেকগুলো কালচার তৈরি করে ফেলেছে। তারপর মাইক্রোগ্রাফ নেওয়ার দুরূহ কাজ। সারারাত ধরে সেইসব কাজ চললো। স্যাম খুব সুদক্ষ টেকনিশিয়ান বলতে হবে। ভোরের দিকে মাইক্রোগ্রাফগুলো ডেভেলপ করে আমরা দেখতে বসলাম।

কিন্তু একি, কোনটাতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ জেরি চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে এইটাতে!' এক অদ্ভূত মৌমাছির মত সেই ভাইরাসের ছায়া, প্রফেসর স্টার্ককে যা ধ্বংস করছে তিলে তিলে, কিন্তু তার চারদিকে আরও কয়েকটা আশ্চর্য অদেখা ভাইরাস।

আমাদের দৃষ্টি এক নিমেষে ঐ স্লাইডগুলোর দিকে নিবদ্ধ হল। এরপর যা দেখলাম তাতে মেরুদণ্ডের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। মাকড়সার মতো

গিজগিজে বিন্দুর মত এরকম আরেও কতকগুলো ভাইরাস--চোখের সামনে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর ছায়ার মত কিলবিল করছে।

সুশোভনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: 'এটা কত নম্বর কালচার? দুশো তিন! এটা আর এর আগের অন্য দুটোর কালচার--জেরি যত্ন করে সেভ করো। এগুলোই একমাত্র প্রমাণ যে ওরা এখানে এসেছিল। কতক্ষণ ছিল আমরা জানিনা। পৃথিবীর কোথায় কোথায় ওরা নেমেছিল , তাও আমরা বুঝতে পারছি না। ভাইরাসগুলো পরীক্ষা করে এগুলোর সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি আমাদের অবিলম্বে সংগ্রহ করতে হবে। সে দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে, আমাদের ভাগ্য ভালো যে, ওদের অস্তিত্ব আমাদের চোখে পড়েছে। দুদিন আগে হলে আমরা জানতেই পারতাম না। আর আমরা বোধ হয় কেউ ঘরে ফিরে যেতাম না।'

একটু থেমে হেসে বললেন: 'আজ ওরা এসেছিল পরীক্ষামূলকভাবে। এর পরের আক্রমণ হবে আরও ব্যাপক, আরও ভয়াবহ। মানবসমাজের সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন আমাদের হাতে। যে পরিকল্পনায় আমরা মঙ্গলে অভিযান চালাবো ভাবছিলাম, তার আর দরকার কী? তারা আজ আমাদের দরজায়!'

বাইরে তখন মরুভূমির উপর সূর্য উঠেছে। রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন করে প্রথম আলোর চরণধ্বনি শোনা যায় প্রান্তর জুড়ে।

নেরগাল গল্পের লেখক ও তরুণতীর্থ পত্রিকার প্রাক্তন সমপাদক ডক্টর দিলীপ রায় চৌধুরী গল্পের প্রফেসর স্টার্কের মৃত্যু দেখাতে গিয়ে নিজেই আতঙ্কিত ও ভীত হয়েছিলেন। সেদিন তিনি জানতেন না, ভয়াবহ সত্যিকারের অন্য এক মৃত্যুরূপী 'ভাইরাস' তাঁকে ছিনিয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করছে! মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে এনকেফেলাইটিসের 'ভাইরাস' আমাদের প্রিয় প্রাক্তন তরুণসাথী দিলীপ রায় চৌধুরীকে আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের ছিনিয়ে নিয়ে গেল।গল্পের স্টার্কের মৃত্যু যে সত্য হয়ে তাঁরই জীবন পরিণতি হিসেবে এমনই ভয়াবহভাবে দেখা দেবে--কে ভেবেছিলো?

ছবি: মৌসুমী

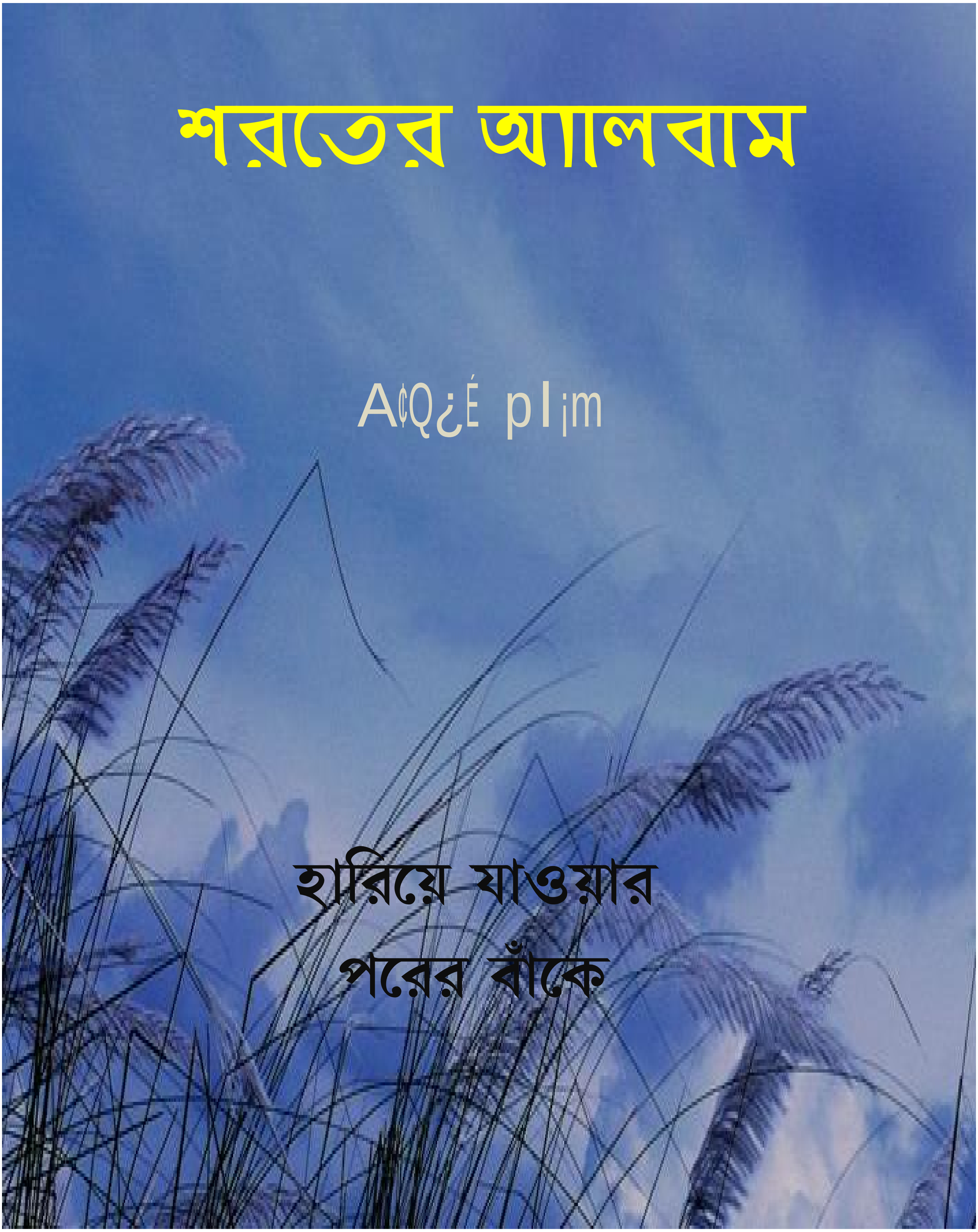
শরতের অ্যালবাম
A¢Q¿É pl¡m
হারিয়ে যাওয়ার
পরের বাঁকে

হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি দেয় খয়েরমারির চর
যেথায় নদী সাজিয়েছিল কাশ দিয়ে তার ঘর

দুইপাড়ে তার সবুজ ছিল মাথায় নীলাকাশ
হারিয়ে যেতে ডাক দিয়ে যায় উদাসী বাতাস

খেয়ার মাঝি গল্প শোনায়
নদীর ভালবাসা
শুনতে শুনতে হারিয়ে যাওয়ার
বাড়বেই পিপাসা

গল্প শোনার জন্য তখন
মেঘের উঁকিঝুঁকি
জুটল হাওয়া কাশের ফলাও
শুনতে নিম্নমুখী

যার ছিল খুব ঘরের টান
নৌকো ছোটায় দ্রুত
আর তখনই পাগলা মেঘের
দলটা পুঞ্জীভূত

ঘনিয়ে এল কাশের মাথায় ভীষণ করাল রূপ
হারিয়ে যাওয়ার দিগ্বিদিকও নির্জন নিশ্চুপ

মেঘগুলো যেই বৃষ্টি হয়ে নিজেকে ঝরালো
ফের হারানোর পথ দেখাতে ফুটল রঙিন আলো

ধীরে ধীরে আঁধার ঘনায় খয়েরমারির চরে
ব্যস্ত যারা ছিল কাজে ফিরল যে যার ঘরে

ক্ষান্ত হল দিনের ভাষা ক্লান্ত হল চর
হারিয়ে যাওয়ার দিনলিপি আপনাতে নিথর

রইল পড়ে কাশের ঘর রইল রূপ-অরূপ
হারিয়ে যাওয়ার পরের বাঁকে মনটা দিল ডুব

মধুমিতা শেখালো

ড: দয়ালবন্ধু মজুমদার

সবাইকে শারদ অভিনন্দন। এরই মধ্যে একটা দু:খের খবর দেবো তোমাদের। তোমাদের এক ছোট্ট বন্ধু , মধুমিতা মৃধা এবারে আর পুজোয় তোমাদের মত নতুন পোশাক পরে হেসেখেলে ঘুরবে না । কারণ, ছোট্ট মেয়ে মধুমিতা মৃধা মারা গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন-এর মেয়ে মধুমিতার বয়স ম াত্রই পাঁচ বছর। গত ২৪ জুন ২০১০ -এর সকালবেলা আটটার সময় তাকে একটা চন্দ্রবোড়া সাপে কামড়েছিল। তার বাবা মা তাকে সেদিনই এগরার সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাকে সাপের বিষের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় বিকেল তিনটের সময়।

সাপের কামড় আর তার ওষুধ পড়বার মধ্যে আট ঘন্টার পার্থক্য থাকায় ডাক্তাররা ভয় পেলেন, তার বৃক্কের বড়ো রকম ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাঁরা মধুমিতার বাবা মাকে বললেন তাকে কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেখনে এর উপযুক্ত চিকিৎসা হতে পারত।

মধুমিতার বাবা মা তাকে বড় শহরে নিয়ে আসেন নি। তার বদলে তাঁরা তাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে সাপের কামড়ের ওঝার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন মেয়ের চিকিৎসার জন্য। পরদিন, ২৫শে জুন লোকের মুখে খবর পেয়ে ড: ত্রিপাঠি নামে একজন ডাক্তার যখন তাকে সন্ধের পরে কলকাতার বড় হাসপাতালে পাঠালেন ততক্ষণে ওঝার মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকে মূল্যবান ত্রিশটা ঘন্টা অপচয় হয়ে গেছে।

কলকাতার হাসপাতালে আমরা সব রকম চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা করতে পারলাম না। ২৬ জুন রাত সাড়ে ন'টার সময় মধুমিতা চলে গেল।

নিজের প্রাণ দিয়ে মধুমিতা আমাদের একটা বড় শিক্ষা দিয়ে গেছে। বিষধর সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে হয় বিজ্ঞানের হাতিয়ার দিয়ে, ওঝার মন্ত্রতন্ত্রে নয়। আর, এই দুর্ঘটনায় সময় বড় ম ূল্যবান। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে প্রতি এক মিনিট প্রতিষেধক পড়তে দেরি হলে বৃক্কের শতকরা এক ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১০০ মিনিট দেরি হলে ক্ষতির পরিমাণ হয় একশো শতাংশ। তবু , ঠিক সময়ে

কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারলে মধুমিতা হয়ত বেঁচে যেত। আমাদের উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে তার বৃক্কের ক্ষতির মোকাবিলা হয়ত আমরা করতে পারতাম । কিন্তু তার বাবা মায়ের অন্ধ বিশ্বাস তাকে বাঁচবার সে সুযোগটাও দিল না।

আমাদের গর্বের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বছরে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ সাপের কামড়ে প্রাণ হারান। অথচ, সাপের বিষের প্রতিষেধক শহর ও গ্রামের সব সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তাহলে মধুমিতারা মরে কেন? তার কারণ হল, এই একুশ শতকে এসেও তার বাবা মার মতন বহু বাবা মা-ই সাপের কামড় খাওয়া মানুষকে চিকিৎসা না করিয়ে আগে নিয়ে যান ওঝার বাড়িতে। তাতে বহু মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।

কেন ওঝাদের প্রতি মানুষের এখনও এত বিশ্বাস জানো? সে-ও একটা মজার ব্যাপার। সাপের কামড়ের যত ঘটনা ঘটে তার মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই নির্বিষ সাপের কামড়। সাধারণ মানুষ অতশত বোঝে না। যেকোন কামড়েই তারা ছোটে ওঝার কাছে। আর সাপের শিকারদের মধ্যে যেহেতু অধিকাংশই নির্বিষ সাপের ছোবল খেয়েছে অতএব তারা স্বাভাবিকভাবেই বেঁচে থাকে। আর ওঝারা তার কৃতিত্ব নেয়। আর তার ফলে সত্যিকারের বিষাক্ত সাপের কামড় যখন খায় ছোট্ট মধুমিতারা তখনও তাদের বাবা মা সেই ভুলের শিকার হয়ে তাকে ওঝার কাছে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে ১২৫ জাতের সাপের মধ্যে মাত্র তিনটে প্রজাতির সাপের কামড় এই বার্ষিক তিন হাজারেরও বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ী। এরা হল, চন্দ্রবোড়া, কোবরা আর কালাচ। তীব্র বিষধর শাঁখামুটি এবং রাজগোখরো বা শংখচূড় পশ্চিমবঙ্গে খুব কমই পাওয়া যায়।

কোবরা হল ফনাতোলা গোত্রের সাপ। তাদের অনেক নাম। যেমন ধরো, গোখরো, কেউটে, খরিশ, গোমা, শামুকভাঙা। এদের তীব্র বিষ নার্ভের ওপর ক্রিয়া করে শিকারের শ্বাসতন্ত্রকে পঙ্গু করে দিয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়।

চন্দ্রবোড়ার আবার ফনা হয় না। তার বাদামি শরীরে চন্দন রঙের গোল গোল ছাপ হয়। বৃক্কের ক্ষতি করে এর বিষ। আর সেইসঙ্গে নষ্ট করে দেয় রক্তের কণিকাদের। এর কামড়ের একটা প্রধান চিহ্ন হল শিকারের শরীরের   নানা অংশ দিয়ে রক্তপাত।

আর দুনিয়ার সবচেয়ে রহস্যময় সাপ হল কালাচ। কালো, লিকলিকে ফনাহীন এই সাপের বিষ সবচেয়ে শক্তিশালী। বাংলার নানান এলাকায় একে নানা নামে ডাকে--যেমন ধরো, শিয়রচাঁদা, কালাচিতি, ডোমনাচিতি, নেওরচাঁদা। যদি কখনো মহাশ্বেতা দেবীর ‘হারুন সালেমের মাসী’ গল্পটা পড়ো, তাতে এই নেওরচাঁদা সাপের নাম দেখতে পাবে।

কালাচের কামড়ের বৈশিষ্ট্য হল, এতে কোন যন্ত্রণা হয়না, কামড়ের জায়গা ফোলে না এমন কি কামড়ের বিশেষ কোন দাগও থাকে না। সাধারণত রাত্রিবেলা মশারি ছাড়া খোলা বিছানায় ঘুমন্ত ম ানুষের ওপর এরা আক্রমণ চালায়।

সকালে উঠে শিকারের পেট ব্যথা হবে, গায়ে ব্যথা হবে, গলায় ও গাঁটে গাঁটে ব্যথা হবে, সঙ্গে থাকবে বমি ও খিঁচুনি। এই লক্ষণগুলোর সঙ্গে যদি দেখি ঝিমোনো চোখের দৃষ্টি আর রোগি যদি বলে রাত্রে সে মশারি ছাড়া বিছানায় শুয়েছিলো তাহলে সন্দেহ করা হয় যে কালাচের আক্রমণের শিকার হয়েছে রোগী।

তা এই হল গিয়ে বিষধর সাপেদের গল্প। তোমাদের সবাইকে জানিয়ে রাখলাম জয়ঢাকের পাতায়। শুধু এই আশাতে যে হয়ত কখনও , কোনদিন, তোমাদের কারো এই জ্ঞানটুকু থেকে হয়তো

একজন লোকও প্রাণে বেঁচে যেতে পারে। হয়ত ধরো কোন গ্রামে বেড়াতে গেছো। সেখানেও তো এমন হতে পারে কোন সাপের কামড় খাওয়া মধুমিতার মতন কোন ছোট্ট এক বন্ধুকে তার বাবা মা নিয়ে চলেছে ওঝার বাড়ি। তখন তুমি যদি সেখানে থাকো, তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বোলো, ‘এমন কাজ করবেন না। ওকে হাসপাতালে নিয়ে চলুন। সাপের বিষের আসল ওঝা আছেন সেইখানে, তিনি হলেন চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী, আর এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হল তাঁর হাতের অ্যান্টিভেনম ইঞ্জেকশন।

পুরাণ কথা

একলব্য

টুপুর

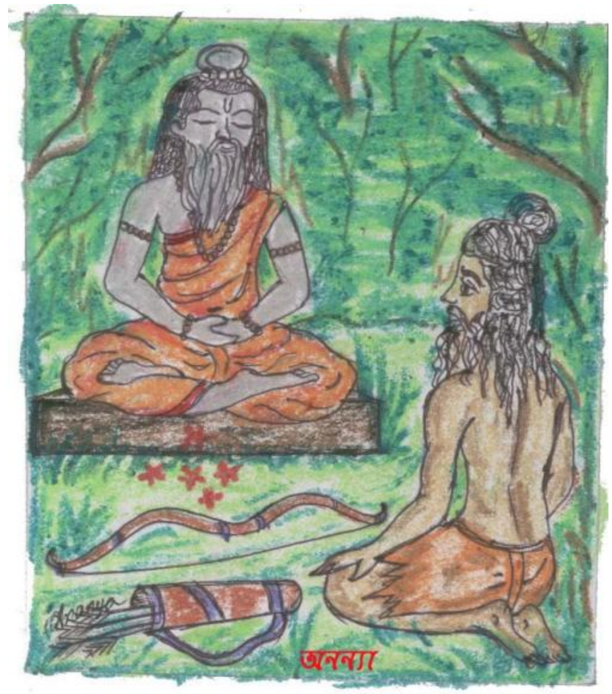

ভীম, দুর্যোধন, অর্জুনদের গুরু বলে তখন দ্রোণের খুব নামডাক। দেশ-বিদেশের রাজা-রাজড়ার লাইন লেগে ছিল দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শেখার জন্য। সবাই চায় দ্রোণের প্রিয় শিষ্য অর্জুনের মতো যাবতীয় অস্ত্রে দক্ষ হতে। তখন অর্জুন একসাথে অনেক অস্ত্র ব্যবহার করে অনেক শত্রুর বিরুদ্ধে একলা লড়াই করতে পারতেন। এমনটা তাঁর ভাইয়েদের মধ্যেও কেউ পারতেন না। তাই সবাই ভাবত দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জুনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অনেক বেশি কৌশল শিখিয়েছেন তাকে।

এইসব রাজা-রাজড়াদের ভিড়ে ছিলেন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুষ-এর ছেলে একলব্য। নিষাদরা জাতের বিচারে ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজাদের তুলনায় বহু নিচের সারির মানুষ। নিষাদরা তো খাঁটি আর্য ছিলেন না। তাদের রক্তে অনার্য ভাগ নাকি আর সব জাতির তুলনায় ছিল সবচেয়ে বেশি। একলব্যকে দেখে দ্রোণের ভয় হয়েছিল যে তিনি নিজে শেখালে এই নিচু বংশের ছেলেটি ক্ষত্রিয় রাজপুত্র অর্জুনকে হারিয়ে দেবে অস্ত্র চালানোর দক্ষতায়। তাই তিনি একলব্যকে অস্ত্র শিক্ষা দেবেন না বলে দিয়েছিলেন।

কিন্তু একলব্য এই প্রত্যাখানে হাল ছেড়ে দেন নি। তিনি জঙ্গলে গিয়ে মাটি দিয়ে দ্রোণের একটা মূর্তি বানালেন। সেই মূর্তিকেই গুরু বলে পুজো করতেন। আর প্রাণপাত পরিশ্রম করে মন দিয়ে অস্ত্র বিদ্যা আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এভাবে বিষয়ের গভীরে ডুবে, গুরুভক্তিতে অবিচল থেকে, ক্রমাগত অভ্যাস করার ফলে খুব শিগগিরই তিনি অনায়াসে ধনুকের ছিলায় তির লাগানোয়, লক্ষ্য স্থির করায় এবং তির ছোঁড়ায় সুনিপুণ হয়ে উঠলেন।

কিছু সময় পরে, একদিন কৌরব, পাণ্ডব ভাইয়েরা সবাই মিলে বনে গেলেন বেড়াতে। তল্পিতল্পা সামলাতে, রান্নাবান্না করার জন্য সঙ্গে গেল একজন কাজের লোক আর তার কুকুর। এদিকে রাজপুত্ররা যখন বনের মধ্যে এখানে সেখানে ঘুরঘুর করছিলেন, আর কাজের লোক করছিল মন দিয়ে রান্না, তখন কুকুরটা একলা বনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে কুকুরটা হঠাৎ ধ্যানে বসা একলব্যকে দেখে। এদিকে তখন দীর্ঘদিনের অযত্নে একলব্যের গা ভর্তি ময়লা, মাথায় জটা, জামাকাপড় ছেঁড়া-খোঁড়া। কুকুরটা খুব জোরে ডাকতে শুরু করল একলব্যকে দেখে। একলব্যের ধ্যান গেল ভেঙে। রেগে গিয়ে একলব্য সাতটা তির পরপর গেঁথে দিলেন কুকুরের খোলা মুখে যেই কুকুরটা ডাকার জন্য হাঁ করল অমনি। কুকুরের মুখ বন্ধ হলো না কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল।

কুকুরটা দৌড়তে দৌড়তে ফিরে গেল কাজের লোকের কাছে। কুরু রাজপুত্ররা দেখে মুগ্ধ হলেন শৈল্পিক তিরন্দাজী। সবাই মিলে হুটোপাটি করে খুঁজে বার করলেন একলব্যকে। মলিন চেহারা জরাজীর্ণ কাপড় পরা মানুষটি তখন আপন মনে ধনুকে একের পর এক তির গেঁথে লক্ষ্যভেদের অভ্যাস করে চলেছেন। রাজকুমারেরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে, তিনি বললেন যে তিনি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুষ-এর ছেলে এবং দ্রোণের শিষ্য।

ফেরার পথে কুরু রাজকুমাররা নিজেদের মধ্যে কেবলই বলাবলি করতে লাগলেন একলব্যের তিরন্দাজীর নৈপুণ্যের কথা। বন থেকে ফিরে সব কথা তারা গুরু দ্রোণকেও জানালেন। দ্রোণ গোপণে একলব্যকে অর্জুনের থেকেও বেশি শিখিয়েছেন এবং স্নেহ করেন ভেবে অর্জুনের খুবই অভিমান হল। তিনি তো দ্রোণকে বলেই ফেললেন যে দ্রোণ অর্জুনকেই বার বার বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন যে তাঁকেই দ্রোণ সবথেকে বেশি স্নেহ করেন, তা সত্বেও সেরা কৌশলগুলো শিখিয়েছেন একলব্যকে। সব শুনে, খানিকক্ষণ ভেবে নিজের কর্তব্য স্থির করলেন দ্রোণ।

তারপর অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রোণ পৌঁছলেন একলব্যের কাছে। তাঁকে দেখেই একলব্য ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন। তারপর আদেশের অপেক্ষায় জোড়হাতে চাইলেন দ্রোণের দিকে। দ্রোণ তখন একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণা চাইলেন একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুল। গুরুভক্তিতে অবিচল একলব্য তখনই কেটে ফেললেন নিজের বুড়ো আঙুল। দিয়ে দিলেন গুরুদক্ষিণা। তারপর চার আঙুলে তিরন্দাজী করতে গিয়ে দেখলেন যে আগের মতো আর পারছেন না। এতে সবচেয়ে খুশি হলেন অর্জুন।

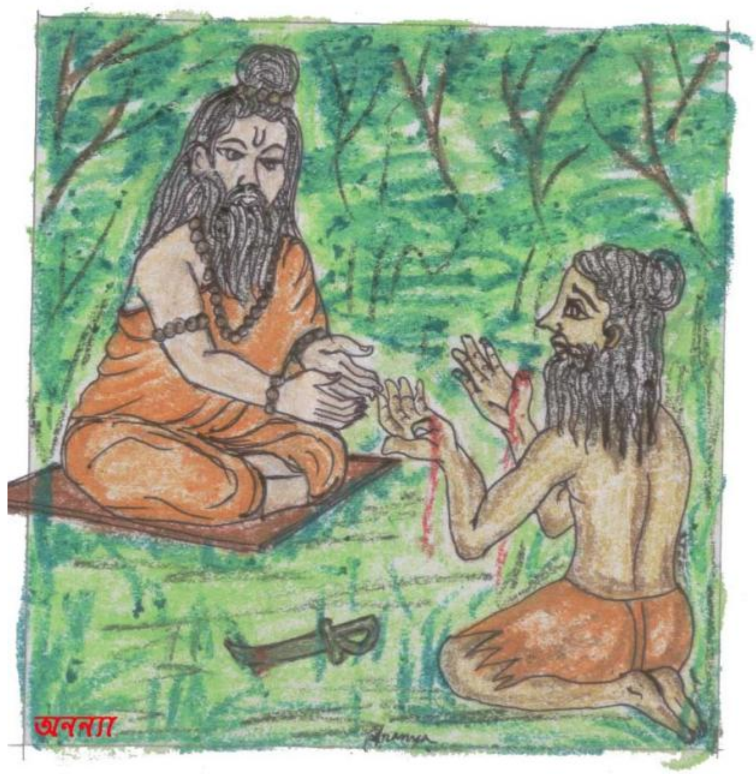

ছবি: অনন্যা

পুরাতনী

ছেলেধরা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেবার দেশময় রটে গেল যে, তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণের উপর রেলের পুল কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছে না। দুটি ছেলেকে জ্যান্ত থামের নীচে পোঁতা হয়ে গেছে, বাকি শুধু একটি। একটি সংগ্রহ হলেই পুল তৈরী হয়ে যায়। শোনা গেল রেল-কোমপানির নিযুক্ত ছেলেধরারা শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চে। তারা কখন এবং কোথায় এসে হাজির হবে, কেউ বলতে পারে না। তাদের কারও পোশাক ভিখিরীর, কারও বা সাধু-সন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়েআয় লাঠি হাতে ডাকাতের মত-- এ জনশ্রুতি পুরানো, সুতরাং কাছাকাছি পল্লীবাসীর ভয়ের ও সন্দেহের সীমা রইল না যে এবার হয়ত তাদের পালা, তাদের ছেলেপুলেই হয়ত পুলের তলায় পোঁতা যাবে।

কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়িতেই কেমন একটা ছমছম ভাব। আবার তার উপরে আছে খবরের কাগজের খবর। কলকাতায় যারা চাকরি করে তারা এসে জানায়, সেদিন বউবাজারে একটা ছেলেধরা ধরা পড়েছে, কাল কড়েয়ায় আর একটা লোককে হাতে-নাতে ধরা গেছে, সে ছেলে ধরে ঝুলিতে পুরছিল। এমনি কত খবর! কলকাতার অলিতে গলিতে সন্দেহক্রমে কত নিরীহের প্রতি কত অত্যাচারের খবর লোকের মুখে মুখে আমাদের দেশে এসে পৌঁছুল। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেইটে বলি।

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুজ্যে-দমপতি। ছেলেপুলে নেই কিন্তু সংসারে ও সাংসারিক সকল ব্যাপারে আসক্তি আঠারো আনা। ভাইপোকে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু আর কিছুই দেন নি। দেবেন এ-কল্পনাও তাঁদের নেই।সে এসে মাঝে মাঝে দাবী করে ঘটি-বাটি-তৈজসপত্র; খুড়ী চেঁচিয়ে হাট বাঁধিয়ে দিয়ে লোকজন জড়ো করেন। হীরু বলে, সেই ভাল--মেরেই একদিন সমস্ত আদায় করব।

এমনি করে দিন যায়।

সেদিন সকালে ঝগড়ার চূড়ান্ত হয়ে গেল। হীরু উঠানে দাঁড়িয়ে বললে, শেষ বেলা বলছি খুড়ো, আমার ন্যায্য পাওনা দেবে কিনা বল?

খুড়ো বললেন, তোর কিছুই নেই।

নেই?

না।

আদায় করে আমি ছাড়ব।

খুড়ী রান্নাঘরে কাজে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বললেন, তা হলে যা তোর বাবাকে ডেকে আন গে। হীরু বললে, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন, তিনি আসতে পারবেন না, --আমি গিয়ে তোমাদের বাবাদের ডেকে আনব। তাদের কেউ হয়তো বেঁচে আছে--তারা এসে চুল চিরে আমার বখরা ভাগ করে দেবে।

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে উভয় পক্ষে যে-ভাষা চলল তা লেখা চলে না।

যাবার আগে হীরু বলে গেল, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব।এই তোমাদের বলে গেলুম। সাবধান!

রান্নাঘর থেকে খুড়ী বললেন, তোর ভারী ক্ষমতা! যা পারিস কর গে।

হীরু এসে হাজির হ'লো রাইপুরে। ঘর-কয়েক গরীব মুসলমানদের পল্লী। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধানো। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মত লাঠি-খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পারে না এমন কাজ নেই। শুধু পুলিশের ভয়েই শান্ত হয়ে থাকে।

হীরু বলল, বড় মিঞা, এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ভায়ের। কাজ উদ্ধার করে দাও আরো বকশিশ পাবে।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ্ মিঞা হেসে বললে, কি কাজ বাবু?

হীরু বললে, এ দেশে কে না জানে তোমাদের দু-ভায়ের কথা! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছ--তোমরা মনে করলে পার না কি!

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্ চুপ্ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই ত সে-যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য হয়ে বলল, কেউ চিনতে পারেনি?

লতিফ বলল, পারবে কি করে! মাথায় ইয়া পাগ বাঁধা, গালে গাল-পাট্টা, কপালে কপাল-জোড়া সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,--লোকে ভাবলে হিঁদুর যমপুরী থেকে যমদূত এসে হাজির হ'লো। চিনবে কি--কোথায় পালালো তার ঠিকানা রইল না।

হীরু তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি তোমাকে আর একবার করতে হবে, দাদা। আমার খুড়ো তবু যাহোক দুটো ভাগের ভাগ দিতে চায়, কিন্তু খুড়ীবেটী এমনি শয়তান যে একটা চুমকি ঘটিতে পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না।ওই পাগড়ি , গালপাট্টা, আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠানে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতে-হুমকি একবার ঝাড়বে, তার পর দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা-কিছু পাওনা ফেঁড়ে বার করে আনব। ঠিক সন্ধ্যার আগে--ব্যাস।

লতিফ মিঞা রাজী হ'লো। লতিফ মামুদ দু-ভাই সাজ-পোশাক পরে আজই গিয়ে খুড়োর বাড়িতে হানা দেবে ঠিক হয়ে গেল। পিছনে থাকবে হীরু।

একাদশী। সারা দিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই করে দিয়েছেন জগদম্বা। মুখুজ্যেমশাই বসেছেন জলযোগে। সামান্য ফলমূল ও দুধ। বেতো ধাত--একাদশীতে অন্নাহার সহ্য হয়না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল দু-ভাই লতিফ আর মামুদ। ইয়া পাগড়ি, ইয়া গালপাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিঁদুর -মাখানো। মুখুজ্যের হাত থেকে পাথরের বাটি

দুম করে পড়ে গেল,--জগদম্বা চীৎকার করে উঠলেন--ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আছো, এসো গো, ছেলেধরা ঢুকেছে।

সুমুখের ছোট মাঠটায় ঘর কেটে কেটে ছোট ছোট ছেলের দল রোজ ফিঞে খেলে, আজও খেলছিল,--তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেখানে পারলে, ছুট দিলে--ওগো ছেলেধরা এসেছে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়েছিল-- সে চাপা গলায় বলল,--আর দেখ কি মিঞা, পালাও। পাড়ার লোক ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলেই নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা শহরের আর কিছু না শুনে থাক, ছেলেধরার জনশ্রুতি তাদের কানে এসেও পৌঁছেছে। চক্ষের পলকে বুঝলে, এ অজানা জায়গায় এরূপ বেশে এই সিঁদুর মাখা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না। সুতরাং তারাও মারল ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি? পথ অচেনা, আলো এসেছে কমে--চতুর্দিক থেকে কেবল সমবেত বহু কন্ঠের চিৎকার,-- ধরে ফ্যাল, ধরে ফ্যাল! মেরে ফ্যাল ব্যাটাদের! ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালালো ঠিকানা নেই, কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে-- সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙে লাফিয়ে পড়ল একটা ডোবায়। তার পর সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ঢিল।যেই মাথা তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবার সে মারে ডুব। আবার ওঠে, আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে আর ইঁট খেয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। সে যতই হাতজোড় করে বলতে চায় সে ছেলেধরা নয়, ছেলে ধরতে আসেনি,--ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে নইলে ওর গাল-পাট্টা কেন?ওর পাগড়ি কিসের জন্য? ওর মুখময় এতো সিঁদুর এলো কোথা থেকে? পাগড়ি তার খুলে গেছে, গাল-পাট্টা একধারে ঝুলছে--কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখময় লেগেছে। এ-সব কথা সে পাড়ের লোকদের বলেই কখন , শোনেই বা কে!

ততক্ষণে কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে--সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্ছে, সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা--তারা ছেলেধরা নয়।

এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে--হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকুর-ধারে। আমাকে দেখে উত্তেজিত জনতা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সবাই সমস্বরে বলতে লাগল, তারা একটা ছেলেধরা ধরেছে। লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার শক্তি নেই--গাল-পাট্টায়, পাগড়িতে সিঁদুরে-রক্তে মাখামাখি--শুধু হাতজোড় করছে আর কাঁদছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, ও কার ছেলে চুরি করেছে? কে নালিশ করছে? তারা বলল, তা কে জানে?

ছেলে কৈ?

তাই বা কে জানে?

তবে এমন করে মারছো কেন?

কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধ হয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেছে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে।

বললুম, মরা ছেলে কখনো বলি দেওয়া যায়?

তারা বলল, মরা হবে কেন? জ্যান্ত ছেলে।

পাঁকে পুঁতে রাখলে ছেলে জ্যান্ত থাকে কখনো?

যুক্তিটা অনেকের কাছেই সমীচীন বোধ হল। এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে সে কথা কেউ ভাববারই সময় পায়নি।

বললুম, ছাড় ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম--মিঞা, ব্যাপারটা সত্যি কী বলো তো?

এখন অভয় পেয়ে লোকটা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে, মুখুজ্যে দমপতির ওপর কারো সহানুভূতি ছিল না, শুনে অনেকের করুণাও হল।

বললুম, লতিফ, বাড়ি যাও, আর কখনো এ'সব কাজে এসো না।

সে নাক মললে, কান মললে-- খোদার কিরে নিয়ে বললে, বাবুমশাই, আর এসব কাজ কখনো না। কিন্তু আমার ভাই গেল কোথায়?

বললুম, ভাইয়ের ভাবনা বাড়ি গিয়ে ভেবো লতিফ, এখন নিজের প্রাণটা যে বাঁচল, এই ঢের।

লতিফ খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনমতে বাড়ি চলে গেল।

অনেক রাতে আর একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঘোষালদের পাড়ায়। তাদের ঝি গোয়ালে ঢুকেছিল গরুকে জাব দিতে। খড়ের ঝুড়ি টানতের গিয়ে দেখে টানা যায় না-- হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ মূর্তি লোক বেরিয়ে ঝি'র পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

ঝি যতই চেঁচায়, বেরোও গো, কে কোথায় আছো,--ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। ভূত ততই তার মুখ চেপে ধরে বলে, মা গো আমায় বাঁচাও--আমি ভূত পেরেত নই, আমি মানুষ।

চিৎ কারে বাড়ির কর্তা আলো নিয়ে লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত--আগের ঘটনা গাঁয়ের সবাই শুনেছে। সুতরাং ছোট ভাইয়ের ভাগ্যে বড়ভাইয়ের দুর্গতি আর ঘটল না, সবাই সহজে বিশ্বাস করলে এই সেই মামুদ মিঞা। ভূত নয়।

ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে--শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে, ছোট মিঞা, সমস্ত জীবন মনে থাকবে বলে এটা রেখে দিলুম। মুখের ওইসব রং-টং ধুয়ে ফেলে এখন আস্তে আস্তে ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞ মামুদ একশো সেলাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। ঘটনাটি ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।

বানান অপরিবর্তিত

ছবি: মৌসুমী

ছোটোবেলায় আমাদের খুব প্রিয় ছিল রাশিয়ান বই। অসম্ভব সুন্দর আর সস্তা সেই সব বইয়ের যেমন গড়ণ , তেমন তার মধ্যেকার গল্প। সেই স্বপ্নের বইগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আর আসেনা তারা। ঠিক করেছি, জয়ঢাকের বুড়ো সমপাদকের ছেলেবেলার সেই সব বইয়ের থেকে এইবারে এক একটা করে ছোটোখাটো গল্প তোমাদের উপহার দেয়া হবে জয়ঢাকের পাতায়।

রাশিয়ান গল্প

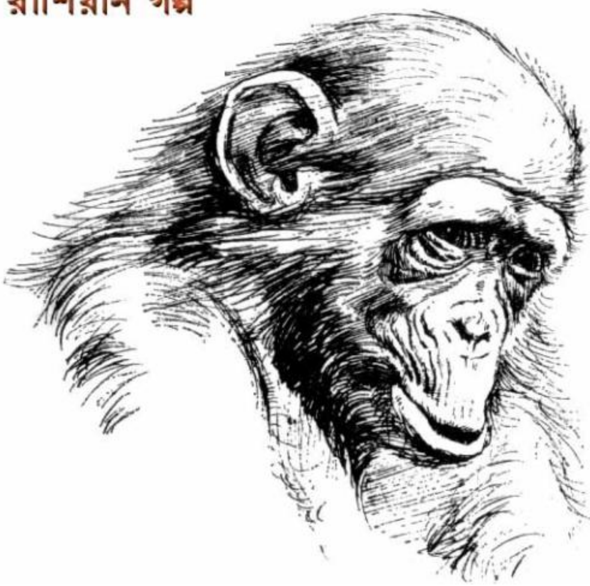

বেলা

ভেরা চাপলিনা
অনুবাদ : রেখা চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় পাল
(আমাদের চিড়িয়াখানা নামের বই থেকে উদ্ধৃত)

একবার চিড়িয়াখানায় একদল বাঁদর নিয়ে আসা হল। তাদের একেকটি একেকরকম: কোনটি খুব ছটফটে, কোনোটির লেজ খুব লম্বা, কোনোটি দেখতে কুকুরের মতো। দলে বেরা আর বেলা নামে দু'টি শিমপাঞ্জিও ছিল।

চিড়িয়াখানায় আগে যেসব শিমপাঞ্জি ছিল, বেরা দেখতে অনেকটা তাদেরই মতো। তবে বেলা কিন্তু মোটেই সেরকম নয় - সে মোটা-তাগড়া, কাঁধগুলো তার চওড়া ও শক্তিশালী, খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছোট বাদামী চোখে। আপনা থেকেই সবার নজর গিয়ে পড়তো তার উপর।

খাঁচায় ছেড়ে দেবার পর বেলা বেশ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো। তারপর গেল দোলনাটির দিকে। লম্বা শক্তিশালী হাত দিয়ে তা ধরে কিছুক্ষণ দোলার পর একলাফে চলে গেল আরেকটি দোলনায় - সার্কাসে যেমন হয় ঠিক তেমনি। কয়েকবার এরকম লাফালাফির পর বেলা মেঝেতে নেমে আস্তে আস্তে শিকগুলোর কাছে এলো, দেখতে লাগলো পরিচারিকা কী করছে।

আশেপাশে কী হচ্ছে তা দেখতে বেলার খুবই ভালো লাগতো। চাবিগুলোর দিকে তার নজর ছিল খুব বেশি। পরিচারিকা যেই চাবির গোছা টেবিলের উপর রাখত অমনি বেলা চেষ্টা করতো তা নিয়ে নিতে। এটা টের পেয়ে মেয়েটি তার চাবির গোছা একটু দূরেই রাখতো যাতে বাঁদরটা নাগাল না পায়। কিন্তু তা সত্বেও এক দুর্ঘটনা ঘটলো।

একদিন মেয়েটি রান্নাঘরে গেল খাবার আনতে। দরজাটি বন্ধ করার সময় ঝাড়ুটি কি করে পড়ে গেল সে তা দেখতে পায় নি। ঝাড়ু মেঝেতে পড়ার আগেই বেলা নিমেষে শিকের কাছে এসে হাজির।

লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে ঝাড়ুটি তুলে নিতে বেলার বেশিক্ষণ লাগলো না। পরে ওটা দিয়ে সে চাবিগুলো টেনে এনে খাঁচা খুলতে শুরু করে। দরজার বাইরের দিকে যখন তালা ঝুলছে তখন ভেতর থেকে তা খোলা খুব একটা সহজ নয়, তবে আমাদের বেলাকে এ কাজটি করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি। খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েই বেলা প্রথমে গেল রান্নাঘরে। ডেকচি খুলে খুলে সব খাবার চেখে দেখলো; যা কিছু তার ভালো লাগলো না তা সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় করে ফেলে দিলো, আর যা পছন্দ

হলো - বেছে বেছে খেলো মনভরে। পেট ভরে গেলে বেলা রান্নাঘরের দরজা খুলে মেজাজে বেরিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গেই বাঁদরটি সবার চোখে পড়লো। রান্নাঘর থেকে একটু দূরে যেতে না যেতেই লোকে তাকে ঘিরে ফেললো, তারপর ছুটে এলেন চিড়িয়াখানার ম্যানেজার, পরিচারক এবং আরও অনেকে।

চারিদিকে এতোগুলো লোক দেখে বেলার হাবভাব গেল একেবারে বদলে। ভয়ে তার কাঁধের আর গলার লোম খাড়া। দাঁত দেখাতে লাগলো, শুরু হল বিকট চেঁচামেচি, লাফালাফি আর আতঙ্ক। তখন একটি বড় জাল আনা হল।

কয়েকজন লোক জাল দিয়ে ধরতে চাইলো পলাতকাকে। কিন্তু বেলা হঠাৎ লোকগুলোর পায়ের নিচ দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। তারপর চটপট উঠে পড়লো একটি গাছে।

চকলেট, আপেল আর কলা দেখিয়ে বেলাকে ডাকাডাকি করে কোন লাভ হলো না। এসব ম জার মজার খাবারের দিকে সে এমনকি তাকালোই না। গাছেই বসে রইলো, ও-জায়গা ছাড়ার কোনো ইচ্ছে তার আছে বলে মনে হলো না।

ডাকতে হল দমকলের লোককে। এরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তাদের সম্ভবত এই প্রথম।

গাড়ি এলো, তাড়াতাড়ি আস্তিন গুটিয়ে ফেললো দমকলের লোকেরা, তারপর একজন লোক জলের একটি মোটা নল বাঁদরটির দিকে তুলে ধরলো। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগলো বেলার গায়ে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, হাত দিয়ে মাথা ঢেকে তাড়াতাড়ি নামতে লাগলো গাছ থেকে।

সবাই ভাবলো এবার বেলা নিশ্চয়ই নিজের খাঁচায় ফিরে যাবে, কিন্তু বেলা ঠিক তা করলো না। সম্ভবত গাছে থাকতেই বেলা অন্য উপায় ভেবে রেখেছিলো। খাঁচায় ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ সে মোড় নিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে পয়োনালী বেয়ে উঠে পড়লো পাশের পাঁচতলা স্কুলের ছাদে। কেউ তার পথ আটকে দাঁড়াবার ফুরসতই পেলো না।

ছাদে উঠে বেলা নিশ্চিন্ত। চালের ধার দিয়ে মহানন্দে বেড়াতে বেড়াতে মজা করে দেখছিল নিচে কী হচ্ছে। এবার বেলাকে ধরা আগের চেয়ে কঠিন, এবং সেও নিশ্চয়ই তা ভালো করে বুঝতে পেরেছিল। বাস্তবিকই পাঁচতলা বাড়ির ছাদে বিশালাকার বাঁদরটিকে ধরা শুধু কঠিনই নয়, বিপজজনকও।

আমাদের একজন কর্মী তাকে নামাতে উঠলো ছাদে। লোকটি চিড়িয়াখানায় অনেক দিন। জন্তুজানোয়ারের স্বভাব-চরিত্র তার খুবই ভালো জানা। বাঁদরটিকে মিছিমিছি না ক্ষ্যাপানোর জন্য সে সহকারীদের চিলেকোঠায় ঢুকে যেতে বললো। তারপর সাহস করে সে গেল বেলার কাছে। এই লোকটি আগে বাঁদরদের দেখাশোনা করতো, তাই সে ভেবেছিলো বেলা তাকে চিনতে পারবে আর ছুঁবে না। এবং সে ঠিকই ভেবেছিল। লোকটিকে চিনতে বেলার দেরি হল না। সোহাগের ডাক ডেকে বাঁদরটি তার কাছে গিয়ে হাত ধরে তাকে টানতে লাগলো পয়োনালীর দিকে, যেন তারই সঙ্গে ওটা বেয়ে নামার জন্য অনুরোধ করছে আর কী। মনে হয় ততক্ষণে ছাদে থাকার শখ তার মিটে গেছে, তাছাড়া তার সারা শরীরও আবার ভিজে জবজবে, ঠান্ডায় বেশ কাঁপছিল।

লোকটি বেলাকে নিজের কোটটি পরিয়ে দিলো যাতে তার সর্দি না হয়। কোটের পকেটে যা কিছু ছিল বেলা সঙ্গে সঙ্গে সব বের করে ফেললো। তবে কোট খুললো না। তারপর আবার সে লোকটির হাত ধরে বসলো, এবার তাকে সে কোনমতেই হাতছাড়া করবে না।

বারকয়েক লোকগুলো চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এসে বাঁদরকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের একটু দেখতেই বেলা ভীষণ ক্ষেপে উঠলো। তৎ ক্ষণাৎ চলে যায় চালের একেবারে ধারে এবং লোকটিকেও টানে নিজের সাথে সাথে।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। তবে পাঁচতলা বাড়ির ছাদে তার সঙ্গে সারা রাত তো আর কাটানো যায় না!

অগত্যা ঝুঁকিই নিতে হল। বাড়ির দেয়ালের গায়ে গায়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল দমকলবাহিনীর বিরাট লম্বা সিঁড়ি। লোকটি এই সিঁড়ি বেয়েই নামবে ঠিক করলো। বাঁদরের মতো

সঙ্গিনীকে নিয়ে এভাবে নামা খুবই বিপজজনক। কেউই জানতো না, বেলা কখন কী করে বসবে। যে কোন মুহুর্তে সে লোকটিকে ধাক্কা দিতে পারে, আর এত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়াটা মোটেই শক্ত কিছুই নয়।

যেই লোকটি সিঁড়িতে পা ফেললো অমনি সবাই আতঙ্কে থ। কেউ একবার চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চুপ করে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কী হয় বলা তো যায় না, তাই নিচে তাড়াতাড়ি একটি জাল মেলে ধরা হল। শত শত লোক মহা আতঙ্কে দেখছিল উপরে কী হচ্ছে।

বাঁদরের হাত ধরে লোকটি ছাদের একেবরে ধারে এলো। সাবধানে পা রাখলো সিঁড়িতে। তারপর নামলো এক ধাপ। বেলা তার হাত ছেড়ে হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ আরম্ভ করলো। সবাই উঠলো শিউরে। লোকটি থেমে গিয়ে আদর করে ডাকলো বাঁদরকে। বেলা আবার শান্ত হয়ে বাধ্যের মতো তার পিছু পিছু নামতে লাগলো। স্কুলটির চারতলা বরাবর পৌঁছাবার পর দেখা গেল একটি জানালা খোলা। লোকটি সুযোগ হারালো না, সে সিঁড়ি থেকে জানলার পৈঠায় গিয়ে উঠলো। তার পিছু পিছু চতুষ্পদী সঙ্গিনীও। ভাগ্যিস ক্লাসে কেউ ছিলো না, ---- তখন টিফিনের ছুটি।

তাড়াতাড়ি দরজা-জানলা বন্ধ করে লোকটি হুঁশিয়ার করে দিলো কেউ যেন ক্লাসে না ঢোকে। নিজে থাকলো বেলার সঙ্গে।

বড়ো খোলামেলা কামরায় চেয়ার টেবিল ডেস্কের মধ্যে বেলার খুব ভালো লাগলো। ডেস্কের ঢাকনা খুলে বের করলো ব্যাগ, কাগজকলম, বই-পত্তর------ লোকটি বেলাকে থামাতে চাইলো, কিন্তু সে ডেস্ক থেকে ডেস্কে করতে লাগলো ছুটোছুটি, শুরু হল ঢাকনা বন্ধ হওয়ার ধড়াম ধড়াম শব্দ। বেলা এমন চেঁচামেচি আরম্ভ করলো যে লোকটি তাকে ছুঁলোই না।

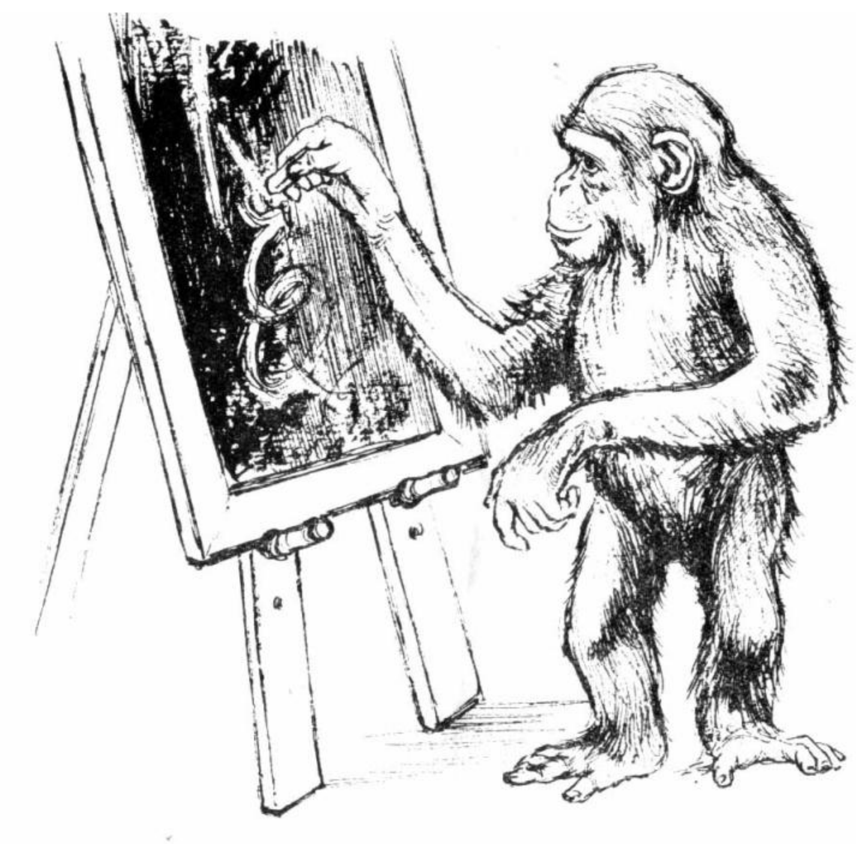

হঠাৎ বাঁদরটি খুঁজে পেল এক টুকরো চক। তা না হলে সে ক্লাসের শ্রাদ্ধ করে ছাড়তো। সম্ভবত বেলা জানতো চক দিয়ে কী হয়, তাই সে ওটা দিয়ে হিজিবিজি কী সব আঁকতে লাগলো।

সে 'আঁকায়' মজে গেলে একটি খাঁচা আনা হলো। বেলা চেঁচিয়ে উঠলো, পেছনে সরে গেল, কিন্তু পালাবার কোন উপায় নেই দেখে আপনা থেকেই চুপচাপ খাঁচায় ঢুকলো।

তার আধঘন্টা পরে দেখা গেল পলাতকা নিজেই খাঁচায় বসে তৃপ্তির সঙ্গে আঙুর খাচ্ছে।

মূল গ্রন্থ: আমাদের চিড়িয়াখানা। প্রগতি প্রকাশন

ছবি: মূল গ্রন্থ থেকে

সেই আয়না

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি–

হাতি শহরের অতিথিদের আগমনের রাস্তায় শুঁড় আকাশে তুলে সেলাম জানাল। জামাই বাবাজি নাতির বয়স বৈ তো নয়। পাশের ডোবা থেকে শুঁড়ে তুলে নিল পাঁকে ভরা জল, মশা আর ম াছি। ছিটিয়ে দিল বরের পাল্কির গায়ে।

কাছারি ঘরে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। মা আমার বেয়ারা চেহারাকে ঘসামাজা করে যথাসাধ্য ভদ্রসমাজে উৎরে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বেহায়া স্বভাবের কানে আকুতির স্বরে ব্যাবহারের বিধিনিষেধ শুনিয়ে দিয়েছেন। বরযাত্রী এসে পড়ল বাড়ির সামনে। ''বর এসেছে, বর এসেছে''। যেন ডাকাত পড়ার আওয়াজ। শাঁখ বেজে উঠল। বড়মা, মেজমা, মা উলুধ্বনি করে উঠলেন। জিভের ডগায় কন্ঠের পর্দায় অমন তবলা লহরা আজকাল শোনা যায় না। আমি মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে গলা ছাড়লাম। কিন্তু সেটা উলুধ্বনি তো নয়, ''গেল গেল'' রবে বেসুরো স্বরে কেলো করে দিল পরিবেশটা।

ঠাকুর্দা আজকাল ব্যথার শরীরে অন্দরমহলের যত্নের মলাট ছেড়ে আমজনতার কাছে ধরা দেন না। কিন্তু নাতজামাই আসছে, তাই আতর মেখে গতর সাজিয়েছেন। ঠোঁটে বঙ্কিম হাসি। দুই ধারে দুটি মানুষের কাঁধে হাত রেখে মহাত্মা গান্ধির মতো খদ্দরের পোশাক চাপিয়ে কাছারি ঘরে এসে দাঁড়ালেন। হাতে শক্তি ফুরিয়ে গেছে, শুধু আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলেন। সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষেরা বরযাত্রীদের ভুলে গিয়ে দিনমণিকে দীন চোখে দেখে নিচ্ছে অনন্তশয়ানের পূর্বে। দোষে গুণে মানুষ ছিলেন। কিন্তু চরিত্রে গল্পের মালমশলা ছিল তাই আজ দু:খ নেই। এই গল্প কেউ নাই বা পড়ুক। নাই বা হোক নাম, ধাম তো আছে। সরস্বতীর ঠিকানা তো পেয়েছি হেমবাবুর হেফাজতে।

বর পাল্কি থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নেমে দাঁড়িয়েছে। দলে আছে এক রত্তি কিশোরী মেয়ে। সেই দিকে তাকাতেই আমার বয়সটা এক হাত বেড়ে গেল। জ্যাঠামশায় শুধান, ''রাস্তায় আপনাদের কষ্ট হয়নি তো? এই অজ পাড়াগাঁয়ে আছেই বা কী, আমাদের আন্তরিকতাটা ছাড়া?''

মনের দু:খ বুকে চেপে বরের পিসি উত্তর দিলেন, ''সে কী কথা, এমন সোনার সংসার! আসলে আমরা শহরকুনো হয়ে পড়েছি। আপনাদের কাছে বাতের মলম আছে কি? রাতে যাতে কাত হয়ে না

পড়ি। আহা ব্যস্ত হবেন না।'' এবারে এ বাড়ির বড় পিসি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন, ''আপনাদের সকলের চাইতে আমি বয়সে বড়, আজকাল কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। জমিদারির বাড়ন্ত বয়সে কী ছিল আর কী না ছিল পড়ন্ত বেলায় চিনবেন না। আমার বিয়ে এ বাড়িতে প্রথম। গাঁ উজার করে কাতারে কাতারে কাতারে মানুষ এসে উদর ভরে খেয়ে গেল। এই গাঁ সেই গাঁ, চারিদিকে প্রশংসায় ছিছিক্কার পড়ে গেছিল।'' বড়পিসির বাংলা ব্যকরণে মাঝে মাঝেই প্রমাদে প্রমোদ হয়। জ্যাঠামশায় চোখ টিপে দিলেন। বড়পিসি শুধরে নিয়ে বললেন, ''না না ভুল বলেছি, টি টি পড়ে গেছিল চতুর্দিকে। তা সে কথা ঘরে বসে পরে হবে।''জামাইয়ের চিবুক টিপে বাঁদরছানার মতো আদর করে বললেন, ''এমন দাঁতকপাটি ছেলে দেখা যায় না। না না ভুল বলেছি। চাঁদ কপালি ছেলে।''

আহারেণ পরিচিয়তে। বরযাত্রীরা আসার পর থেকে দফায় দফায় মাছ ভাজা খেয়ে চলেছে। পেটের সঙ্গে রফা করে জামবাটিতে আয়েস করে পায়েস উদরে তলিয়ে নিচ্ছে। ঠাকুমা চিরকাল পেট পাতলা। সকলের খাওয়ার তদারকি করছেন। ''আহা, তোমাদের মুখগুলো শুকিয়ে গেছে। হ্যাঁগো, কিছু খাইলু?'' সকলের পেটে তবলা ঠুকে চলেছেন। এদিকে হাটের ধারে আমগাছের তলায় হায়দার এখন বড় একা। ঠাকুরদার সমবয়সী। কলকাতার অতিথিরা পেন্নামটুকুও ঠুকলনা কেউ। শুঁড়ের নি:শ্বাসে তীব্র বৈরাগ্যের ঝড় বেড়ে চলেছে। বরযাত্রীদের বড় কষ্ট আমাদের গ্রামের ছোট সংসারে। তাই ব্যবস্থা হয়েছে যাত্রার আসর। কলকাতা থেকে পার্টি ভাড়া করে আনা হয়েছে আগের দিন। কাছারির সামনে ম াঠে বিরাট মঞ্চ। ঠাকুরদার কড়া নজর। যাত্রার স্ক্রিপ্টের ওপরে নিজের হাতে কলম চালিয়েছেন। আক্ষেপ করে ছেলেদের বলেছেন, ''তোমরা দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মহিষাসুর বধ পালা আনতে পারলে না?''

দুদিন আগে থেকেই দক্ষিণের মাঠে কাঁচা-পাকা বাঁশ ফেলা হয়েছে। আর কাঠের পাটাতন। দুদিনের স্বর্গ তৈরি হচ্ছে। আমি তন্ময় হয়ে দেখি। প্রশস্ত চারিদিক খোলা যাত্রার স্টেজ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁশ বেয়ে কত লোক উঠল আর নামল। ইস্কুলের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার ঘাম ঝরানো অঙ্ক - সমস্যা মনে আছে।আর্টিস্টদের জন্য মিডল স্কুলের কমনরুম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিড়ির গন্ধ। চায়ের জোগান দিয়ে হয়রাণ হয়ে গেল চাকরেরা। হারমোনিয়ামে বেপর্দায় বেপরোয়া পালা গানের ফোয়ারা ছুটে চলেছে। ওখানকার হাওয়া লাগাতে দু'দিনেই লায়েক হয়ে উঠেছি আমি। বাবা বললেন, ''রিহার্সাল শুনে রাস্কেল হয়ে উঠেছ তুমি।'' যাত্রা দলের কিশোর ছেলেরা, কেলেপানা ক্যাকলাস চেহারা, ধোঁয়া খাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে আর্টের জাত বজায় রাখছে।

মাথায় একঝাঁক আদুরে চুল, চোখদুটি দিঘল। আজ রাতে সারা গ্রাম মশাল হাতে পথচারী। এ গাঁ, সে গাঁ। মনের চাপা আগুন যেন ফানুস তুলেছে আঁধার আকাশে। বিয়ের হাওয়াটাই এমন, পেটের খিদে, মনের খিদে, দেশলাইয়ের বারুদের মতো ফস করে জ্বালিয়ে দিল। কাছারির চওড়া বারান্দায় বাড়ির অন্দরমহল আসন পেতে থিয়েটার দেখবে। সামনে বাঁশের সুক্ষ্ম চিকের পর্দা। বৌদের ঘোমটা সরে গেছে। বড়পিসি চোখের জল মুছে, কোমরে ভারী চাবির গোছা সামলিয়ে বললেন, ''এ সবই তোর ঠার্কুদার দান। চলে গেলে সলতেটা জ্বালিয়ে রাখিস বাবা।''

দূরে সাঁওতাল গ্রামে মাদল বেজে উঠল। ড্রিম ড্রিম ড্রিম। আদিম সেই স্বর, সভ্যতার প্রথম প্রভাতের প্রারম্ভিক আলাপের ভাষা। সুঠাম যুবার দল, ওদের মেয়েদের কানে এমন সব ফুল আছে যা কলকাতার নিউ মার্কেটে পাওয়া যাবে না। ওরা আসছে মশাল জ্বেলে। মহুয়ার রসে টানটান হয়ে। গ্রামের মোড়ল ও কর্তাব্যক্তিরা কলকাতার অতিথিদের নিয়ে মাঠে একটা আলাদা সামিয়ানার তলায়

সামিল হয়েছেন। মোড়লের গায়ে নতুন ফতুয়া, ভাগ্যিস লাল জুতুয়া ছিল না পায়ে। হাইস্কুলের মাস্টাররাও আছেন, অজ্ঞজন থেকে আলাদা আসনে সামিয়ানার তলায়।

সাঁওতাল পাড়া এবার জুটে গেল স্টেজের ওপরে। সাঁওতাল নাচ শুরু হল। গ্রাম জীবনের ক্যালিপ্সো। এদিকে আজ বড়কর্তার চোখে ঘুম নেই। শীতের রাত, হিমের ছোঁয়া লেগে গায়ে জ্বর এসেছে। বিছানায় শুয়ে আত্মজীবনী ডিকটেশন দিচ্ছেন। আজ ডাক পড়েছে রাঙাপিসির। লিখে নেওয়ার পালা। ওনার সামনে বসার হুকুম ছিল না কারুরই। ঠাকুর্দার স্কুলে সকলেই দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে দন্ড ভোগ করে। ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, বাঁ পায়ে বিশ্রাম নাও। কৃতাঞ্জলি হয়ে ওনার মুখের কথা খাতায় টুকে নাও। কর্তার ঠোঁট বিড়বিড় করে ইতিহাসের বিনুনি পাকিয়ে চলেছে, ''১৯৪০ সালে মধু মিঞাঁকে বলেছিলাম তোর গাছের পেয়ারা ইতিহাসে অনেক দূর যাবে। বড় সখের সখা ছিল সে। মুজবর গ্রামে নদীর মুখে ওর বাড়ি। কই, সে পেয়ারা খাওয়ালো না তো? আমি পেয়ারা খাবো।'' রাঙা পিসি বোকা হয়ে গেছে, ''সে কী কথা, আজ উৎ সবের বাড়িতে কত রান্না হয়েছে। তাছাড়া আপনার দাঁত পড়ে গেছে, পেয়ারা খাবেন কী করে? জ্বরটা বেড়েছে কি?'' এমন সময় বাড়ির সামনের দালানে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে, ''বাবুজি।'' কিন্তু বাবুজি তো আজকাল বাড়ির বাইরে বেরোন না, দেখা হবে কী করে?

''উনি আমাকে কাল রাতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'মধু তোর গাছের পেয়ারা খাওয়ালি না, জানটা ধরে রেখেছি তোর জন্য।' তাই আজ গামছা হাতে পেয়ারা ভরে এনেছি।''

ঠাকুর্দার কানে পৌঁছে গেল সেই সন্দর্ভ। টলমল শরীরে মেয়ের হাত ধরে দালানে নেমে এলেন। ওনার আত্মবিশ্বাস প্রবল ছিল, তাই নিজেকে ভোলাতে পারতেন সহজেই। ''কাল রাতে স্বপ্নে তোর কাছে গিয়েছিলাম।'' এই বলে মধুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ক্রমশ

ছবি : মৌসুমী

সন ১৯৩৪। গোটা দেশজুড়ে তখন পালাবদলের পালা। আগের বছর কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এদিকে ১৯৩৩-এই মাস্টারদা ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে সেইসাথে। এই সময়েই পুলিশের নজর পড়েছিল দৌলতপুর কলেজের ছাত্র ভূপতিরঞ্জন দাসের ওপরে। উনিশ বছরের ছেলেটার ব্যাপারে খবর ছিল, অনুশীলন সমিতির দৌলতপুর শাখার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

ওদিকে, পুলিশ যে চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা জানতে পেরেছে সে খবর ভূপতিরঞ্জনেরও অজানা রইল না। সে ঠিক করল, পালাবে। শুধু এলাকা ছেড়েই নয়, বৃটিশ ভারতের চৌহদ্দি ছাড়িয়েই উধাও হবে একেবারে।

----- -------- ------- -------

সমুদ্র থেকে ১০,১৫৯ ফিট উচ্চতায় বদ্রীনারায়ণ। হিন্দুদের চার ধামের একটি। সেই তীর্থক্ষেত্র ছাড়িয়ে , ভারতের শেষ গ্রাম মানা বা মনিভদ্রপুর। মানা গ্রাম ছাড়িয়ে আরও ভেতরে এগিয়ে চলে একাকী তরুণ। লক্ষ্য তিব্বতের প্রবেশদ্বার মানা গিরিবর্ত্ম। পথ ক্রমশ আরো উঁচু হয়। সরস্বতী থেকে শুরু হল গিরিবর্ত্মে পৌঁছোবার প্রকৃত চড়াই। তারপর, ১৮,৪০০ ফিট উচ্চতায় মানা গিরিবর্ত্মে পৌঁছে সেই পথ দিয়ে তিব্বতে ঢুকলেন ভূপতিরঞ্জন দাস।

এবারে দুর্গম পথে সুদীর্ঘ যাত্রা। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে এক হাজার মাইল পথ পেরিয়ে ফের এসে , তুঙ্গা গিরিপথ পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ডে ঢুকলেন অধুনা অরুণাচল প্রদেশে। দিনের বেলায় পথ চলা, আর রাত কাটত কখনও কোনও বৌদ্ধ গোম্ফায় আশ্রয় নিয়ে , কখনও বা কারো দাওয়ায় শুয়ে। চলার পথে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশটিকে অনুভব করলেন গভীরভাবে। উপলব্ধি করলেন, ভারত যেমন বৌদ্ধধর্মে তিব্বতীদের গুরু, তিব্বতের শিবসাধনা তেমনি ভারতের শিবভক্তির শিক্ষক। খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী অবধি ভারত থেকে তিব্বতে গিয়েছে বৌদ্ধধর্ম। ওদিকে তিব্বত থেকে শৈব ধর্মের ভারতে আসা কিন্তু বৈদিক যুগেরও বহু আগে। এই সংস্কৃতি বিনিময়ের ফল হয়েছে বিচিত্র। সমপূর্ণ তিব্বত আজ বৌদ্ধ, আর ওদিকে, ভারতের প্রায় প্রতিটি গ্রামে রয়েছে শিবমন্দির।

সেই উপলব্ধিটি সঙ্গে করে নিয়ে দেশে ফিরে অতএব এদেশে শৈব ধর্মের মূলানুসন্ধান। দু'বছর ধরে দেশের পথে পথে ঘুরে ঘুরে চলল প্রাক বৈদিক যুগের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন আর তথ্যসংগ্রহ। এর ফল হল দুটো। প্রকাশিত হল ''দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন'' নামের একটি বই, আর সেইসঙ্গে ''ঘোরা রোগ''টাও ভালোভাবেই চেপে বসল কাঁধে।

হাঁটার অভ্যাসটা তাঁর একদম ছোটবেলাতেই হয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলায় , জন্মস্থান খুলনার দিঘলিয়া গ্রাম থেকে পাশের গ্রামের স্কুলে রোজ তিন মাইল করে হেঁটে পড়তে যেতে হত যে!

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে চাকরি পেয়েছেন। নামখানা - ফ্রেজারগঞ্জ পথে ডাকবিভাগের রানারের চাকরি। বন-মাঠের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ ধরে ডাকের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে রাতভর ছুটে যাওয়া। ভাল লাগত সেই কাজ? তিনি বললেন, লাগত। ব্যাগ ঘাড়ে দৌড়োনর সময় ভাবতাম আমার এই ব্যাগ এমন জিনিস বয়ে নিয়ে চলেছে যা কাউকে দেবে নতুন সন্তানের জন্ম সংবাদ, আর কারো কাছে বয়ে নিয়ে যাবে হয়তো বা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর খবর। এক কথায় আমি অত্যন্ত জরুরি চিঠি বয়ে নিয়ে চলেছি। আমি একটা কাজের কজ করছি।

এইভাবে শুরু হল ভূপতিরঞ্জনের জীবনের পথে ভ্রমণ--সরকারি দপ্তরে ক্রমশ ওপর থেকে আরো ওপরে যাত্রা। পাশে পাশে কিন্তু অন্য ভ্রমণও থেমে নেই।

একবার ভাবলেন চৈতন্যদেবের ভারত পরিক্রমার পথটা পায়ে হেঁটে ঘুরলে কেমন হয়। অতএব তিনবারে চার-পাঁচ মাস করে চলল পদব্রজে ভ্রমণ। চৈতন্যদেব পদব্রজে নবদ্বীপ থেকে নীলাচল গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কন্যাকুমারী হয়ে আমেদাবাদ আর তারপর সেখান থেকে ফিরেছিলেন পুরীতে। সেই পথ অনুসরণ করে প্রথমে পায়ে হেঁটে গেলেন নবদ্বীপ থেকে পুরী। দ্বিতীয় বারে পুরী থেকে কন্যাকুমারী, সেখান থেকে আমেদবাদ হয়ে তারপর আবার পুরী ফেরৎ। অবশেষে পুরী থেকে ঝাড়খণ্ডের পথে বৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাবর্তন। প্রথম তাঁর সঙ্গে যখন সুকুমার সেন মশায়ের দেখা হল, বয়োজ্যেষ্ঠ্য হওয়া সত্ত্বেও আচার্য সুকুমার সেন পায়ের ধুলো নিতে গিয়েছিলেন ভূপতিরঞ্জনের। যে পথে দিব্যোন্মাদ শ্রীচৈতন্য হেঁটে গিয়েছিলেন কয়েক শতাব্দী আগে, তাঁর পায়ে সেই পথের পবিত্র ধুলো লেগে রয়েছে যে!

হেঁটে বেড়াতে ক্লান্তি নেই এই তাঁর। একসময় পায়ে হেঁটে হেঁটে বীরভূমের শ'খানেক পুরোন ম ন্দির ঘুরে দেখেছেন। নব্বই পেরোন এই তরুণের উপদেশ-- পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালে ক্লান্তি হয় না, ক্ষিদের কষ্ট টের পাওয়া যায় না, হজম করার ক্ষমতা বাড়ে, আর মনের ভেতর আনন্দের মহাপ্লাবন বয়ে যায়।ভ্রমণে মন খোলা দুনিয়া দেখতে বাধ্য হয়। ভ্রমণে মনের ভ্রম দূর করে।

১৯৬১ সাল। ভূপতিরঞ্জন তখন বারাকপুরের পোস্টাল ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পোস্টাল-রেল ধর্মঘটের শিকার হয়ে চাকরিটি তাঁর গেল। তাতেও তাঁর আনন্দ। নতুন করে পড়ার সুযোগ পাওয়া গেল যে আবার!

ছেচল্লিশ বছর বয়সে আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু হল। প্রথমে প্রাইভেটে গ্র্যাজুয়েশান, তারপর আধুনিক ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করলেন সসম্মানে। বিএড পাশ করলেন প্রথম শ্রেণীতে। নৈহাটির স্থানীয় স্কুলে চাকরি নিলেন এবারে। শুরু হল শিক্ষকতার জীবন।

১৯৭৬ সালে নৈহাটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণাকেন্দ্র স্থপিত হল। এঁদের অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যে একটি ছিল 'হাবেলিশহর (এখনকার হালিশহর) পরগণার সামাজিক- অর্থনৈতিক -সাংস্কৃতিক ইতিহাস' তৈরি করা। আইন-ই-আকবরিতে উল্লিখিত হাবেলিশহর পরগণার সীমা নির্ধারিত আছে উত্তরে কল্যাণীর কাছে অধুনালুপ্ত যমুনা নদী থেকে দক্ষিণে ইছাপুরের নোয়াই খাল। আবার পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে পূর্বে অধুনলুপ্ত সূতি নদী পর্যন্ত। ভূপতিরঞ্জন এই কাজটির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত হলেন। কাজটা করতে গিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল লুপ্ত নদী সূতির গতিপথটাকে খুঁজে বার করা। অতএব আবার পথে বার হলেন তিনি। এবারে নতুন ধরণের পথ পরিক্রমা। মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেল, একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ বরাবর কোন বাড়িতে নৌকার ভগ্নাবশেষ, কোন বাড়িতে বা আবার চাষ জমি থেকে পাওয়া কুমীরের কংকাল রয়েছে। আবার , বিভিন্ন গ্রামে একই রেখা বরাবর একটা করিডোর-এই নলকূপের জল অল্প আয়াসে পাওয়া যায়। অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। পরিব্রাজকের চোখে ধরা দিল হারিয়ে যাওয়া নদীর ধারাপথ।

বয়স বেড়েছে, কিন্তু চলার উৎ সাহ কমেনি একচুল। ১৯৯৬ সালে, একাশি বছর বয়সে বেড়াতে গেলেন বস্তারের জগদলপুরের আশেপাশে। ফিরলেন দল্লিরাজহারা-বালোদ হয়ে। ভ্রমনবার্তা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বস্তারের ওপর তাঁর লেখাটি।

পৃথিবী এবং জীবনের পথে পথে পরিক্রমার ফসল বেশ কিছু বই। লিখেছেন চার খণ্ডে তীর্থপতি শ্রীচৈতন্য, দুই খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন, ভারতের তীর্থপথ নির্দেশ। একসময় ভ্রমণবার্তা পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন দীর্ঘ তেরো বছর।

সময় বদলেছে। বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকও এখন দশ বছরের পুরোন। মানুষ বহুকাল হল চাঁদে মঙ্গলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন ঘরে বসে তারা যন্ত্র পাঠায় দুর্গম অভিযানে। শখের অভিযাত্রীদের এভারেস্টে চড়ানো এখন বহু বিদেশী কোমপানির ভালো ব্যবসা। সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষের বড় অভাব হয়ে পড়েছে আজকাল। একা হয়ে পড়ছিলেন ভুপতিরঞ্জনের ম ত মানুষেরা, আজকের এই বড় অ্যাডভেঞ্চারবিমুখ আর অলস দুনিয়ায়। হয়ত সেইজন্যই বছর চারেক আগে নি:শব্দে বিদায় নিয়েছেন এই কালের রানার। তাঁর পরিক্রমা শেষ। জয়ঢাক তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

ছবি: মৌসুমী

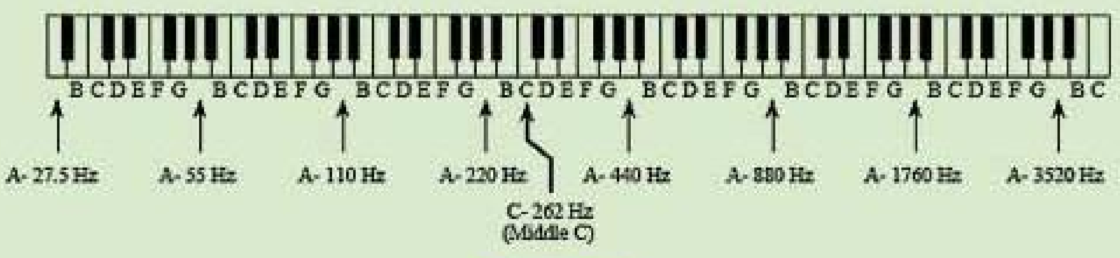

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

পুজোর পর পরই বেশ হাল্কা একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকত অভয়ারণ্যের পাশের সেই ছোট্ট জনপদটায়। এখন তার বেশ নাম ডাক ভ্রমণ মানচিত্রে। কিন্তু তখন জায়গাটা ছিল যেন মানচিত্রেরই বাইরের কোন নিঝুমপুরি। পুজোর লম্বা ছুটিতে আসামের ধরণে তৈরি কাঠের জাহাজি বেড়া দেওয়া, টিনের চাল ছাওয়া বাড়িটার ছোট্ট একটা ঘরে একা একা থাকতে পেতাম।

গভীর রাতে কানে তালা ধরানো ঝিঁঝির ডাক, হাল্কা একটা নকশি কাঁথা, নীল করে কমিয়ে রাখা লন্ঠন, টিনের চালের ওপর শিশিরের টুপটাপ আর ...

ধিইম্ ধিতাং ....

ওই তাং-টার পর প্রায় এক, দুই, তিইন্, চাআর্, পাঁআচ্ সেকেন্ড দম বন্ধ করা নৈঃশব্দ ......তার পর ...

ধিধিম্ ধিইম্ ধিতাং ....

পাঁচ সেকেন্ডের ওই শব্দহীন মুহূর্তগুলোয় জমাট বেঁধে যাওয়া বুকটা উদ্গ্রীব হয়ে থাকে আবার কখন ধিইম্-শব্দে হৃদ্পিন্ডের ধ্বক্ ধ্বক-টা শুরু হবে ..... আস্তে আস্তে মাদলের এই দোলাটার ভেতর ঢুকে যেতে যেতে স্বপ্নের দেশে পৌঁছে যাওয়া .....

প্রায় নির্জন পাহাড়ি একটা গ্রামের শেষপ্রান্তে উঁচু জায়গাটায় পৌঁছোলে সামনে যতদূর চোখ যায় দেখা যায় পায়ের নীচে পাহাড়ের সমুদ্র। ঢেউয়ের মত ছোট-মাঝারি পাহাড়ের চুড়োগুলো যেন সমুদ্রের ঢেউ - কেউ 'পজ' টিপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ....

দাদু বলে ডাকতাম তাঁকে, যদিও তিনি ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। সন্ধে হতে তখনও ঘন্টাখানেক দেরি - ভাবছি আজ দাদুর সান্ধ্যভ্রম একটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা মারা যেত।

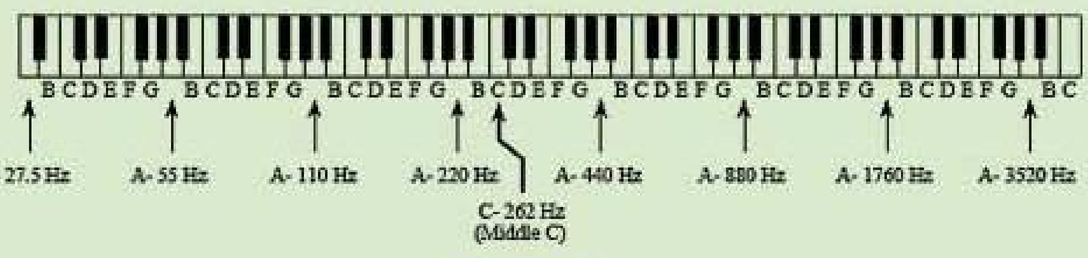

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু দাদু বসলেন একটা বড় পাথরের ওপর - আমাকে পাশের পাথরটা দেখিয়ে বললেন আজ একটু চুপ করে বসে সূর্য ডোবাটা দেখ। এমনিতেই আমার চুপ করে বসে থাকাটা একেবারেই অর্থহীন, সময়ের অপচয় বলে মনে হয়। বরং ততক্ষণ আড্ডা দেওয়া বা এমনকি যা হোক কিছু একটা পড়লেও তো সময়টা কাজে লাগে .... কিন্তু কী আর করা .....

বসলেও মনের ভেতর এভাবে অকারণ সময় নষ্ট হওয়ার জন্য একটু রাগ রাগ ভাবটা কিন্তু থেকেই গেল। বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকার পর, বোধহয় ঐ অপছন্দের কিছু নিরুপায় হয়ে করতে হলে সেটা উপভোগ করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবতে ভাবতে, কি করে এক অবাক কান্ডের মত মনে হতে লাগল আমি যেন এই চুপ করে বসে থাকাটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। চারদিকটা কি নিশ্চুপ .....

হাল্কা হাল্কা দুধ-সাদা ফেনার মত মেঘ আমার পায়ের নীচে অনেক দূর দূর অব্দি পাহাড়ের ঢেউ-চুড়োগুলোর দিকে উঠে আসছে - ওদিকে সূর্য রং পাল্টাচ্ছে - ছড়াচ্ছে ঐ সাদা মেঘের ওপর, নীল আকাশে হাল্কা সাদা মেঘ দিয়ে একটা বিশা.......ল বড় উপবৃত্ত তৈরি হয়েছে - মনে হতে লাগল সময় এখানেই থেমে থাকুক - এত সুন্দর আর কি হয় !

এবার পুজোয় যারা ওইরকম কোন জায়গায় মাদলের বোল শুনতে (মঞ্চে বা রিসর্টে পয়সা দিয়ে কেনা বাজনা শুনতে গেলে পাবে না কিন্তু!) বা সূর্যাস্ত দেখতে যাবে তারা একবার না হয় রাগ করেই চেষ্টা করে দেখ আর যারা যাবে না তারা চুপ করে কোন একটা জায়গায় কোন একটা সময়ে খুব বিলম্বিত লয়ের* কোন গান বা বাজনা চালিয়ে ঐ 'তাং' -এর পরের পাঁচ সেকেন্ডের দম বন্ধ করা নৈঃশব্দ বা সূর্য ডোবা শব্দহীন সন্ধেটার ভেতর ঢুকে যেতে পারো কি না দেখো ...

সবাই সুন্দর দেখতে চাইলে তবেই পৃথিবীটা সুন্দর হবে ... তবেই সঙ্গীত নিয়ে যেতে পারবে চমক-সার বিনোদনের জগৎ ছাড়িয়ে আনন্দলোকে.....

('বিলম্বিত লয়' সিনেমাটার কথা বলছি না - মার্গ সঙ্গীতের শুরুর যে অংশটা শুনলে মনে হয় কখন অন্ততঃ তবলার সাথে গান / বাজনাটা একটু জমিয়ে শুরু হবে!)*

মাধব কান্দালির প্রাচীন অসমীয়া রামায়ণে মাদলের উল্লেখ আছে। সাঁওতাল, ওঁরাও, নায়েক, বিলাসপুরিয়া, মুরা ইত্যাদি উপজাতীয়দের প্রিয় বাজনা - মাদল। চা-শ্রমিকদের গানে পাওয়া যায় আগে পোড়ামাটি দিয়েই তৈরি হত। অনেক আগে মান্দার বা মুরজ নামেও পরিচিত ছিল মাদল। (*সূত্র - দিলীপ রঞ্জন বরঠাকুরের দি মিউজিক অ্যান্ড মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস্ অফ ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া*)

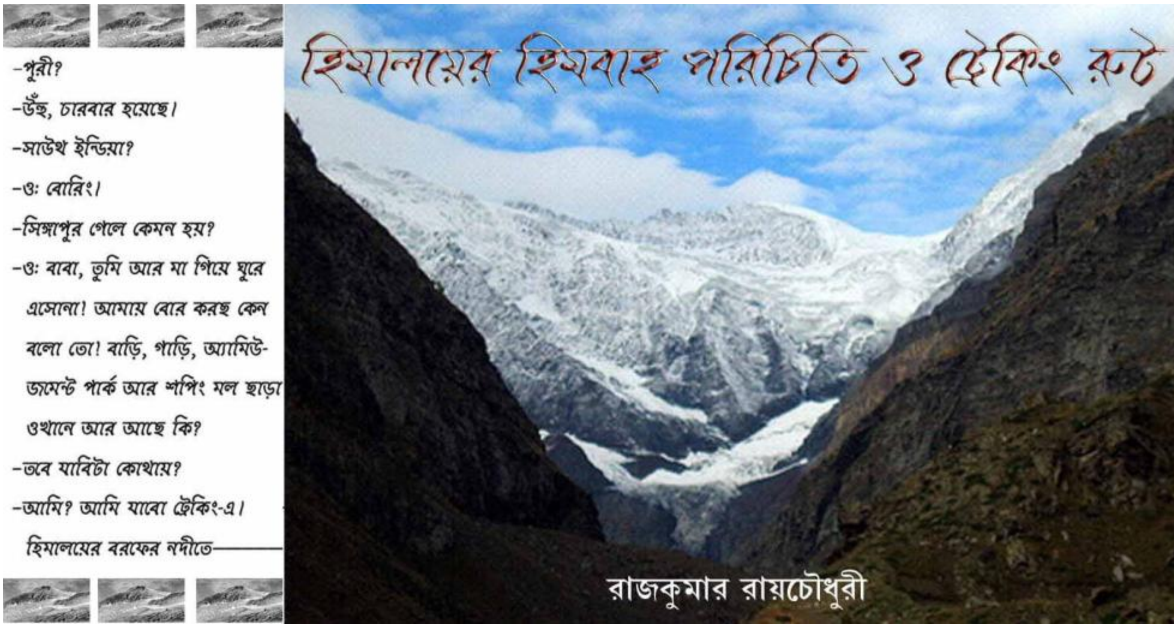

নন্দনবন, বাসুকীতাল ও কালিন্দী খাল

চতুরঙ্গী হিমবাহ অতিক্রম করলে দেখা মিলবে নন্দনবনের। সবুজ ঘাসে ছাওয়া নন্দন বন প্রথম দর্শনেই ভাল লাগবে, এখান থেকে কেদারডোম, কেদারশৃঙ্গ, কীর্তিস্তম্ভ, ভৃগুপন্থ এবং মেরু পর্বতের অপূর্ব চোখ জুড়ানো দৃশ্য পথের ক্লেশ ভুলিয়ে দেবে। ক্যাম্পিং-এর উপযুক্ত জায়গা।

চিত্র ৩ - চতুরঙ্গী ও বাসুকীতালের পথ

যাদের পাহাড়ের কিছু দূর্গম স্থানে হাঁটার অভ্যেস আছে তাঁদের গাইডের সাহায্যে তপোবন বা নন্দনবন যেতে খুব অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু নন্দনবন থেকে বাসুকী হিমবাহ অতিক্রম করে

কালিন্দী গিরিখাত এবং তারপর বদ্রীনাথে পৌঁছতে গেলে অভিজ্ঞতা ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ গাইড ও দক্ষ পোর্টার দরকার। গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগমের কাছে খোঁজ নিয়ে জানুন কালিন্দী খাল ট্রেকিং এর প্যাকেজ ট্যুর চালু আছে কিনা। না থাকলে ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। এ পথে তো বটেই গঙ্গোত্রী পেরোলেই, এমনকী গোমুখ যেতে হলেও বনদপ্তরের বিশেষ অনুমতি দরকার হয়। উত্তরকাশির বনদপ্তরেই যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করে নিতে হবে।

নন্দনবন থেকে বাসুকীতাল যেতে গেলে একটি গিরি শিখা (ridge)ধরে চতুরঙ্গীর সমান্তরাল প্রায় আট নয় কিমি হাঁটতে হবে। পথে পড়বে ছোট চোট ঝর্না ও মোরেন। চতুরঙ্গী ও বাসুকী হিমবহের সঙ্গম স্থলের কাছে যেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। কিন্তু বাসুকী হিমবাহ অতিক্রম করতে গেলে প্রায় ৬০° - ৬৫° ঢাল বেয়ে বরফ ও কাদার উপর দিয়ে হাঁটা। রোপ (rope) করা ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। বাসুকী হিমবাহ অতিক্রম করলে দেখা মিলবে বাসুকীতালের। এটির উচ্চতা প্রায় ৪৯০০ মি। বাসুকী পর্বত থেকে একটি ছোট নদী বাসুকীতালে এসে পড়েছে। বাসুকী পর্বতের উত্তর পশ্চিম ঢালে ক্যাম্প করা যেতে পারে।

পরের দিন লক্ষ্য হবে সুরালয় ও শ্বেতা হিমবাহের সঙ্গম।সুরালয় হিমবাহের ধারে একদিনের ক্যাম্প প্রচন্ড ঠান্ডা ও হাড় কাঁপানো বাতাস বিব্রত করবে। চতুর্থদিনে সুরালয় অতিক্রম করে বাঁদিকে মোরেনের উপর ক্যাম্প করা সম্ভব। বলা বাহুল্য ৫০০০ মি উচ্চতায় হিম বাহের উপর হাঁটা অত্যন্ত দক্ষ ট্রেকার ছাড়া সম্ভব নয়। পঞ্চম দিনের লক্ষ্য কালিন্দী গিরিখাত। কালিন্দী গিরিপথ গঙ্গোত্রী উপত্যকা ও বদ্রীনাথ উপত্যকার সঙ্গমে উপস্থিত। গিরিপথ খুব সকাল থাকতে অতিক্রম না করলে বিপদের সম্ভবনা। পথে পাহাড়ের তীব্র ঢাল বরাবর তুষারধস নেমে আসে। রোদ উঠে গেলে এই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।কালিন্দী গিরিপথ অতিক্রম করে আরওয়া(Arwa) হ্রদের ধারে হবে এদিনের বিশ্রাম স্থান।

এরপরের দিন ঘাসতোলী, তারপরের দিন মানাগ্রাম এবং বদ্রীনাথ, শেষের দুদিন অপেক্ষাকৃত সহজে পথে হাঁটা। কালিন্দী গিরিখাত অতিক্রম করে বদ্রীনাথে যাওয়ার পথের দৃশ্য অনিন্দ্য সুন্দর। গঙ্গোত্রী উপত্যকার অজস্র ছোটো-খাট হিমবাহের সাক্ষাৎ এ পথে মিলবে। গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ ৯ দিনের পথ।

সতোপন্থ হিমবাহঃ- সতোপন্থ ও ভাগীরথী খড়ক হিমবাহ-দ্বয় অলকানন্দা অববাহিকার (basin) দুটি গুরুত্বপূর্ণ হিমবাহ। সতোপন্থের দৈর্ঘ্য ১৩ কিমি ও ভাগীরথী খড়কের দৈর্ঘ্য ১৮ কিমি। দুটি হিমবাহের স্নাউটের(snout)-এর মধ্যে দুরত্ব মোটে ৬০০ মি। স্নাউট দুটির উচ্চতা যথাক্রমে ৩১৮০ মি ও ৩৮২০ মি। দুটিই লংগিচুডিনাল (longitudinal) হিমবাহ। বহু ছোটো খাট হিমবাহ এই দুটি হিমবাহে এসে মিশেছে।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প :- মানাগ্রাম

	দূরত্ব	পথ
হৃষীকেশ - যোশী মঠ	২৫৭ কিমি	বাস
যোশী মঠ - বদ্রীনাথ	৪২ কিমি	বাস
বদ্রীনাথ - মানাগ্রাম	৩ কিমি	হাঁটা
মানাগ্রাম - সতোপন্থ	২৩ কিমি	হাঁটা

হৃষিকেশ থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে বিকেলের মধ্যে যোশীমঠে আসুন। প্রথম রাত যোশীমঠে কাটান, সময় হাতে থাকলে শঙ্করাচার্য্য গুম্ফা বা জ্যোতির্মঠ দেখে আসতে পারেন। আগে এখান থেকে তিব্বত যাবার রাস্তা ছিল। দ্বিতীয় দিন বদ্রীনাথে আসুন। যোশীমঠের উচ্চতা প্রায় ১৯০০ মি। ঠান্ডা খুব একটা নেই কিন্তু বদ্রীনাথ ৩১৫৫ মি বা প্রায় ১০৪০০ ফুট সুতরাং ঠান্ডাও বেশ। যদি যোশীমঠে খাবার দাবার না কিনে থাকেন তবে বদ্রীনাথে কিনে নিন। সতোপন্থের পথে কিছুই পাওয়া যাবে না। সংগে নিজস্ব তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ ও রসদ না নিয়ে এলে, সমস্তই সংগ্রহ করতে হবে যোশিমঠ থেকে। এখানে বিভিন্ন এজেন্সি এই কাজ করে, সুতরাং তাদের সাহায্য নেওয়াই ভাল। আর সংগ্রহ করতে হবে বনদপ্তরের অনুমতি। ওই অঞ্চলের সর্বত্রই পর্বত-পদযাত্রা অথবা পর্বত-শিখরাভিযান করবার জন্য এই অনুমতি আবশ্যক। এজন্য নির্ধারিত অর্থমূল্যও জমা দিতে হবে বনদপ্তরেই।

তৃতীয় দিন সকালে হাঁটা শুরু করুন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর মানাগ্রাম পৌঁছবেন। মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের মূর্তি আছে এখানে। আর আছে ভীমপুল। কথিত আছে ব্যাস মহাভারত এখানে রচনা করেন। এর পর প্রায় ১১/১২ কিমি দূরে লক্ষ্মীবন। প্রচুর ভুজগাছ দেখবেন। আজকে রাতে এখানেই ক্যাম্প করুন।

ইচ্ছে করলে এখানে যে গুহা আছে তাতেও থাকতে পারেন। এখানকার উচ্চতা ৩৮৪১ মি। এখান থেকে ভাগীরথী খড়কের দর্শন মিলবে। লক্ষ্মীবন থেকে মোরেন ধরে হাঁটা। বলা বাহুল্য অভিজ্ঞ গাইড একান্তই জরুরী। মানাগ্রাম থেকে গাইড ও পোর্টার পেতে পারেন। মোরেন শিরা (ridge) এর উপর দিয়ে সতর্ক ভাবে চলবেন। লক্ষ্মীবন থেকে পরদিন হাঁটা লক্ষ্য চক্রতীর্থ। লক্ষ্মীবন থেকে ১ ১/২ কিমি হেঁটে পৌঁছন বানধার ৩৮৬৩ মি। সামনেই দেখবেন অলকাপুরী, অলকানন্দার উৎস। আরও ১ ১/২ কিমি পরে পড়বে ভীমবার। লক্ষ্মীবন থেকে মোট ৪ কিমি ও ভীমবার থেকে প্রায় ৫ কিমি পথ পেরিয়ে চক্রতীর্থে পৌঁছন, পথে পড়বে শস্ত্র-ধারা।

চক্রতীর্থের উচ্চতা ৪৫৭৩ মি। বেশ ঠান্ডা, যথেষ্ট গরম জামা কাপড় সঙ্গে নিয়ে আসবেন। চক্রতীর্থে আজকের ক্যাম্প। এখান থেকে দেখবেন চৌথাম্বা নীলকন্ঠের নয়ন ভুলানো দৃশ্য। পরদিন পাহাড়ের ধ্বস বেয়ে চড়াই ভাঙুন। ৩০০মি আরোহন করে সতোপন্থ হিমবাহের ধারে পৌঁছন। সতোপন্থ হ্রদ আরো কিছু দূরে। মাঝখানে একটি রীতিমতো রোমাঞ্চকর উৎরাই ও চড়াই আছে। সতোপন্থ হিমবাহের মোরেন শিরা ধরে পৌছে যাবেন সতোপন্থ হ্রদে। হ্রদের উচ্চতা

৪৮৭০ মি, এর উপরেই স্বর্গারোহিনী শৃঙ্গ। সতোপন্থ হ্রদের ধারে তাঁবু খাটান। বদ্রীনাথ থেকে সতোপন্থ তাল দেখে পাঁচদিনে ফিরে আসা যায়।

বি.দ্রঃ- মানাগ্রামে ভীমপুল থেকে ৩ কিমি দূরে ৩৩০০ মি উচ্চতায় বসুধারা জলপ্রপাত দর্শনীয় বস্তু।

খাটলিঙ্ হিমবাহ

খাটলিঙ্ হিমবাহ ভীলগঙ্গার উৎস। এখন ভীলগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে তৈরি হচ্ছে বিশাল এবং বিতর্কিত তেহরি ড্যাম। খাটলিঙ্ হিমবাহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ১/২ কিমি। গড় প্রস্থ ১ ১/২ কিমি। এটি lateral হিমবাহ। সহস্রতাল ও মসারতাল খাটলিঙের যথাক্রমে পশ্চিমে ও পূর্বে অবস্থিত। কথিত আছে যে স্বর্গের এক অপ্সরা শিবকে কামিনী মায়ায় বাঁধতে চেয়েছিল। শিবের ক্রোধে নদীর রূপ ধারণ করে, এটিই হল ভীলগঙ্গা। স ই বত ভীলগঙ্গা উপত্যকার অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য গল্পটি তৈরি হয়েছে।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প -: ঘুট্টু

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
হৃষিকেষ - ঘানশালী	৯৭৬	১১০	মোটর
ঘানশালী - ঘুট্টু	১৫২৪	৩০	,,
ঘুট্টু - রী	২১৩২	১০	হাঁটা
রী - গাঙ্গী	২৫৮৪	১০	,,
গাঙ্গী - কল্যানী	২৬৮৩	৫	,,
কল্যানী - ভেলভাগী	৩১১০	১৩	,,
ভেলভাগী - খাটলিঙ	৩৭১৭	৭	,,

হৃষীকেশ থেকে বাসে বা জিপে তেহরি আসুন। এখান থেকে ঘুট্টু যাবার বাস বা জিপ পাবেন। এখন নতুন তেহরি শহর হয়েছে ড্যামের অনেক উপরে। ঘুট্টু তে যদি দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছতে পারেন তবে গাইড ও পোর্টার ঠিক করুন খাটলিঙ যাবার জন্য। এখানে থাকার জন্য PWD বাংলো আছে। প্রাইভেট থাকার ও কিছু ব্যবস্থা আছে। ঘুট্টু জায়গাটা বেশ ম নোরম। নদী এখানে স্থুলকায়া নন, তবে চঞ্চলা। এখানে স্টেট ব্যাঙ্কও আছে। ঘুট্টুতে রাত কাটান। পরের দিনের গন্তব্যস্থল রী, দূরত্ব প্রায় ১০ কিমি। প্রথম ১ কিমি রাস্তা প্রায় সমতল। তারপরই রাস্তা সরু হয়ে গেছে। আর বেশ চড়াই। গাছপালাও কম। চার/পাঁচ ঘন্টা হাঁটার পর পৌঁছবেন রী গ্রামে। ট্রেকারদের জন্য সুন্দর বাংলো আছে। তবে ভয়ানক মাছির উৎপাত। বাংলো থেকে দেখতে পাবেন জোড়া তুষারশৃঙ্গ। রী-র পরের ক্যাম্প গাঙ্গীতে। এটাই এ পথের শেষ লোকালয়। বাংলোর

পরই শুরু হবে প্রাণান্তকর চড়াই। তবে রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, যাবার পথে পরবে খুবই ছোট গ্রাম নারাং, এর কাছে একটি বড় ময়দান আছে। এখানেই দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে পারেন। ভাগ্য ভাল থাকলে দেখতে পাবেন bird of paradise, অপূর্ব সুন্দর পাখি। গাঙ্গীর বাংলোতে আজকের বিশ্রাম। পরেরদিন গন্তব্যস্থল বিরোড়ী। রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, বার্চ আর আখরোটের জঙ্গল। দৈত্যাকার সব horse chestnut-দের দেখা মিলবে। কিছুক্ষণ চলার পরই পড়বে ছবির মতন একটি নদী, আপনি কল্যানী পৌঁছে গেছেন। জায়গাটি এত রোমান্টিক যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করবে না। কিন্তু যেতেই হবে কারণ সন্ধ্যে হবার আগেই বিরোড়ী পৌঁছাতে হবে। বিরোড়ীতে আছে সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। কাছেই নদী সুতরাং জলের সমস্যা নেই। কাছেই গুড্জরদের আস্তানা। কাছে গেলে তাড়া করবে ভয়ন্কর দর্শন কুকুরের দল।

পরের দিনের গন্তব্য স্থল ভুমকা। মে জুনে গেলে রাস্তায় বিস্তর বরফ পাবেন। কুলীরা বলবে গ্লেসিয়ার। এরকম অনেক গ্লেসিয়ার (Ice patch) পার হয়ে পৌঁছন ভুমকায়। এখানে গাছপালা অল্প তবে প্রচুর ঘাস আছে। সমতল জায়গা অপ্রতুল হলেও আজকে ক্যাম্প এখানে করা যেতে পারে। ভুমকার উচ্চতা প্রায় ৩৬০০মি অর্থাৎ প্রায় ১২ হাজার ফুটের কাছাকাছি। মে মাসেও তাই বরফ পড়ার সম্ভাবনা আছে। খানিকটা নীচে ভিমগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। মে মাসে নদীর ধারে বরফের উপর দেখতে পেতে পাবেন ভালুকের পায়ের ছাপ।

আবহাওয়া ভালো থাকলে আরো দুঘন্টা হেঁটে খাটলিং গুহায় আশ্রয় নিতে পারেন। একটি প্রকান্ড পাথরের নীচে গুহার মতন গর্ত। হিমালয়ের দুরন্ত হিমেল হাওয়া থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে এই গুহা। এর পরের রাস্তা খুব সাবধানে পার হতে হবে, কারণ হিমবাহ স্নাউটে যেতে গেলে ঢালু নুড়ি পাথরের রাস্তা (scree) বেয়ে নামতে হবে। গোমুখের তুলনায় স্নাউট খুবই ছোট। তবে সামনে সাত্‌লিঙ্‌ পর্বত শ্রেণী ও খাটলিং হিমবাহের পিছনে খাতলিঙ্‌ পর্বতশ্রেণীর ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য ট্রেকারদের মুগ্ধ করবে। সাতলিঙের গা বেয়ে নেমেছে একটি নদী, ওরই পাশ দিয়ে কেদারনাথ যাবার রাস্তা। পাহাড়ে চলার অভিজ্ঞতা থাকলে খাটলিঙ্‌ হিমবাহ অতিক্রম করে ম াসার তালের (৩৬৭৫ মি উঁচু) ধারে একরাত কাটিয়ে মায়ালি গিরিপথ অতিক্রম করে পৌছে যাবেন বাসুকীতালে (৪১৩৫ মি)। বাসুকীতাল থেকে কেদারনাথ যাওয়ার রাস্তা আছে। তবে পাহাড়ে চড়ার সাজসরঞ্জাম ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ গাইড ছাড়া এ পথে যাবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ডক্‌রিয়ানী হিমবাহ (Dokriani glacier)

ডকরিয়ানী ভাগীরথী অববাহিকার (basin) একটি মাঝারি মাপের হিমবাহ। কোন হিমবাহের উপত্যকার উপর অর্ধবৃত্তাকার গভীর খাদকে cirque বলে। ডকরিয়ানী হিমবাহ এইরকম দুটি

cirque এর দ্বারা তৈরি হয়েছে।Cirque দুটি ড্রাঙ্প (Dranp) এবং জাঁওলী (Jaonli) গিরিশৃঙ্গের উত্তর ঢালে অবস্থিত এবং এদের উচ্চতা যথাক্রমে ৫৬০০মি এবং ৬০০০মি। ডক্‌রিয়ানীর দৈর্ঘ্য ৫ কিমি, স্নাউটের উচ্চতা ৩৮০০ মি।

ক্রমশ

জয়ঢাকের দলবল

মহাশ্বেতা

রমা

সংহিতা

শান্তনু

অক্ষরবিন্যাসে

শান্তনু পাহাড়ে যায় , মহাশ্বেতা স্কুলে যায়, রমার আছে একটা প্রকাশন সংস্থা আর সংহিতা সরকারী চাকরি করে।ওদের চারজনের মধ্যে একখানাই মিল। জয়ঢাকের জন্য হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও কমপিউটারে অক্ষর সাজায় ওরা চারজন।

সোমা

মৌসুমী

মহুল

সৌভিক

তুলিতে মাউসে ক্যামেরায়

সোমা ভারতের সবচেয়ে বড়ো ব্যাংকে চাকরি করে, বিজ্ঞাপন তৈরি করে সৌভিক, মৌসুমী দশটা-পাঁচটা অফিস করে আর মহুল স্কুলে যায়। ব্যস্ত দিনের শেষে সোমা, মৌসুমী আর সৌভিক তুলি ধরে জয়ঢাকের ছবি আঁকবার জন্য। এক এক সংখ্যায় এক শোর কাছাকাছি ছবি তৈরি করে ওরা, তুলিতে, মাউস-এ, ক্যামেরায়। আর মহুল হাত পাকাচ্ছে জয়ঢাকের জন্য গ্রাফিক্সের কাজে।